সাহিত্য-টীকা

ড. শ্রীসনৎকুমার মিত্র

গ্রিফিথ স্মৃতি পুরস্কার,
স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি স্বর্ণপদক [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়] প্রাপ্ত,
রীডার, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, অতিথি অধ্যাপক,
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় [বাঙলা ও নৃত্য বিভাগ]

: পরিবেশক :

পুস্তক বিপণি
২৭,বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

প্রকাশক :

রুশো মিত্র
৬০ জেমস লঙ্ সরণি
[পূর্বতন, সত্যেন রায় রোড
কলিকাতা ৩৪

প্রথম প্রকাশ :
স্বাধীনতা দিবস : ১৯৮৩

দ্বিতীয় সংস্করণ :
স্বাধীনতা দিবস : ১৯৯১

প্রচ্ছদ :
তপন কর

মুদ্রাকর :
শ্যামল সাউ
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

নিবেদন : আট বছর পরে

খানিকটা 'বাজিয়ে দেখা যাক' করে যে বই আট বছর আগে লিখেছিলাম—তা অনেকের প্রয়োজন মিটিয়ে ও আগ্রহ সৃষ্টি করে সব কপি বিক্রি হয়ে গেছিলো বেশ ক-বছর আগেই। কিন্তু সময়ের অভাবে কিছুতেই আর নতুন সংস্করণ করা হচ্ছিল না। ক-মাস আগে নতুন সংস্করণে হাত দিয়েও সমানে ঠেক খাচ্ছিলাম। অবশেষে শেষ হলো। অনেক নতুন বিষয় আলোচনায় এসেছে, বড়ো হয়েছে, দাম বেড়েছে। বর্তমান সংস্করণ তৈরিতে আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান বিজনকুমার মণ্ডল আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর শুভ কামনা করি। ১৫.৮.৯১

শ্রীসনৎকুমার মিত্র

নিবেদন

বাঙলা সাহিত্যের বয়স আজ হাজার বছর। এই অল্প সময়ের মধ্যেই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের চরম ঔৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, সৃষ্টির উল্লাসে শত শত মনীষা নিয়োজিত হয়েছে। ফল, অসংখ্য বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের সাহিত্য-উৎপাদন; বিচিত্র তার ইতিহাস—কৌতূহলোদ্দীপক অথচ আনন্দময় তার কুলজী-পরিচয় গ্রহণ কর্ম। কখনো এই সাহিত্য-মন্দাকিনীতে কল্লোলে কোলাহল জেগেছে, কখনও বা এর মরাখাতে ধূ ধূ বালুকার মরু-হাহাকার। আমার এই ছোট্ট বইতে সেই বিরাট ও বৈচিত্র্যময় সাহিত্য-ইতিহাসের পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা নেই; আমি শুধু বাঙলা সাহিত্যের ঐ ইতিহাসের মধ্যে থেকে কয়েকটি স্বল্প-আলোচিত বিষয়, গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে বেছে নিয়েছি। এবং এই কাজে আমার অগ্রজ সাহিত্যের ইতিহাস-কারগণ মহা-মহা-ইমারত তৈরি করতে গিয়ে যে সব মাল-মসলা হেলাভরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলেছিলেন তাই-ই কুড়িয়ে নিয়ে নিজেরই পছন্দ মতো একটি ছোট্ট বাসা বানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছি। পরিশেষে, অনেকে এই বই হাতে নিয়েই তাৎক্ষণিক উপযোগিতার একটা উদ্দেশ্যযুক্ত গন্ধ পেতে পারেন; কিন্তু সেই গন্ধ সহ্য করে একটু ভেতরে ঢুকলেই সহজে বুঝতে পারবেন যে, এখানে ঐ উদ্দেশ্যকে ছাড়িয়ে ওঠার আন্তরিক চেষ্টা আছে। দ্বিতীয়ত, এই বইতে আধুনিক যুগ সম্বন্ধে কিছু কম আলোচনা করা হয়েছে; কারণ, এদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনেকখানি

প্রত্যক্ষ ; তাই এতে ভারসাম্য কিঞ্চিৎ ব্যাহত হলেও অযৌক্তিক হয় নি বলেই মনে হয়।

বইটির পেছনে আমার দুই অকৃত্রিম বন্ধু কথাসাহিত্যিক তপোবিজয় ঘোষ ও ড. পল্লব সেনগুপ্তের কৌতূহল অন্তরঙ্গ আন্তরিকতায় আবৃত। দাদা-বৌদি ড. ক্ষেত্র গুপ্ত ও ড. জ্যোৎস্না গুপ্ত সব সময়েই আমাকে আশিস্ ও সুপ্রীতি দান করে থাকেন, এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি; তাঁদেরকে শ্রদ্ধা জানাই। 'পুস্তক-বিপণি'-র তরুণ-প্রকাশক শ্রীঅনুপ মাহিন্দার এবং আমার পুত্র-কন্যা শ্রীমান্ রুশো ও কুমারী মহুয়া এই বইটি প্রকাশের প্রতিটি মুহূর্তে তাদের আগ্রহকে সজাগ রাখায় আমার পক্ষে কাজ করা সহজ হয়েছে, তাদের আমার শুভেচ্ছা ও আশিস্ জানাই। আমার কলেজ লাইব্রেরীর তিন কর্ণধার শ্রীঅসিতকুমার ব্রহ্ম, শ্রীজয়দেব কর্মকার ও শ্রীহারাধন ভট্টাচার্যের সাহায্য পরম কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি। কোন ত্রুটি লক্ষ্য করে বা কোন সুপরামর্শ দিয়ে যদি কোন সহৃদয় পাঠক সাহায্য করেন তবে বাধিত হই। ইতি—

১৫ই আগষ্ট ১৯৮৩

শ্রীসনৎকুমার মিত্র

অনুজাপ্রতিম

শ্রীমতী সীমা গঙ্গোপাধ্যায়

ও

সহপাঠী বন্ধু

অধ্যাপক শ্রীসঞ্জীবকুমার

প্রীতিনিলয়েষু

: এই লেখকের কিছু বই :

প্রবন্ধ :

রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য
পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা
কর্তাভজা : ধর্মমত ও ইতিহাস [সম্পাদিত]
লালনফকির : কবি ও কাব্য
বাঘ ও সংস্কৃতি [ঐ]
Folk Life and Lore of West Bengal
শেক্সপীয়র ও বাঙলা নাটক
পশ্চিমবঙ্গের লোকবাদ্য
পশ্চিমবঙ্গের পুতুল নাচ

সাহিত্য : সাহিত্যের ইতিহাস :

বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
চন্দ্রগুপ্ত [দ্বিজেন্দ্রলাল] : সম্পাদিত [২য় সং]
লোকরহস্য [বঙ্কিমচন্দ্র] : ঐ [৬ষ্ঠ সং] [যুগ্ম ভাবে
চন্দ্রশেখর [ঐ] : ঐ
অঙ্গুরীয় বিনিময় [ভূদেব] : ঐ

জীবনী :

বীর বালকের কথা।
বাঙলার নারী।
হো-চি-মিন
কমরেড লেনিন [২য় সং]
'প্রভাতী তারা' ডেভিড হেয়ার

সূচীপত্র

[বর্ণানুক্রমে সজ্জিত]

ক ॥ যুগবিচার :

খ ॥ প্রাচীন যুগ :

গ ॥ আধুনিক যুগ ঃ

যেগুলির পৃষ্ঠাসংখ্যা নেই সে-গুলি due part-এ রইল

ডউপার্টপ্রসঙ্গে : গত অগস্টের শেষে 'সাহিত্যটীকা'র বেশকিছু entry বাকি রেখে বইটির পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করে দেওয়া হয়। প্রতিশ্রুতি ছিলো ঐ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই Due Part বেরিয়ে যাবে। নানা অসুবিধায় পড়ে আমাদের কথা রাখতে পারিনি। আজ সম্পূর্ণ বইটি প্রকাশের মুখে আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী এই প্রবাদ মনে রেখে যে 'better late than never'. স. কু. মি.

গ ॥ আধুনিক যুগ : Due Part-এর সূচীপত্র

□

□ সাহিত্যটীকা □

☐ যুগবিচার ☐

১. **হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ :** বাঙলা সাহিত্যের একটি বিশেষ সময়কে 'হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগ'— এই নামকরণ করেছিলেন প্রয়াত ড. দীনেশচন্দ্র সেন ['বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (৮ম সংস্করণ) : পৃ. ২৯-৬১]। মোটামুটি ভাবে ৮০০-১২০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কালকে ড. সেন 'হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ' বলে অভিহিত করেছিলেন। এই যুগকেই কেউ কেউ বাঙলা সাহিত্যের 'আদি যুগ' বলে চিহ্নিত করতে চান। এখানে আলোচ্য যে, কেন বাঙলা সাহিত্যের এই যুগকে 'হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ' বলা হয়েছে, এবং তা যথার্থ কি না ? রাজ্য-শাসন অবস্থার বিচারে 'অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ মোট ৪৫০ বৎসর' পাল বংশের রাজত্বের সময় অর্থাৎ বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও রাজ-পৃষ্ঠপোষণার কাল। অবশ্য একথা ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই জানেন যে উক্ত সময়ের সবটাতেই বাঙলার মাটিতে একচ্ছত্র ভাবে পাল-শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিলো না। কেননা ঐ সময়ের ইতিহাসানুসরণে দেখা যাচ্ছে যে একাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে প্রারম্ভ কাল পর্যন্ত সময়ে বাঙলায় সেন-রাজবংশের পরিপোষণায় দক্ষিণ-ভারতাগত গোঁড়া হিন্দুধর্ম-বিশ্বাসের পুনরুত্থান ঘটে। ফলে, বাঙলার ধর্ম ও সমাজ-জীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সামঞ্জস্য ও সমীকরণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রচিত হয়। এই জন্যই ড. সেন কর্তৃক উক্ত সময়-কাল হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মবিশ্বাস ও ভাবধারায় রচিত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির যুগ হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

এ-কথা ঠিকই যে আলোচ্য কালে বাঙালীর সাহিত্য-প্রচেষ্টা মাত্রই ছিলো ধর্ম-নির্ভর এবং আদিযুগের এই ধর্ম-নির্ভর সাহিত্য-কর্মের মধ্যে কিন্তু কোন বিরোধ ছিলো না। হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্ম-নির্ভর সাহিত্য বা ধর্ম-বিভিন্নতা কোন বিরোধকে অপরিহার্য করে তোলে নি। আর এই সমন্বয় বুদ্ধিই সেদিনের বাঙলা সাহিত্যেও তার জাতীয় স্বরূপের প্রকাশ ঘটাতে দ্বিধা করে নি। তাই ড. সেন কথিত হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের বাঙলা সাহিত্য-প্রচেষ্টা একদিকে যেমন অবাস্তব কিছু নয়, তেমনি তা কোন বিরোধমূলক সাহিত্য সৃষ্টিও করেনি। এই বিচারেই কোন কোন সাহিত্যের ইতিহাসকার ড. সেনের ঐ হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ নামকরণকে সার্থক বলেই গ্রহণ করতে চেয়েছেন।

কিন্তু আবার এমন কিছু সাহিত্যের ঐতিহাসিক আছেন যাঁরা এই ভাবে বাঙলা সাহিত্যের আদি-যুগের নামকরণকে সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে, 'দীনেশচন্দ্র অবশ্য এমন কতকগুলি রচনাকে ; যেমন, শূন্যপুরাণ, গোপীচন্দ্র-মানিকচন্দ্র রাজার গান, ডাক-খনার বচন প্রভৃতিকে এই পর্বের রচনা বলে অনুমান করেছেন যা পরবর্তী গবেষণায় অনেক অর্বাচীন বলে প্রমাণিত হয়েছে।' ধর্মঠাকুর ও তাঁর পূজা আজ

আর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের পূজা বলে গৃহীত হয় না। এ সূর্যপূজারই নামান্তর। নাথপন্থীরাও যে বৌদ্ধধর্মাচরণ করে থাকেন একথাও আজ আর স্বীকৃত নয়। কিন্তু সাহিত্যের দিক থেকে না হলেও দীনেশচন্দ্রের এই হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের অভিধাটি যে একেবারে মূল্যহীন, একথা বলা যায় না। এই পর্বের বাঙলা দেশের স্বাধীন হিন্দু নরপতিদের কেউ কেউ বৌদ্ধ এবং কেউ বা অপর হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন—এ কথা আগেই বলে এসেছি। লোকজীবনের নিম্নতমস্তরেও ঐ-দুই ধর্মাচরণে নৈকট্য ছিলো সে বিষয়টিও লক্ষণীয়। তাই বাঙালী কবি কর্তৃক রচিত চর্যাপদ বা সংস্কৃত-অপভ্রংশ ইত্যাদি ভাষার কবি-কর্মে হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি অর্থাৎ ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে এ কথা মানতেই হয়; কোথাও বা যৌথ ভাবে, আবার কোথাও বা পৃথক ভাবে।

অতএব, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে বিচারে বলা যায় যে 'হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ' নাম আজ অনেকখানি তাৎপর্যহীন হলেও, দেশ জাতি বা যুগ-মানসের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে ড. সেনের আলোচ্য যুগের নামকরণ অনেকখানি সার্থক।

২. **অন্ধকার যুগ:** ১২০২-০৩ [শকাব্দ ১১২৪] খ্রীস্টাব্দে ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খিলজী নওদীয়া বা নোদিয়া [নবদ্বীপ] অধিকার করলে ঐখানে অবস্থানকারী গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণ সেন আত্মরক্ষার্থে বিক্রমপুরে পলায়ন করেন। নবদ্বীপ অধিকার করে অচিরেই বখতিয়ার রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমিতে আপন আধিপত্য বিস্তার করেন। কারণ, দেখা যাচ্ছে যে ৬০১ হিজরী সালের ১৯শে রমজান অর্থাৎ ১২০৫ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মে বখতিয়ার মুহম্মদ ঘুরীর নামে গৌড়-বিজয়-জ্ঞাপক সোনার টঙ্ক [টাকা] প্রচার করেছেন। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী শহর সম্ভবত নোদীয়া বা নবদ্বীপের কিছু পরে অধিকৃত হয়েছিলো।*

অতএব বলা যায় যে, '১২০৩ খ্রীস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজী বাঙলা দেশ জয় করে মুসলিম রাজত্বের সূত্রপাত করেন এবং ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুতে তার অবসান ঘটে। দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশ বছর ধরে মুসলমানের শাসন বাঙলাদেশে বহু উত্থান পতন, পরিবর্তন এনেছে। এই রূপান্তর রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়' [ড. ওয়াকিল আহমদ: 'বাংলা সাহিত্যের

---

* এই তথ্যগুলি আমরা ড. দীনেশচন্দ্র সরকার প্রণীত 'পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত' [১৯৮২] গ্রন্থের ৪, ৫, ১৮৭ পৃষ্ঠা থেকে গ্রহণ করেছি। কিন্তু *H. of B.* [1972, Reprint] গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩৩ পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে: Therefore the surprise of Nadia has to be placed about January 1201. It was mare raid, and the occupation and administrative control of the province [North Bengal] must have occupied two more dry seasons [October 1201-February 1203].

পুরাবৃত্ত' (ঢাকা ১৯৭৪) পৃ. ৭৬]। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করতে বসে সমস্ত উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-ঐতিহাসিকই ঐ সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলমান শাসনকালের মধ্যে প্রথম দেড়শ বছরকে অর্থাৎ ১২০২-০৩ [শকাব্দ ১১২৪] খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৩৪২ খ্রীস্টাব্দে যখন ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান ইলিয়াস শাহ [১৩৪২ ৫৮ ?] গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকেই 'অন্ধকার যুগ' ['Dark Age'] বলে অভিহিত করেছেন।

প্রথমে দেখা যাক যে প্রায় দেড়-শ বছর কেন এবং কিভাবে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে 'Dark Age' বা 'অন্ধকার যুগ' রূপে প্রতিপন্ন হলো। এ-বিষয়ে প্রথমে আমরা প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন সাহিত্যের ইতিহাসকারের মত উদ্ধৃত করে তারপর বিচার ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের সিদ্ধান্তে পৌছবার চেষ্টা করবো :

এক. 'দ্বাদশ শতাব্দের শেষ প্রান্তে পূর্ব-ভারতে তুর্কী আক্রমণ শুরু হয়। তাহার পর হইতে প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা দেশে অনিশ্চয়তার ও অরাজকতার ঝটিকা চলে। দেশের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির যে সব প্রধান কেন্দ্র ছিল সেইগুলি সর্বাগ্রে বিধ্বস্ত হইল, এবং বুদ্ধি-বিদ্যা কৌশলে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তাঁহারা সবাগ্রে বিপন্ন হইলেন।·· সুতরাং তুর্কী অভিযানের পরে বেশ কিছুকাল ধরিয়া সাহিত্যসৃষ্টির অবস্থা প্রতিকূল রহিল। দেশ আতঙ্কপূর্ণ এবং খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত। তাহার উপর উপদ্রব লাগিয়াই আছে। রাজপুষ্ট ব্রাহ্মণ কবি-পণ্ডিত এখন অনাথ, সমৃদ্ধ বৌদ্ধ বিহারগুলিও বিধ্বস্ত। সুতরাং এই অবস্থায় সাহিত্যসৃষ্টি তো দূরের কথা, শিক্ষার ও জ্ঞানচর্চার কোন সুযোগই থাকে নাই'।[১]

দুই. 'তুর্কী আক্রমণ এই চিরাভ্যস্ত আয়াস-বিলাসের বনিয়াদের 'পরে প্রথম থেকেই অপ্রত্যাশিত রূঢ় আঘাত করেছিল। বাঙালির যুগ-প্রাচীন জীবনযাত্রাপদ্ধতির পক্ষে সে কেবল কল্পনাতীতই ছিল না, হয়েছিল বিভীষিকাময়।···তারপরে প্রায় সার্ধশতাব্দী ধরে বাংলার মাটিতে রাজ্যলিপ্সা, জিঘাংসা, যুদ্ধ, হত্যা, আততায়ীর হস্তে মৃত্যু—নারকীয়তার যেন আর সীমা ছিল না। সংগে সংগে বৃহত্তর প্রজাসাধারণের জীবনেও উৎপীড়ন, লুণ্ঠন, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও ধর্মহানির সম্ভাবনা উত্তরোত্তর উৎকট হয়ে উঠেছে।···স্বভাবতই জীবনের এই বিপর্যয় লগ্নে কোন সৃজন-কর্ম সম্ভব হয়নি। ··প্রধানত: এই কারণেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কাল সৃজনহীন ঊষরতায় শূন্য হয়ে আছে'।

তিন. "তারপরে শারীরিক বল, সমর-কুশলতা ও বীভৎস হিংস্রতার দ্বারা বাংলা ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী ইসলামের অর্ধচন্দ্রখচিত পতাকা প্রোথিত হইল। খ্রীঃ ১৩শ হইতে ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত—প্রায় দুই শত বৎসর* ধরিয়া এই অমানুষিক

* দু-শ বছর হয় না, তিন-শ বছর হয়। এ-ছাড়া এই ২শ [৩শ ?] বছরকে ধরলে ড়. চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস এবং মালাধর বসুর কৃতিত্বের কথা ভুলে যেতে হয়। অধিকন্তু

বর্বরতা রাষ্ট্রকে অধিকার করিয়াছিল; এই যুগ বঙ্গসংস্কৃতির তামসযুগ, য়ুরোপের মধ্যযুগ 'The Dark Age'-এর সহিত সমতুলিত হইতে পারে।...১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কী আক্রমণের প্রচণ্ড আঘাতে অন্ততঃ দেড় শতাব্দীকাল বাংলাদেশ মূর্চ্ছাতুর হইয়াছিল। ১৩শ-১৪ শতাব্দীর মধ্যে এদেশে বাংলা গ্রন্থ তো দূরের কথা, মূল সংস্কৃত গ্রন্থ বা মূলের টীকা-টিপ্পনীও অতি অল্প পাওয়া গিয়াছে"।[৩]

চার· 'ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক: অন্ধকার পর্ব', কারণ 'বাংলাদেশে তুর্কী-বিজয় ঘটল ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভ হতেই।...এই দুই শতাব্দীর বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস হীন ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা, রক্তপাত, মসনদ দখল এবং প্রতিশোধ গ্রহণের দুঃস্বপ্নে পূর্ণ।...তাই মোটামুটিভাবে চতুর্দশ শতকের সমাপ্তি পর্যন্ত অন্ধকার পর্বের অন্তর্ভুক্ত করার যুক্তি আছে'।[৪]

উদ্ধৃত পূর্বপক্ষ যা বলেছেন তার নির্গলিতার্থ হচ্ছে এই যে বাঙলার মুসলমান আক্রমণের প্রথম দেড়-শ বছর বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে অন্ধকার বা তমসাবৃত যুগ। ঐ সময়ের মুসলমান-শাসকদের 'চণ্ডনীতি', 'ধ্বংস যজ্ঞ', 'পাশবিক অত্যাচার' বাঙালীর সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে একান্ত প্রতিকূল ছিলো। এখন বিচার ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারা যায় দেখা যাক।

প্রথমত, 'ইহার পর [১২০০ খ্রীস্টাব্দের মত সময়ে] প্রায় আড়াই শত বৎসর বাঙালীর সাহিত্যসৃষ্টির বিশেষ কোন নিদর্শন পাই না। এই সময়টাতে বাঙালী সংস্কৃত ভাষাতেও উল্লেখযোগ্য কিছু রচনা করে নাই, বাংলা ভাষায় তো করেই নাই। কেন করে নাই, তাহা বলা দুঃসাধ্য। অনেকে মুসলমান বিজয়কেই এজন্য দায়ী করেন। তাঁহাদের মতে মুসলমান বিজেতাদের অত্যাচার ও তাহাদের হিন্দুদের গ্রন্থাদি নষ্ট করার প্রবণতার দরুণ এবং সারা দেশে অশান্তি ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করিতে থাকার দরুণই এদেশে এই সময়ে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু এই অভিমত স্বীকার করা যায় না। কারণ হিন্দুদের সাহিত্যের প্রতি মুসলমানদের আক্রোশের কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অশান্তির সময়েও যে সাহিত্যিকের লেখনী নিশ্চল হইয়া থাকে না, তাহার বহু প্রমাণ বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। সুতরাং আলোচ্য সময়ে বাঙলাদেশের সাহিত্যসৃষ্টির অনাবির্ভাবের কারণ এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ-সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়। সম্ভবত ইহার প্রকৃত কারণ এই সময়ের মধ্যে কোন প্রতিভাধর সাহিত্যিক আবির্ভূত হন নাই। কিছু নগণ্য লেখক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অকিঞ্চিৎকর রচনা স্বতই লুপ্ত ও বিস্মৃত হইয়াছে'।[৫]

এই ইতিহাসকার কিছু পরেই বলেছেন: 'বাঙলা দেশকে একটা সুদৃঢ় শাসন ব্যবস্থার মধ্যে স্থাপন করিয়া সামসুদ্দিন ইলিয়াস সাহ [১৩৪২-১৩৫৮] সর্বপ্রথম বাংলার শিথিল রাজনৈতিক জীবনে সুদৃঢ় স্থায়িত্ব আনয়ন করেন।'

দ্বিতীয়ত, তামস যুগের উক্ত দেড়-শ বছরের [১২০৩-১৩৪২] মধ্যে বাঙলার মসনদে প্রায় ২৫ জন সুলতান বসেছিলেন, তাঁরা সকলেই 'খুনী ছিলেন না এবং দেশের সর্বত্র—গ্রাম-গঞ্জ-পরগণা-শহর-রাজধানী নির্বিচারে সংঘর্ষ বা হিন্দুর রক্তস্রোত বয়ে যায় নি।' অধিকন্তু, 'সেকালে মসনদে নূতন দাবিদার বসলেই ব্যাপক গ্রামজীবনে তার ফলাফল প্রসারিত হত না। প্রায়ই রাষ্ট্রীয় সংঘাত-সংঘর্ষ রাজধানীর চারপাশেই সীমাবদ্ধ থাকত। গ্রামজীবন নির্বিবাদে বয়ে চলত। শুধুমাত্র সেনা চলাচলের প্রত্যক্ষ পথের 'পরে পড়লে লুঠতরাজ এবং অন্য নানাবিধ অত্যাচার দেখা দিত'।[৬] তাই বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা সবদিক দিয়ে এবং সমূলে একেবারে উৎসন্নে গিয়েছিলো, এমন সর্বগ্রাসী মন্তব্য করা ঠিক ঐতিহাসিক বুদ্ধিজাত নয় বলেই মনে করি।

তৃতীয়ত, এরই সঙ্গে ঐ একই ঐতিহাসিক বলেন : 'গ্রামের দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য পীর-ফকিরের দল সক্রিয় হয়ে উঠল। সামান্য প্রয়োজনেই রাজশক্তির সশস্ত্র সহায়তা তারা লাভ করত। তুর্কি সৈন্য ও অভিজাতেরা গ্রামের কৃষিপণ্য জবর দখল করে বা শ্রমজীবীদের বেগার খাটিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব গড়ে তুলল। ব্রাহ্মণদের জোর করে গোমাংস খাইয়ে জাতিচ্যুত করা হতে লাগল। মন্দিরের বিগ্রহকে অপমানিত করে তার শক্তিহীনতা প্রমাণ করা হতে লাগল। মুসলমান-বিজয় অল্পকালের মধ্যেই বাঙলার গ্রামজীবনকে বিশেষভাবে তরঙ্গিত করে তুলল।' এই তরঙ্গ কি উক্ত দেড়শ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে, সর্ববঙ্গে, সর্বপ্রত্যন্তে আছড়ে পড়েছে? মনে হয় না। কেন না তা যদি হতো কেবল বাঙালী হিন্দু সাহিত্য নয়, সমগ্র হিন্দু নাম লোপ পেয়ে বাঙলায় কেবল মুসলমানই বসবাস করতে থাকতো।

চতুর্থত, একথা ঠিক যে বাঙলায় মুসলমান অধিকারের আগে 'অবধি যাহাদের হাতে শিষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি নির্ভর করিত, তাঁহারা ছিলেন প্রধানভাবে সংস্কৃতশাস্ত্র-সংস্কৃতিসম্পন্ন। ব্রাহ্মণ্যপন্থী হোন অথবা বৌদ্ধতান্ত্রিক মতাবলম্বী হোন, তখন যাঁহারা সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন তাঁহারা উচ্চস্তরের ব্যক্তি—রাজসভাসদ্‌ অথবা সমাজপতি। অনেকে আবার ছিলেন কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মসঙ্ঘের আচার্য বা অধিনায়ক। পরপুষ্ট ইঁহারা মুসলমান অভিযানে বিপন্ন হইলেন।...রাজপুষ্ট ব্রাহ্মণ কবি-পণ্ডিত এখন অনাথ, সমৃদ্ধবৌদ্ধ বিহারগুলিও বিধ্বস্ত'।[৮] ফলে সংস্কৃত ও বৌদ্ধ সাহিত্য রচনা ব্যাহত ও তার সারস্বতমণ্ডল পলাতক, গুপ্ত বা নিহত হলো। তাতে বৃহত্তম বাঙালী সমাজের মাতৃভাষা বাঙলার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হলো? এই প্রশ্ন অনেকেরই হাস্যোদ্রেক করতে পারে। কারণ তাঁরা এই সময়ের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বলতে বোঝেন বা সম্মান করে থাকেন সংস্কৃত ও বৌদ্ধ সাহিত্যকে। কিন্তু বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর সৃষ্ট যে ভাষা ও সাহিত্য স্ফূর্তি ঘটলে তা মাটি কামড়ে থাকতো—কোনো বাইরের আক্রমণই তাকে আঘাত করতে, টলাতে পারতো না, সেই বাঙলা ভাষাকোকিল তুর্কী আক্রমণের প্রায় কয়েক-শ বছর আগেই সংস্কৃত-অপভ্রংশের নির্মোক ত্যাগ করে আপন ডানায় ভর করতে

চাইলেও সংস্কৃতশাস্ত্রাভিমানীদের অবহেলায় আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি। অর্থাৎ সেই চুঁইয়ে পড়ার নীতির প্রাচীন উদাহরণ। বিষয়টিকে সূত্রাকারে সাজালেই ধরা পড়ে যাবে যে তুর্কী আক্রমণের পরবর্তী দেড়শ বছরকাল বঙ্গভাষা-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনে সত্যই অন্ধকার নেমে এসেছিলো কি না? এসে থাকলে তার জন্যে দায়ী কে, কারা এবং কতখানি?

১। বাঙলায় পাল ও সেন রাজত্বকাল মোটামুটিভাবে [৭৫০-১২ ৫ খ্রীস্টাব্দ] শান্ত-নিরুপদ্রব-শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিময়। এই সা'ড়ে চারশ বছরের মধ্যেকার আধাআধি সময়েই বাঙলা ভাষার জন্ম-বিকাশ এমন কি সাহিত্য পর্যন্ত রচিত হয়ে গেছে, কিন্তু তার পরিমাণ অতি সামান্য। ভাষার জন্মক্ষণের কল্লোল-কোলাহল কিছুই সেখানে নেই।

২। থাকবে কোথা থেকে, সেকালে সংস্কৃতের প্রতি যে পরিমাণ প্রীতি ছিলো, ঠিক সেই পরিমাণ অবজ্ঞা ছিলো বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি।

৩। অতএব সেন-পাল আমলের উন্নতিশীল সমাজব্যবস্থার মধ্যে সাধারণ মানুষকে তাদের মুখের ভাষা ও বুকের ব্যথাকে পুষে রেখে অবহেলার অন্ধকারেই থাকতে হয়েছে।

৪। দেশের অগণিত জনসাধারণ—যারা বরাবরই দেশের পনের আনা, যাদের ভাষা-সংস্কৃতি-জীবনাচরণ ও মনুষ্যত্ব পাল-সেন আমলের অভিজাতদের বা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-শাস্ত্রবিদ্‌দের দ্বারা যেভাবে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হয়েছে, প্রথম দিকে বিজয়ী মুসলমানদের কাছ থেকে তার চেয়ে বেশি কি পীড়ন আসতে পারে? অর্থাৎ তাদের রামে মারলেও মরেছে, আর রাবণে মারলেও মরেছে ও মরছে।

৫। মুসলমানদের চেয়ে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের দ্বারাই বৌদ্ধগণ অনেক বেশি নিপীড়িত হয়েছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণে'র 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' অংশই তার প্রমাণ।

৬। মুসলমান প্রশাসকগণ তাঁদের শাসনকর্মের সূচনাতেই মুখোমুখি হলেন সংস্কৃত ভাষা ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের আচারনিষ্ঠ ফোঁটা-তিলকের সঙ্গে। দেশের অগণিত মানুষের সঙ্গে তো বটেই, অধিকন্তু নব্য-শাসককুলের সঙ্গে ঐ ভাষা-সাহিত্য ও আচারানুষ্ঠানের পার্থক্য অনেক যোজনব্যাপী। তাই সম্পূর্ণ বিধর্মী ও বিভাষী বিজয়ীদের পক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে কিছুতেই আন্তরিক যোগাযোগ স্থাপন দ্রুত ও সহজ হয়ে উঠে নি।

৬। এ-ছাড়াও প্রথম অবস্থায় বেশ কিছুদিন বিজেতৃগণ নিজেরাই আত্মকলহে অনেকখানি শক্তি ক্ষয় করেছেন। নিজেদের জান-মাল সামলাতেই যখন নিজেরা ব্যস্ত তখন সুকুমারকলায় মনোসংযোগ করা একান্ত কঠিন।

৭। কিছুদিন বাদেই যখন মুসলমানগণের বহিরাগত বিজয়ীর মনোভাব ঘুচে যেতে আরম্ভ করলো, বিজেতা ও বিজিত যখন উভয়কেই উভয়ের প্রয়োজন হলো,

তখনই যে ভাষা ও সংস্কৃতি রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলো তা সংস্কৃত নয়, বাঙলা।

৮। এই ঐতিহাসিক সত্যকে উপলব্ধি করেই ড. দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন : যদি বাংলার হিন্দুরাজগণ স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হতেন, তাহলে বাঙলা ভাষা রাজদরবারে প্রবেশাধিকার লাভ করতো না। 'আমাদের বিশ্বাস, মুসলমানকর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গ ভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।...গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহই বঙ্গ ভাষার শ্রীবৃদ্ধির প্রধান কারণ।' এর পর বোধহয় পূর্বপক্ষের 'অন্ধকার যুগ' সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যার যুক্তি আর শেকড় পায় না।

৯। ভাষাতাত্ত্বিকগণের বিচারে মোটামুটি ভাবে কমবেশি অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশের মাধ্যমে বাঙলা ভাষার বিবর্তন সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ঐ চেহারাপ্রাপ্ত বাঙলা ভাষায় কিছু সাহিত্যও রচিত হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন যোগ নেই। পণ্ডিত ও রাজদরবার সেবিত সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ-সংস্কৃতির সঙ্গেও ঐ সাধারণ মানুষের কোন যোগ নেই। যোগ নেই দেশের মন্দিরের দেবদেবীর সঙ্গেও ; এসব কিছুই যেন 'উপরিসৌধের' ব্যাপার। তাই মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত ও পর্যুদস্ত ঐ সৌধাবস্থিত সাহিত্য-সংস্কৃতি-ধর্ম প্রসঙ্গে বৃহত্তর সাধারণ জনগণের কোন আগ্রহ বা মমতা ছিল না। [এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যের অন্তর্গত 'প্রথম পূজা' কবিতাটির রাজা ও কিরাত সর্দার মাধবের সম্পর্ক ও আচরণের কথা মনে করা যেতে পারে]। ফলে : ক. মুসলমান আক্রমণের পাঁচশ বছর পূর্ববর্তী সময়েই হিন্দু বাঙালী কর্তৃকই বাঙালী হিন্দু সর্বসাধারণের বাঙলা ভাষা ঘৃণিত ও অবহেলিত হওয়ায় জন্মলাভ করেও পেঁচোয় পেয়ে রইলো। খ মুসলমান আক্রমণের প্রথম দেড়শ বছরেও ঐ 'রিকেটি' সন্তানটাকে 'দেখ-ভাল' করার জন্যে কি দেশীয়, কি নতুন শাসক কারোরই কোন অবকাশ হয়ে ওঠেনি। গ. তাই আজন্মের সুবিধাবাদী 'ধান্দাবাজ' শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যেই দেখলো যে সুলতানদের সিংহাসন থেকে ভাষা [বাঙলা] চর্চার জন্য পৃষ্ঠপোষণা আসছে, অমনি রৌরব নরকের শাস্তির কথা ভুলে ['অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। / ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥'] সাড়ে ছ-শ বছর ধরে ভুলুণ্ঠিতা বঙ্গভাষাকে আনুকূল্য দেখাতে আরম্ভ করলো। বৃহত্তর জনসমাজ এতদিন ধরে এই সময়ের জন্যেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো। তাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সংস্কৃতাভিমানী শিক্ষিত পণ্ডিত যাঁরা এই অভিমান ভুলে বাংলাভাষার চর্চা ও সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন তাঁদের উষ্ণ ও আন্তরিক সম্বর্ধনা দেখাতেও কার্পণ্য করলো না ['প্রসাদ পাইয়া বাহির হৈলাম সত্বরে। / অপূর্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে॥ / চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত। / সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥']। দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর সংযোগ-ধন্য হয়ে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য অচিরেই ষড়ৈশ্বর্যময়ী রূপ ধারণ করলো। অতএব একমাত্র তুর্কী আক্রমণের ফলেই প্রথম ১০০/১৫০ বছর বাঙলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্ধকারের যবনিকা যদি নেমে এসে থাকে তবে তার জন্যে তৎকালীন ব্রাহ্মণ-

পণ্ডিতদেরও দায়িত্ব এবং অবহেলাকে আদৌ অস্বীকার করা যায় না।

পরিশেষে এই ভাবে মন্তব্য করা যায় যে: 'দেশের অগণিত জনসাধারণ অশিক্ষিত ছিলো বলে, তাদের দ্বারা শিল্প-সাহিত্য চর্চা সম্ভব হয় নি; শিক্ষিত হিন্দু সমাজ এ-ভাষা বর্জন করেছিলো; নবাগত ও নবগঠিত মুসলমান সমাজ প্রাথমিক পর্যায়ে এ ভাষার স্বরূপ উপলব্ধি করে নি; কারণ বাঙলা ভাষার তখনও গঠনপর্ব সমাপ্ত হয়ে যায় নি। শিক্ষিত বৌদ্ধেরাও পূর্ববর্তী হিন্দু পুনরুত্থানে ও পরবর্তী মুসলমান আক্রমণে তুলমূল্য ভাবে নির্জিত হয়েছে। এমত অবস্থায় বাঙলা ভাষা-সাহিত্যের চর্চা-পুষ্টি ও উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি না হওয়াই সম্ভব।'

৩. ঐশ্বর্য-যুগ: চৈতন্য-প্রভাব: চৈতন্যদেবের জীবন-কাল দু-শতাব্দীতে বিভক্ত [১৪৮৬-১৫৩৩]। জীবনের প্রথম চৌদ্দ বছর পঞ্চদশ এবং বাকী তেত্রিশ বছর ষোড়শ শতাব্দীতে অতিবাহিত হয়েছে। এবং এই শেষ তেত্রিশ বছরের মধ্যে তেইশ বছরই তাঁর সন্ন্যাস জীবন। এই সন্ন্যাস অবস্থায় তিনি যেরূপে জীবন অতিবাহিত করছেন তা সামগ্রিকভাবে বাঙলার দেশ-কাল, সাহিত্য-সংস্কৃতি,—এবং ব্যাপক অর্থে বাঙালীর সমগ্র জীবনাচরণকে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এই প্রভাবের প্রসার, বৈশিষ্ট্য এবং ফলের দিকে তাকিয়ে কেউ কেউ একে 'নব-জাগরণ' [renaissance] বলতে চেয়েছেন। আমরা এখানে প্রধানত বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই নবজাগরণ কতখানি এবং কেমন প্রভাব ফেলেছে কেবল তারই আলোচনা করবো। তবে প্রসঙ্গসূত্রে দেশ ও কালকেও প্রেক্ষাপটে রাখতে হবে।

১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর থেকে ১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যে কোন এক সময়ে আলাউদ্দীন হুসেন শাহ বাঙলার সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং তিনি ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দের অগাষ্ট মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইনিই বাঙলার বিখ্যাত 'হুসেন শাহী' বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ৪৫ বছর সগৌরবে দেশ শাসন করার পর ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে এই বংশের রাজত্বকালের অবসান ঘটে। বলা যায়-যে, এই শাসনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দু-শ বছর আগে বাঙলায় দিল্লী-নিরপেক্ষ ও নিরবচ্ছিন্ন যে স্বাধীন সুলতানী শাসনের সূত্রপাত হয়েছিলো তার অবসান হয়। এবং এরপর থেকেই ধীরে ধীরে বাঙলার শাসন দিল্লী-অভিমুখী হতে থাকে ও তার ধন-সম্পদের চলার মুখও সেই দিকেই ফিরে যায়। যার নীট ফল দিল্লীর একটি সুবারূপে বাঙলাদেশের আর্থিক রক্তাল্পতা রোগের সূচনা। কিন্তু এ-সব বাদ দিয়েও এটা দেখতে বা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে চৈতন্যদেবের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শেষাংশ সমাজ-আর্থ বা রাজনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে স্থিতাবস্থার কাল। এবং এই স্থিতাবস্থার সঙ্গে চৈতন্যদেবের বাস্তব বুদ্ধি, প্রগাঢ় মনীষা, সমাজমনস্কতা, ও মানবপ্রীতিজাত ভক্তি মিশ্রিত হয়ে সেদিনের দেশ-কাল-সমাজ-অর্থনীতি এবং সংস্কৃতিকে বহুমাত্রিক কাৎস্ন্য দান করেছিলো। আমরা এখন এখানে বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঐ নবীন জাগরণ কি অভিঘাত সৃষ্টি করেছিলো কেবল তারই পরিচয় গ্রহণ করার চেষ্টা করবো।

আগেই বলেছি যে দেশ-কালকে অতিক্রম করে চৈতন্য-প্রভাব বাঙালীর সাহিত্য-ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছিলো। চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম কেবল একটি ধর্মান্দোলনই ছিলো না, এ-সমাজ-ধর্ম-অনুশাসন-আচার-রাজনীতিকে অতিক্রম করে বাঙালীর 'চিত্তের গভীর ভাবপ্রবণতায়' এক নতুন মূল্যবোধের ধারণাকে সুপরিস্ফুট করে; যার জন্ম আগেই হয়েছিলো,—এই শতাব্দীতে এসে তাই-ই পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। বাঙালীর চিত্তের সমগ্র ক্ষেত্রটি শ্যামল-সরস-সবুজ হয়ে ওঠে। তার প্রকৃত রূপ এই রকম :

১. রাধা-কৃষ্ণের রাগাত্মিক প্রেমই বৈষ্ণবের সাধ্য। চৈতন্যদেব 'যাঁহা যাঁহা নেত্র ফেরে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ' দেখেন। ফলে, যে রাধা-কৃষ্ণ প্রেম-পুষ্প জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের মধ্যে দিয়ে বাঙালীর মানস-সরোবরে প্রস্ফুট হয়েছিলো, তা-ই আরও অধিক সতেজতা ও সৌরভ নিয়ে হাজির হলো। সৃষ্টি হতে থাকলো বৈষ্ণব কবিতা। যা 'বৈষ্ণব পদাবলী' নামে আজ পরিচিত। বাঙালীর স্বাভাবিক গীতি-প্রবণতা এইখানে একই সঙ্গে বিস্ময়কর প্রাচুর্য এবং উৎকর্ষ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য কৃষ্ণ-নাম সংকীর্তনমুখ্য বৈষ্ণবধর্মসাধনার বাস্তব প্রয়োজন 'বৈষ্ণবপদাবলী'র রসপ্লাবন সৃষ্টির অপরোক্ষ কারণও বটে।

২. বাঙলা সাহিত্যে একটি নতুন শাখার সৃষ্টি হলো। তা হচ্ছে 'জীবন-চরিতকাব্য' শাখা। প্রথম চৈতন্যদেবের মহান জীবন-চরিত অবলম্বনে এর সূত্রপাত—পরে, অপরাপর প্রধান প্রধান বৈষ্ণব ধর্মগুরুর জীবন অবলম্বনেও কাব্য রচিত হতে থাকে। এতদিন স্বর্গের দেবতা বা তাঁরই অবতার, কোনো এক অদেখা পৌরাণিক চরিত্রই, বাঙালীর কাব্যের আধার ছিলো। কিন্তু চৈতন্যদেবই প্রথম প্রত্যক্ষদৃষ্ট পঞ্চভূতে গড়া মানুষ যিনি কবির নায়কের মর্যাদা লাভ করলেন। সেই অনেক দূর অতীতে বাঙলা সাহিত্যে মানবীকরণের এই ঘটনা বিশেষ তাৎপর্য মণ্ডিত।

৩ রস-সাধ্য, প্রেমভাব অবলম্বনের আধার বৈষ্ণব সাধনা, সর্বত্রই এক ললিত মধুর বাতাবরণের সৃষ্টি করেছিলো। এর ঢেউ বাঙলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তটে গিয়ে আছাড় খায়। প্রথমত, ভাগবতের অনুবাদ একান্ত ভাবেই কৃষ্ণমুখ্য হয়ে উঠলো—কেউই আর ১০-১২ স্কন্দের বাইরে যেতে চান না। দ্বিতীয়ত, রামায়ণের বিষ্ণুর অবতার রাম একেবারেই ললিত-কোমল বৈষ্ণব ভক্ত হয়ে পড়তে থাকলেন। তৃতীয়ত, মহাভারতেরও অনুবাদকর্ম সুরু হলো। উদ্দেশ্য কৃষ্ণকথা শোনা,—যদিও এ কৃষ্ণ ঐশ্বর্য-মণ্ডিত,—তবুও ইনি কৃষ্ণ তো। চতুর্থত,এই অনুবাদকর্ম ইত্যাদিকে অবলম্বন করে ভক্তি-ভাব-প্রধান বাঙালী-মনীষা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক সৃজনশক্তির পরিচয় দিতে থাকলো।

৪. আগেই বলা হয়েছে যে, চৈতন্যদেব এবং তাঁর প্রেমধর্ম সমাজের নীচের তলার মানুষদের আত্মমর্যাবোধ জাগিয়ে দিয়ে তাদেরকে মনুষত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। এই সঙ্গে তাদের পূজিত মনসা, চণ্ডী, ধর্ম ইত্যাদি দেবদেবীরাও সমাজের উচ্চকোটিতে স্থান লাভ করতে থাকেন। তাঁদের মর্যাদা-প্রতাপ এবং দেবত্বও স্বীকৃত হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের হিংস্রতা, রূঢ় চোয়াড় স্বভাবেও পেলবতা সংযুক্ত হয়। অবশ্য এঁদের

কেউ কেউ আগেই ব্রাহ্মণ্য শাসনের সমর্থন পেয়েছিলেন, তবুও এখানে এসে মঙ্গলকাব্যের উক্ত দেবদেবীরা সকলেই সামগ্রিক গণতন্ত্রীকরণের প্রভাবে বঙ্গসংস্কৃতির মানস-ভোজে এক পংক্তিতে স্থান পেয়ে গেলেন।

৫. ব্যবহারে তলোয়ারে শান পড়ে—ঠিক তেমনি এই শতাব্দীতে চৈতন্য-অনুপ্রেরণায় বাঙালীর লেখনী বিভিন্ন ধারায় বহু ব্যবহারে সচল, উজ্জ্বল এবং নানাবিধ ভাবের প্রকাশে তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে; তার ভাব-কল্পনার মুক্তি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার-বাক্যবিন্যাস ইত্যাদিতেও সরল স্বাচ্ছন্দ্য দেখা দেয়। যে ভাষা গত শতাব্দীতেও তার বাল্যের দুর্বলতা ও নির্ভরতা এবং অ-ঋজুতাকে কাটিয়ে উঠতে পারে নি, এখানে এসে সেই কান্তকোমলপদাবলী, দার্শনিক লাচাড়ী-প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা কার্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক লাফে যৌবনের শক্তি ও বেগ আয়ত্ত করে ফেলে। বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে সামর্থ্য অর্জন-বিষয়ে ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্য প্রভাব তাই বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিলো।

কাল এবং দেশ নতুন গতি পথে বাঁক নেওয়াতে, বঙ্গীয় জীবন ও সমাজ মানবানুভূতির সার্বিক স্বীকৃতিতে নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির প্রাচুর্যে, বিচিত্র-ভাবমণ্ডিত তন্ময়তা-প্রধান কাব্যরূপের আবির্ভাবে, দার্শনিক মনীষার প্রকাশে এই ষোড়শ শতাব্দী 'ঐশ্বর্যময় যুগ' হিসেবে সঠিক ভাবেই চিহ্নিত হয়েছে।

৪. **অবক্ষয়ের যুগ:** ইতিহাস অনুসরণ করে দেখা যাচ্ছে যে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সাম্রাজ্যের অপ্রতিহত শক্তির আধার সম্রাট ঔরংজীবের মৃত্যু হয়। প্রায় দুশো বছর ব্যাপী যে মুঘল সাম্রাজ্য সারা ভারতবর্ষকে একছত্র ক্ষমতায় শাসন করে এসেছিলো ঔরংজীবের মৃত্যুর পর সেই সাম্রাজ্যের ধ্বংস প্রকট হয়ে ওঠে। ফলে, সারা দেশের প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ মুঘল শাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দিকে দিকে আপন স্বাতন্ত্র্য ও শক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকেন। বাঙলা দেশেও প্রথমে মুর্শিদকুলি খাঁ, পরে তার পুত্রকে হত্যা করে আলিবর্দী খাঁ এবং তারপরে তাঁর দৌহিত্র সিরাজদৌল্লা বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। এই আত্ম-কোন্দলের সুযোগে ১৭১৭খ্রীস্টাব্দে দিল্লির মুঘল সম্রাট ফররুখশিয়রের কাছ থেকে ইংরেজ বানিয়াদের পক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। ফলে বাঙলার নবাবের সঙ্গে তাদের স্বার্থের বিরোধ দেখা দেয় এবং যে বিরোধের অবসান ঘটে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে। অবশ্য যদিও এই মারামারি, হানাহানি, গুপ্তহত্যা শাঠ্যের প্রতিযোগিতা আরো আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছিলো। 'মোটকথা সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রায় সমাপ্তি পর্যন্ত বাঙালীর জীবনে ছিল অব্যবস্থা ও সঙ্কট ও অর্থনৈতিক দৈন্য ও নিষ্ঠুর শোষণ, পর্তুগীজ বোম্বেটে, বর্গীর হানাদারি ও দুর্ভিক্ষ। চারিদিকে রুচিহীনতা ও মোঘলাই বিলাসকলা অভিজাতবর্গের জীবন থেকে ক্ষরিত হয়ে গোটা সমাজকে বিষিয়ে দিচ্ছিল।' এরই সঙ্গে যথার্থ চারিত্র্যশক্তির অভাবে পরকীয়া-প্রেমমুখ্য বৈষ্ণব

সাধনায় অনাচার প্রবেশ করতে থাকে। একদিন বৈষ্ণবের ভাব প্লাবনে প্রতিস্পর্ধীর ক্ষমতায় শাক্ত-আচারের যে বন্ধাটাকে আলগা করে দেওয়া হয়েছিলো, এখন নানা গুহ্য অনুষ্ঠানের অন্ধকারে তা পাপ সঞ্চয় করতে থাকে। বাইরে থেকে সব রকমে মার খেয়ে ব্রাহ্মণ্য অভিভাবকত্ব নানা কু-আচারে, সংস্কার-নিষ্পেষণে, নিশ্চিত বিশ্বাস হারিয়ে, অবিশ্বাসের হীনমন্যতায় বৃহত্তর হিন্দু সমাজকে উত্যক্ত করতে থাকে। চিন্তা-চরিত্র-অর্থনীতি-সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদির সার্বিক অবনমন অষ্টাদশ শতাব্দীতে চরমে এসে পৌঁছায়। এমন সময় পূর্ব কথিত পলাশীর যুদ্ধ সব কিছুকে ওলোটপালট করে দেয়। সর্বত্র সব কিছুতে ক্ষয়রোগের চিহ্নটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। একেই বলা হয় 'অবক্ষয়ের যুগ'।

সাহিত্য কোন 'অলোকলতার মূল' নয়। এ-তার সমাজের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে আপন শিকড়কে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করে দিয়েই প্রাণরস সংগ্রহ করে থাকে। কোনো দেশের ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই এই ঘটনার ব্যাতিক্রম হয় না। বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যে তার ব্যত্যয় হয় নি সে-কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের অবক্ষয় যুগের এই কালসীমা কতদূর সে কথাও এখানে জানা দরকার। '১৭৫৭ সালে রাজনৈতিক বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে বাঙালীর ব্যবহারিক জীবনের নানা দিক ঘিরে যে অস্থির ও অসুস্থ পরিবেশের সূচিত হয়, তার মাত্র তিন বছর পরে ১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুতে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনেও ঘোরতর সঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি হয়। তারপর ১৮৩০ সালে ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্যজগতে আবির্ভাবের কাল পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের যে ফসল উঠে তা এই অবক্ষয় যুগেরই ফসল'।[৮] অর্থাৎ ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৭০ বছরই অবক্ষয় পর্বের যুগসীমা। এই সঙ্গে একথা মেনে নিতেই হবে যে উক্ত ক্ষয়রোগের লক্ষণ বঙ্গসাহিত্য দেহে আরো অন্তত দু-তিন দশক আগে থেকেই দেখা দিয়েছিল। ধীরে ধীরে তার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে বই কমে নি। এখন আমরা উক্ত পর্বের সাহিত্য-সম্ভারের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যগুলি কি তা সূত্রাকারে আলোচনা করতে পারি :

ক. প্রথমে বাঙলা সাহিত্যের সবচেয়ে বৃহত্তর ও বহু শাখাবিশিষ্ট যে মঙ্গলকাব্যের ধারা সেখানে দেখা যাচ্ছে পুরাতনেরই শক্তিহীন প্রথানুবর্ত।। কেউ-ই এখানে কোন কৃতিত্বের দাবী নিয়ে উপস্থিত হতে পারেন নি। তবে ধর্মমঙ্গলে ঘনরাম রূপরাম, মনসা-মঙ্গলে জীবন মৈত্র, অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র ও ভবানীশঙ্কর ছাড়া আর সর্বত্রই জীর্ণতা অতি প্রত্যক্ষ। অন্নদা-শিবায়ন-দক্ষিণ রায় ইত্যাদি কিছু নতুন বিষয় অবশ্য এখানে এসে আসন পেতেছে। এবং তারই পাশে পাশে পূর্বে অবহেলিত কালিকামঙ্গল বিদ্যাসুন্দরের আদিরসকে আশ্রয় করে ভালোভাবেই গেঁজিয়ে উঠেছে।

খ. 'এই পর্বে সাহিত্য মুখ্যত প্রসাধনকলায় চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছে। অনেক রচনাই অলঙ্কারে ভারাক্রান্ত। কিন্তু জীবনের গভীরে দৃক্‌পাতের চেষ্টা অল্প বলে

সন্দেহ হয় এ সজ্জা অন্তঃসারশূন্যতাকে ঢাকাবার জন্যই।' সমালোচকের এই মন্তব্য কিছু রূঢ় হলেও অন্তত রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র উক্ত সব দোষগুলি অঙ্গে মেখেও অবক্ষয়ের যুগকে অতিক্রম করে সৃষ্টি-ধারাপাতের যুগে পৌঁছতে পেরেছেন। ক্ষয়রোগের অনেক উপসর্গ তাঁর মধ্যে দেখা দিলেও তাঁর প্রতিভার শ্বেতকণিকা—রসবোধ ও নাগরিক সূক্ষ্মতাই, তাঁকে যুগোত্তরণের শক্তি দিয়েছে,—তাঁর প্রতিভাকে রক্ষা করেছে।

গ. রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদির অনুবাদ শাখায় আর কেউই তেমন দম ধরে অগ্রসর হতে না পারায় তাঁদের শক্তি গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করতে পারে নি।

ঘ. এই সময়ে কিছু কিছু বৈষ্ণবপদ রচিত হলেও তাদের বিশেষ কোন কাব্যমূল্য নেই। কেবল কয়েকটি পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থ সংকলিত হয়ে মূল্যবান পদসাহিত্য-কীর্তিগুলিকে হারিয়ে যাওয়ার নিশ্চিত বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। অধিকন্তু এ-সময়ের বৈষ্ণবপদগুলি 'কবিয়ালদের সখিসম্বাদের হাটের হট্টগোলে চরমভাবে অবনমিত হয়েছে।'

ঙ. রোগজীর্ণ এই কালে যদি কোথাও একটুকুও আলো বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে তা সে শাক্তপদাবলীর পর্ণকুটিরে। এ সময়ের ক্লান্তিহীন পুনরাবৃত্তি, রূপহীন গতানুগতিকতার মধ্যে সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেন মাতৃসাধনার ভক্তি মন্ময়তার সঙ্গে কবিত্বের তন্ময়তাকে মিশিয়ে কিছু মুক্ত বায়ু, কিছু উজ্জ্বল আলো অসুস্থ বাঙলা সাহিত্য-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এত দুঃখের মধ্যে এত যন্ত্রণায় ঐটুকুই যা সান্ত্বনা।

চ. 'ঐতিহ্যে প্রাচীনতর হলেও নাথপন্থীদের কাহিনীগুলি এই পর্বেই রচিত হয়। অবশ্য নূতন শাখা হিসেবে কোনো সম্ভাবনা এর দ্বারা সৃষ্ট হল না।'

ছ. 'ধর্ম ভাবনা ও ভক্তির প্রগাঢ়তা ফিকে হয়ে এসেছে—কোথাও তাত্ত্বিক তর্কে তা আবেগচ্যুত, প্রায়ই তা সংশয়বাণবিদ্ধ। ধর্মবিবিক্ত মানুষ [খুব অগভীর ভাবে এবং সামান্যত] সাহিত্য জগতে প্রবেশ করতে চাইছে। সম্পূর্ণ মানবিক বিষয় নিয়ে লেখা কবিতারও খোঁজ মিলছে অল্প-স্বল্প।' ফলে, রাজনৈতিক উৎকেন্দ্রিকতা, অর্থনৈতিক ভাঙ্গন এবং জগৎ-জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধের অবনমনের মুখে দাঁড়িয়ে 'ইংরাজ-রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজনসভায়' 'আতিথ্য গ্রহণ' করতে চলেছে, সদ্য-উদ্ভূত কোলকাতার নব্য-নাগরিকতার পরিবেশে তার আসন পাতার ব্যবস্থা হতে থাকলো এই যুগেই।

১. সুকুমার সেন: 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' [প্রথম খণ্ড: পূর্বার্ধ ১৯৫৯] পৃ ৭৪, ৭৬।

২. ভূদেব চৌধুরী: 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' [প্রথম পর্যায়: ১৯৫৭]: পৃ. ৯৯-১০০।

৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' [প্রথম খণ্ড: ১৯৮২]: পৃ. ২২৬, ২৫৬।

৪. ক্ষেত্র গুপ্ত : 'পুরাতন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' [১৯৬৮] পৃ. ৩৫-৬।
৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার : 'বাংলাদেশের ইতিহাস' [২ খণ্ড : ১৯৬৪] : পৃ. ৩৭৩।
৬. দ্রষ্টব্য ৪নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ৩৭।
৭. ঐ ঐ : পৃ. ৩৮।
৮. ওয়াকিল আহমদ : 'বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত' [ঢাকা : ১৯৭৪] : পৃ. ৮৩।



□ প্রাচীন যুগ □

১. 'সেক-শুভোদয়া' : মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে সেক-শুভোদয়া একটি কৌতূহলোদ্দীপক গ্রন্থ। এটি বর্তমান যুগের পাঠক-গবেষকদের দৃষ্টি গোচর হওয়ায় একাধারে কৌতূহল ও বিস্ময় দেখা দিয়েছে। গ্রন্থটির আবিষ্কার সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলে নিয়ে এর বিষয়বস্তু ও অপরাপর প্রসঙ্গ আলোচনা করবো।

গত শতাব্দীর শেষের দিকে মালদহের জেলা প্রশাসক উমেশচন্দ্র বটব্যাল মালদহের প্রবীণ সাহিত্যিক হরিদাস পালিতের কাছ থেকে সংবাদ পান যে, গৌড়ের বাইশ হাজারী মসজিদের মাতোয়ালীর কাছে কাগজে লেখা একটি প্রাচীন পুঁথি আছে। এবং তারা ঐ পুঁথি কোন সংকট-আপদে পাঠ করে বিপদমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে থাকে। বটব্যাল মশাই মূল পুঁথি এবং পুঁথির একটি নকল সংগ্রহ করেন। পালিত মশাই-ও একটি নকল করে রাখেন। পরে বটব্যাল মশায়ের মৃত্যুর পর ঐ নকল ও মূল পুঁথির আর সন্ধান পাওয়া যায় না। শেষে পালিত মশায়ের নকল অবলম্বনে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ড. সুকুমার সেন পুঁথিটির একটি সম্পাদিত সংস্করণ মুদ্রিত করেন। তার আগে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু 'কায়স্থ' পত্রিকায় [১৩২০-২১ বঙ্গাব্দ] বঙ্গানুবাদ সহ ১৩টি পরিচ্ছেদ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি [১৯৬৩] ড. সেন কোলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে গ্রন্থটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও ১৯৮১ সালে অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই 'সেক-শুভোদয়া' গ্রন্থটির সরল গদ্যে একটি বঙ্গানুবাদও প্রকাশ করেছেন।

এই পুঁথির প্রতি পরিচ্ছেদের পুষ্পিকায় বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি হলায়ুধ মিশ্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এতে যেরূপে ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল সংস্কৃত ব্যবহার করা হয়েছে তাতে সকলেই মনে করেন যে গ্রন্থকারের নামটি জাল। কোন অল্প সংস্কৃত জানা মুসলমান লেখক জাল নামে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। উদ্দেশ্য, ষোড়শ শতাব্দীতে যখন আকবরের নির্দেশে টোডরমল্ল এখানকার জমি জরিপ করতে আসেন, তখন মসজিদ ও তৎসংলগ্ন জমি জমাতে লক্ষ্মণসেনের সমকাল থেকে ভোগ দখলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

গদ্য-পদ্য মিলিয়ে সেক-শুভোদয়া একটি সংস্কৃত চম্পূকাব্য। এর সহজ ও কবিত্বপূর্ণ পদ্যের মধ্যে গদ্যের ভাগই বেশী। এখানে কিছু কিছু বাঙলা ছড়া বা আর্যা গীতের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। কাহিনীর দিক থেকে এতে কোন নিরবচ্ছিন্ন গল্প পাওয়া যায় না। মোট ২৫টি অধ্যায় এতে আছে, তার পরে বোধহয় পুঁথি খণ্ডিত। এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে একাধিক গল্প আছে। জলালুদ্দীন তাব্রিজি নামে এক অলৌকিক শক্তিধর সেকের রাজা লক্ষ্মণসেনের সভায় উপস্থিত হয়ে নানা আজগুবি ঘটনা ও আচরণের দ্বারা সকলের বিস্ময়-বিমুগ্ধ শ্রদ্ধা আকর্ষণের ও রাজার দ্বারা সম্বর্দ্ধিত ও সম্মানিত হওয়ার কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে। অনেক গাল-গল্প, ও ভুল সংস্কৃতের প্রয়োগ থাকলেও সেদিনের বাঙলায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিলো তা জানতে হলে এই গ্রন্থটি থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ বাইরের এবং ভেতরের প্রমাণ দৃষ্টে মনে করেন যে এই পুঁথির রচনাকাল কিছুতেই ১৬শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয়।

এই গ্রন্থের ভাষাকে আমরা খিচুড়িভাষা [সুনীতিকুমারের ভাষায় dog Sanskrit] বলতে পারি। ব্যাকরণকে পীড়ন করে, অবাধ স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে ভাষা ব্যবহার করেও একটি গ্রন্থ যে কিভাবে সসম্মানে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে তার বিরল দৃষ্টান্ত এটি। লেখক অনেক সময় বাঙলা বাক্য প্রয়োগ বা বাগ্‌ধারাকে যেন বাঙলায় চিন্তা করে নিয়ে সংস্কৃতে রূপান্তরিত করেছেন। যেমন: 'ত্বম অস্মাকং গৃহকথাং ন জানাসি' : 'তুমি আমার বাড়ীর কথা জান না।' 'স পশ্যতি না পশ্যতি : সে দেখতে না দেখতেই'। 'তব বক্তে্‌ ভস্ম দত্তম্ : 'তোর মুখে ছাই'। ইত্যাদি।

২. 'গোবিন্দদাসের কড়চা' : ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের হেড পণ্ডিত এবং অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশধর জয়গোপাল গোস্বামী 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামে একটি চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেন। গোস্বামী মহাশয়ের মতে চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় গোবিন্দদাস কর্মকার নামে জনৈক ভক্ত ভৃত্যরূপে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। ইনিই চৈতন্যজীবনের অন্তিমকালে বা তিরোধানের পরে ষোড়শ শতাব্দীর কোন এক সময়ে ডায়েরী [Diary : 'কড়চা'] ধরনের এই পুঁথিটির রচনা করেন ['কড়চা করিয়া রাখি শক্তি অনুসারে']। শান্তিপুরের এই গোস্বামী মশাইকে অনুসরণ করে ড. দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ প্রথম যুগের সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ ও বৈষ্ণবভক্ত সম্প্রদায় এই কড়চা গ্রন্থটিকে চৈতন্য-জীবন সম্পর্ক একটি মূল্যবান এবং এ-পর্যন্ত অপ্রকাশিত দলিল হিসাবে গ্রহণ করেন। কারণ, শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-জীবনের সূচনা লগ্নে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সম্বন্ধে কোথাও বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। তাই গোবিন্দদাসের কড়চার প্রথম প্রকাশে বৈষ্ণব ভক্ত ও অনুরাগী এবং অনুসন্ধিৎসু মহলে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিলো।

এই কাব্যের অনুসরণে জানা যায় যে বর্ধমান জেলার কাঞ্চনপুরে কবির বাস।

কবির পিতা শ্যামাদাস, মাতা মাধবী। পত্নী শশিমুখীর হাতে লাঞ্ছিত কবি গৃহত্যাগ করে মহাপ্রভুর ভৃত্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গী হন।

কিন্তু এই সব সত্ত্বেও 'গোবিন্দদাসের কড়চা'র মর্যাদা রক্ষিত হয় নি। কিছু দিনের মধ্যেই এই নকল-অর্বাচীন ও জালিয়াতিপূর্ণ চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থ এবং তার আবিষ্কর্তা জয়গোপাল গোস্বামী নিপুণ বিশ্লেষক, সতর্ক ইতিহাসকার এবং যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ সমালোচকদের দ্বারা ধরাশায়ী হন। সমগ্র চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলি তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনো গোবিন্দদাস কর্মকারের সন্ধান পাওয়া যায় নি। এর ভাষা বিচার করেও আধুনিকতার স্পষ্ট হস্তাবলেপ:ক খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। ফলে, 'নূতন কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও কড়চা ও কড়চার কবি গোবিন্দদাস কর্মকারের অস্তিত্ব স্বীকার করা কঠিন হয়ে পড়ে। যুক্তিতর্কের ওপরে বিশ্বাসকে স্থান না দিলে গোবিন্দদাসের কড়চাকে খাঁটি বলা অসম্ভব।'

৩. **'শ্রীকৃষ্ণবিজয়':** শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ খণ্ড অবলম্বনে কবি মালাধর বসু ১৪৭৩-৭৪ থেকে ১৪৮০-৮১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ['তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন। চতুর্দশ দুই শকে হইল সমাপন।'] তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থটি রচনা করেন। মোট ১৮ হাজার শ্লোক সম্বলিত তিনশত বত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত সর্বসমেত বারোটি স্কন্দ বা পর্বে সমৃদ্ধ উক্ত সংস্কৃত ভাগবত। এ আঠারোটি হিন্দু মহাপুরাণের অন্যতম,—তার মধ্যে কেবল দশ থেকে বারো এই তিনটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বৃন্দাবন এবং অপরাপর লীলাকাহিনী বর্ণিত আছে।

বৈষ্ণব সমাজে মালাধর সু-সম্মানিত হলেও তাঁর কাব্যের পুঁথি-সংখ্যা সুপ্রচুর নয়। এবং কাব্যমধ্যে তাঁর আত্মপরিচয়ের পরিমাণও খুবই কম। যা পাওয়া যায় তা থেকে জানা যাচ্ছে যে, কবির জন্ম বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম ইন্দুমতী, পুত্রের নাম সত্যরাজ খান এবং পৌত্র রামানন্দ। এই রামানন্দ চৈতন্যদেবের একজন প্রিয় ভক্ত এবং পার্ষদ ছিলেন। এই সমস্ত সমসাময়িক এবং স্ব-গ্রামে কবি-প্রতিষ্ঠিত এবং সন-তারিখযুক্ত একটি বৃষমূর্তি থেকে মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে কবি ১৫শ শতাব্দীর ৩-৪ দশকের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

মালাধরের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' অত্যন্ত সুললিত কাব্য। এর মধ্য দিয়ে কবির ভক্ত হৃদয়ের তপ্ত আবেগ এবং উজ্জ্বল বৈদগ্ধ্য আস্বাদন করতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। এই শক্তিতেই তিনি ভাগবতে ধৃত ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বের সার কথাগুলিকে সরল ভাষায় এবং খুব সহজ ভাবে বর্ণনা করতে পেরেছেন। কবি তাঁর অনুবাদ কর্মে যতদূর ভাগবতের অনুসরণ করেছেন, ততদূরই মূলানুগত্য বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন। এবং এতে করে তাঁর স্বাধীন কবি-ক্ষমতা প্রকাশিত হতে বাধা-প্রাপ্ত হয়নি। কবি নিজে বাঙালী, তাই বাঙালীর জীবনাচরণ ও ঐতিহ্যেই তাঁর মানসিকতার সৃষ্টি, সে কথাও এখানে অপ্রকাশিত থাকে নি। তাই শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে ব্রজের রাখাল বালকদের সঙ্গে পান্তা

ভাত খেয়েছেন। মথুরা-বৃন্দাবনের গৃহাঙ্গিনায় বাঙলা দেশের কলাগাছ ও বাগানে সুপারি গাছের সারি দেখা গেছে। দানলীল, নৌকালীলা ইত্যাদি বাঙলার নানা লোকায়ত গল্পেরও এতে স্থান পেতে অসুবিধা হয় নি। আসলে কবি চেয়েছিলেন : 'ভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে। / লৌকিক করিয়া কহি লৌকিকের মতে ॥' এবং এই লোক-পরিতৃপ্তির কারণেই বোধহয় 'গুণহীন' [?] কবিকে : 'গুণ নাই, অধম মুই, নাই কোন জ্ঞান। / গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান ॥'

আগেই বলেছি যে, মালাধর সংস্কৃত ভাগবতের অংশ মাত্র অনুবাদ করেছিলেন ; যার মধ্যে পাচ্ছি : কৃষ্ণ আবির্ভাবের কারণ ; কৃষ্ণ জন্ম ও লীলা এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনা। যেমন :। ১। বৃন্দাবনলীলা,—কৃষ্ণের মথুরা যাত্রায় এর শেষ। ২। মথুরায় গমন এবং সেখানকার লীলা শেষ হয়েছে দ্বারকায় রাজধানী তৈরির মধ্যে দিয়ে। ৩। এই কাহিনী-পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে বিষ্ণুর অবতারত্ব নয়—একান্তভাবে কৃষ্ণের শক্তি, শত্রুনাশ ও শাপমোচনের কথা বীররসে সিক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

পরিশেষে, কাব্যটির 'বিজয়' নাম সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন যে, 'বিজয়' শব্দের অর্থ হিসাবে কেউ 'মৃত্যু'. কেউ বা 'যাত্রা' বুঝিয়ে থাকেন। কিন্তু কৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছে ১২শ খণ্ডে। মালাধর অতদূর যান নি। কিন্তু যেখানে কাব্য শেষ হয়েছে সেখানে দ্বারকা যাত্রা ও দ্বারকা-লীলার কথাই আছে। তাই শ্রীকৃষ্ণের 'বিজয় যাত্রা' অর্থেই 'বিজয়' কথাটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। এখন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর থেকে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃতির মাধ্যমে ঐ কাব্যের রস আস্বাদন করা যেতে পারে :

'হাসিতে হাসিতে দুহেঁ করিল গমন / সেইকালে নানা মূর্তি ধরে নারায়ণ ॥/মল্ল সব দেখে যেন বজ্রের সমান। / ধার্মিক রাজা দেখে সুন্দর মূর্তিমান ॥ / স্ত্রীগণ দেখে যেন অভিনব মদন। / নন্দ আদি গোপ দেখে যেন শিশুগণ ॥ / রাজা সব দেখে যেন দণ্ড হস্তে কাল। / বসুদেব দৈবকী দেখে কোলের ছাওয়াল ॥'

মালাধরের মতো নিষ্ঠাবান কবির দ্বারা অনুশীলন-ধন্য বাঙালীর প্রিয় 'কানুগীতি' এবং চৈতন্যদেবের আস্বাদিত হয়েও কিন্তু ভাগবতের অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়-এর ধারা যোগ্য উত্তরাধিকারীব দ্বারা পরিচর্চিত হলো না ; এই কাব্য-শাখার পক্ষে এ-এক দুঃখজনক সীমা-বাঁধ ['মালাধর বসু'-টীকাতেও এই উত্তর হবে।]।

৪. **বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা 'বাইশা'** : মনসামঙ্গল কাব্যের সংকলন গ্রন্থ [composite text] 'বাইশা' বা 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল' নামে পরিচিত। ১৩০১ বঙ্গাব্দে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত [২য় সং] ঐ ধরণের একটি সংকলনের ভূমিকায় যা বলা হয়েছে তা উদ্ধৃত করলেই বাইশ কবির মনসামঙ্গল বলতে কি বোঝায় তা অনেকখানি স্পষ্ট হবে : 'শ্রীশ্রীপদ্মপুরাণ অনুসারে অতি পূর্বকালে বাইশজন কবি মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীমনসাদেবীর পূজা প্রকাশ উপলক্ষে চন্দ্র সদাগরের বিবাদ ইত্যাদি যে ঘটনা হইয়াছিল তাহা রচনা করিয়াছিলেন, এইজন্য এই পুস্তকের নাম বাইশ কবির মনসা।' এই প্রসঙ্গে এ-কথা মনে রাখা দরকার যে বাইশা

বা বাইশ কবি বলতে নির্দিষ্ট করে বাইশজন কবিকেই বোঝান হবে এমন কোন কথা নেই ; কারণ, মধ্যযুগের বাঙলায় বহুত্ব-বোধক অর্থেও বাইশা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে ['কাজী বোলে বাইশা-বাজারে টিলা মারি। প্রাণ লহ আর কিছু বিচার না করি ॥ বাইশ-বাজারে মারিলেহ যদি জীয়ে। তবে সব জানি, জ্ঞানী সাঁচা কথা কহে।.' : 'চৈতন্যভাগবত' : আদিখণ্ড, ১১ অ,]। 'অতএব বাইশ শব্দ বহু অর্থ বাচক। বাইশ কবির মনসামঙ্গলের বা বাইশার অর্থও তাই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে শ্রীহট্ট, মৈমনসিংহ, বরিশাল ও রাঢ় এই চার অঞ্চলেই বাইশার রীতি প্রচলিত ছিল, অবশিষ্ট বঙ্গের অন্যত্র এমন সংকলনের প্রচলন প্রায় ছিলই না বলা চলে।'

আমরা জানি, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের প্রচার-মাধ্যম ছিলেন মূলত গায়েনগণ তাঁরাই সাধারণত যখন যে অঞ্চলে মনসার গান করতেন তখন সেই স্থানের বিভিন্ন কবির রচিত মনসামঙ্গলের কবিত্ব ও আবেগপূর্ণ স্থানগুলিকে নির্বাচিত করে নিয়ে একটি সংকলনের মাধ্যমে একটি পূর্ণ কাহিনী-কাব্যের আকারে গান করতেন। এইভাবে বহু কবির রচনা একত্র করে একটি পুঁথি গাঁথা হতো। এই-ই আমাদের কাছে বাইশা নামে পরিচিত। এই 'বাইশা'-সংকলন যেমন প্রাচীন ও প্রামাণিক তেমনই এর পাপাশাশি 'ষট্‌কবি' নামে আর এক ধরণের সংকলন চলিত ছিল যা আকারে ক্ষুদ্র অর্বাচীন এবং অশিক্ষিত জনরুচির তারল্যে রচিত ['বাইশ কবির রচনা যেমন অতিশয় মধুর ও সর্বজনাদৃত, ষট্‌কবির রচনা তেমনি অশ্লীল ও ঘৃণিত। ··অশিক্ষিত লোক ষট্‌কবি রচনা করিয়া তাহা সর্বসাধারণের নিকট আদৃত হইবার জন্য পূর্বপ্রণীত বাইশকবি হইতে গ্রন্থকারেরও নাম ও ভণিতা স্থলে স্থলে যোজনা করিয়া দিয়াছেন']।

মনসামঙ্গল বা এই ধরণের পদ সংকলন পুঁথি সম্বন্ধে মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক বলেছেন : 'পদসঙ্কলনের এই রীতি কেবলমাত্র যে মনসামঙ্গল সম্পর্কেই প্রচলিত ছিল তাহা নহে—মধ্যযুগে ব্যবসায়ী গায়েনগণ মনসা-মঙ্গল ব্যতীতও যে সকল পাঁচালী গান করিতেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই এই প্রকার সঙ্কলন সম্পাদন করিয়া লইতেন। এইভাবে রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদের এবং অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেরও সঙ্কলনের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব পদসঙ্কলনের কথা সর্বজনবিদিত।' সে যাই হোক, মনসামঙ্গলের সঙ্কলনের অনেক পুঁথি থাকলেও সু-সম্পাদিত বাইশার মুদ্রিত গ্রন্থ বিশেষ পাওয়া যায় না। ঢাকা-চট্টগ্রাম কলকাতা থেকে গোটা তিন-চার মুদ্রিত বাইশা প্রকাশিত হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত এবং ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত [২য় সং ১৯৬২] 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা' গ্রন্থটিই সর্বোৎকৃষ্ট ; কারণ, 'মধ্যযুগের বাইশাগুলি আঞ্চলিক ভিত্তিতে সঙ্কলিত হইত, সমগ্র বাংলাদেশের ভিত্তিতে সঙ্কলিত হইত না—বর্তমান সংগ্রহখানি সমগ্র বাংলাদেশের ভিত্তিতে সঙ্কলিত হইয়াছে'।

৫. **কবি কাহ্নপা :** আদি বাঙলা সাহিত্যের প্রধানতম কবি হিসেবে আমরা কাহ্নপা বা কৃষ্ণপাদকে গ্রহণ করতে পারি। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'র পদসংকলন-

গ্রন্থের মধ্যে কাহ্নপা-র মোট তেরটি পদ [৭, ৯-১৩, ১৮, ১৯, ২৪, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫] গৃহীত হয়েছে। এইগুলি ছাড়াও তিনি আরও পদ রচনা করেছিলেন কিনা—সে-সম্বন্ধে নিশ্চয় করে আজ কোনো কিছু বলা কঠিন।

সেই সুপ্রাচীন কালের সিদ্ধ যোগী এইসব সন্ন্যাসীদের জীবন-পরিচয় কিছুই জানা যায় না। তবে চর্যাপদে কাহ্নপায় যে তেরটি পদ সঙ্কলিত আছে তা বিশ্লেষণ করে সামান্য যা কিছু এ২ কবি সম্বন্ধে উদ্ধার করা যায় তা এই রকম: ১। কবির নাম হলো, জালন্ধরীপাদ। ২। কবি তাঁর প্রত্যেকটি পদের মাথায় যে ভাবে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর উল্লেখ করেছেন তাতে মনে হয় তিনি সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ৩। তিনি ছিলেন সহজিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের যোগীপুরুষ। তাঁর রচনায় বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় তন্ত্রের প্রভাব পড়েছে। খুব সম্ভব তিনি দুই শাস্ত্রেই পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কোন এক কৃষ্ণাচার্যপাদের দোহা আবিষ্কার করে বলেছিলেন যে উভয় কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নপা একই ব্যক্তি; কিন্তু এ বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করেন।

প্রখ্যাত পণ্ডিত রাহুল সংস্কৃত্যায়ন শ্রমসাধ্য অনুসন্ধান করে প্রাচীন বৌদ্ধগুরু চৌরাশী সিদ্ধার যে তালিকা নির্ণয় করেছেন তাতে জালন্ধরীর শিষ্য কাহ্নপাকে কায়স্থ সন্তান বলে মনে করেন এবং তিনি দেবপালের রাজত্ব কালে সোমপুরীতে বসবাস করতেন। এ-ছাড়াও বাঙলায় নাথধর্ম-সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ঐতিহ্যে জালন্ধরী বা হাড়িপার শিষ্য এক কাহ্নপার কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। এবং ঐ গল্পে কাহ্নপার জীবন-কথা প্রায় লোক-পুরাণের স্তরে পৌছে গেছে। ফলে, এই মিথ্ থেকে কল্পনার অতিরেক বাদ দিয়ে প্রকৃত ইতিহাস খুঁজে পাওয়া কঠিন। তা সত্ত্বেও একথা মেনে নিতে অসুবিধা হয় না যে এক বা একাধিক কাহ্নপা আমাদের প্রাচীন সাহিত্য বা ধর্ম চর্চার ক্ষেত্রে বর্তমান ছিলেন; যেমন, ড. সুকুমার সেন বাঙলা চর্যাপদের ভাবগত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দুজন কাহ্নপার অস্তিত্ব নির্ণয় করেছেন। ১০, ১১, ৮, ১৯, ৩৬ ও ৪২নং চর্যাপদগুলিতে তান্ত্রিক দেহ সাধনার কথা আছে; হিন্দু তন্ত্রের পরিভাষানুযায়ী ডোম্বী, পদ্ম, খাট, আলিকালি, সহজ, কান্ধ ইত্যাদির ব্যবহার। অন্যদিকে ৭, ৯, ১২, ১৩, ২৪, ৪০, ও ৪৩নং পদে আছে তান্ত্রিক জ্ঞান সাধনার কথা; ফলে বৌদ্ধ তন্ত্রের পরিভাষা যেমন, জিনউর এবং মার, তথ্যতা, তথাগতা, করুণা, শূন, মহাসুহ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে। এর থেকে তিনি একজন ছোট কাহ্নপার অস্তিত্ব অনুমান করেছেন।

আমরা আগেই বলেছি যে, বাঙলা চর্যাপদ সঙ্কলনে সংগৃহীত সাড়ে ছেচল্লিশটি কবিতার মধ্যে কবি কাহ্নপাদ রচিত পদের সংখ্যা তেরটি, যা সর্বাধিক। এইখানেই তাঁর অগ্রগণ্যত্ব। এই প্রাধান্যের কারণ তাঁর কবি প্রতিভার মধ্যেই নিহিত। তিনি 'একাধারে চর্যাধর, সিদ্ধ সাধক ও কবি।...তাঁর গীতে কবিত্ব আছে, নাটকীয়তা আছে, আছে ছোট গল্পের দীপ্তি ও লোকচরিত্রের সমালোচনা। গৌড়বঙ্গের সমাজ-

চিত্র উদ্‌ঘাটনের দিক হইতে কাহ্নপাদের কয়েকটি গান অমূল্য ঐতিহাসিক উপাদান। সমাজে ডোম্বীর স্থান, তাহাদের জাতিগত বৃত্তি ও স্বভাব এবং বিবাহ-চিত্র—বঙ্গ ইতিহাসের একটি দিকে আলোক সম্পাত করিয়াছে। তাঁহার কবি দৃষ্টিও শিল্পীর মত স্বচ্ছ ও সুন্দর।' তাঁর পদগুলির অন্তর্গত ৪২নং পদে সাধক-কবির কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর সর্ব-সুন্দর ভাবে মুদ্রিত আছে। তার একটু নমুনা এই রকম : 'চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না। কান্ধবিয়োএঁ মা হোহি বিসন্না॥ ভণ কইসে কাহ্ন নাহি। ফরই অনুদিন তৈলোএ পমাই॥'

৬. ব্রজবুলি : মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য, বিশেষত বৈষ্ণবকাব্য—আস্বাদন কালে আমরা 'ব্রজবুলি' নামে একটি ভাষার সংস্পর্শে এসে থাকি। কিন্তু মধ্যযুগে যে ঐ ভাষাকে 'ব্রজবুলি' বলা হতো এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'ব্রজবুলি' শব্দটি ঠিক কবে থেকে লিখিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা নির্ণয় করা কঠিন। "কারণ, আধুনিক যুগের পূর্বে বাঙলাদেশে পুঁথি-পত্রের কোথাও ব্রজবুলি শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য ১৬শ শতাব্দীতে আসামে 'ব্রজবুলি' শব্দের প্রযোগ পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞের মতে আধুনিক কালে ঈশ্বর গুপ্তই 'ব্রজবুলি' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। অথচ মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাঙলাদেশে জনসাধারণের মুখে 'ব্রজবুলি' বহুলভাবে চলে আসছে।"

এমন যে 'ব্রজবুলি' এবার তার কুলজিনামা গ্রহণ করা যাক। মোটামুটিভাবে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, 'ব্রজবুলি বাঙলার একটি উপভাষা। উপভাষা বটে তবে কখনই কথ্য ভাষা ছিলো না। মূলত অবহট্‌ঠ ও মৈথিলভাষার মিশ্রণ জাত হলেও বাঙলা দেশে, বাঙালী কবির হাতে এবং বাংলা সাহিত্যের আশ্রয়ে ও রস-সঞ্চারে পুষ্ট ও পরিবর্ধিত হয়েছিল বলেই একে বাঙলার উপভাষা বলা হয়েছে।' মোটামুটিভাবে বিদ্যাপতি বা তাঁর কিছু পূর্ববর্তী মিথিলার উমাপতি উপাধ্যায়ের সময় থেকে এই 'ব্রজবুলি' জন্মলাভ করে উনবিংশ শতাব্দীতে তরুণ রবীন্দ্রনাথের কলমেও এ ভাষা স্থান পেয়েছে। নরহরি সরকার, নরহরি চক্রবর্তী, গোবিন্দদাস কবিরাজ, জ্ঞানদাস প্রমুখ কবির পরিচর্যার ফলেই 'ব্রজবুলিতে' উৎকৃষ্ট রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক পদ রচিত হয়েছে। এই পটভূমিকায় 'ব্রজবুলি' ভাষার উৎপত্তি ও বিশিষ্টতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে : ক বিদ্যাপতির ভণিতায় বাঙলা দেশ বা তার আশ-পাশ থেকে প্রাপ্ত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলির ভাষা খাঁটি মিথিলার বা মৈথিল নয়। এগুলির ব্যাকরণে কিছু গণ্ডগোল এবং শব্দ প্রয়োগে বৃহৎ বঙ্গের [ওড়িয়া-অসমিয়া ও বাঙলার] ভাষার অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। মিশ্র ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির পদগুলি আবিষ্কারের পর বলা হলো এগুলি 'ব্রজবুলি' ভাষায় রচিত।

খ এই রকম নাম দেওয়ার কারণ এই যে রাধা-কৃষ্ণের দেশ ব্রজ বা বৃন্দাবন-বাসিগণ দ্বাপর যুগে বোধহয় এই ভাষাতেই কথা বলতেন, এবং কবি বিদ্যাপতি তারই অনুসরণে না মৈথিল, না বাঙলা অথবা অন্য কিছু ভাষায় এই পদ রচনা করেছেন।

কিন্তু ভাষাতত্ত্বের বিচারে দেখা গেছে যে এই 'ব্রজবুলি' কোন দিনই বৃন্দাবন বা ব্রজের ভাষা ছিলো না। বৃন্দাবনের কথ্য ভাষার নাম 'ব্রজ্ভাষা' বা ব্রজ্ভাখা'। এটি পশ্চিমা অপভ্রংশের বা 'শৌরসেনী'র বংশধর। এটি একটি জীবন্ত কথ্য ভাষা, যা আজও প্রচলিত রয়েছে।

গ. এখন কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মত এই যে : বিদ্যাপতি যেহেতু মিথিলার অধিবাসী সেহেতু তিনি মৈথিল ভাষাতেই পদ রচনা করেছিলেন। কিন্তু তা যদি হয় তবে তাঁর ভণিতায় প্রাপ্ত ব্রজবুলিতে লেখা পদগুলি কোথা থেকে এলো? তার উত্তরে তাঁরা বলেছেন : ১। বিদ্যাপতি তাঁর সরস কবিত্বগুণে বাঁঙালী রসভোক্তাদের আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। ২। বাঙালী ছাত্রেরা তৎকালে শাস্ত্রালোচনার পীঠস্থান মিথিলায় গিয়ে বিদ্যাপতির পদগুলি আয়ত্ত করতো এবং দেশে ফিরে এসে বা আসার পথে ঐগুলির পুনরালোচনা কালে উচ্চারণে, ভাষা-ব্যাকরণে স্থান এবং কাল প্রভাব-বশত বিকৃতি ঘটিয়ে ফেলতো। ৩। এবং এই বিকৃতিই মূল মৈথিলকে শ্রুতিসুখকরতায় অতিক্রম করে যায়। ফলে, শ্রীচৈতন্যদেবের আস্বাদন-সৌভাগ্য মাথায় নিয়ে, বিদ্যাপতির পদের বিকৃত রূপকে আদর্শ মেনে, পরবর্তী বৈষ্ণব কবিগণ 'ব্রজবুলি' নামক একটি কৃত্রিম-সৃষ্ট ভাষায় উৎকৃষ্ট পদ রচনা করে আমাদের ভাবুকতার সমস্ত নিভৃত দ্বারগুলিকে খুলে দেয়।

ঘ. তবে এ-প্রসঙ্গে এ-কথাও অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে বহু ভাষাবিদ, ছন্দোনিপুণ, কাব্যদেহ-প্রসাধনে সুচতুর, সুকবি বিদ্যাপতি তৎকালে প্রচলিত মৈথিলীতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার মধুর ভাবকে বাঁধবার জন্যে ভাষার দেহের বাঁধনকে অনেকখানি আলগা করে নেওয়ার পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। যার কাঠামো সামনে রেখে অনতিদূরকালে বাঙালীর পেলব কাব্য-নিষ্ঠা সুঝঙ্কৃত হয়ে উঠে সৃষ্টি হয় 'ব্রজবুলি'।

ঙ বিদ্যাপতিকে সামনে রেখে বাঙলায় 'ব্রজবুলি' ব্যবহারের পাশে পাশে ওড়িশা এবং আসামেও আমরা তার ঝঙ্কার শুনতে পেলাম। যদি সামনে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো না থাকতো তবে একটি অজ্ঞতা বা অক্ষম-সৃষ্ট কৃত্রিম ভাষার পক্ষে এমন সুদূরবিস্তারী সর্বজনীনতা লাভ করা সম্ভব হতো না।

এখানে আমরা চৈতন্যোত্তর-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাসের লেখা একটি পদের কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করে 'ব্রজবুলির'র উদাহরণ উপস্থিত করলাম : 'মন্দির বাহির কঠিন কপাট। / চলইতে পঙ্কিল শঙ্কিল বাট॥ / তঁহি অতি দূরতর বাদল দোল। / বারি কি বারই নীল নিচোল॥ / সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার। / হরি রহ মানস-সুরধুনী পার॥'…

৭. **শিক্ষাষ্টক :** মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভাবাবেশে যে আটটি শ্লোক পাঠ করেছিলেন তা-ই 'শিক্ষাষ্টক' নামে পরিচিত। মহাপ্রভু তাঁর সন্ন্যাস-জীবনের শেষার্ধে নীলাচলে বসবাস কালে প্রায় সর্বদাই ভাবাবিষ্ট হয়ে থাকতেন। এই সময়ে তাঁর সঙ্গে বৈষ্ণব-

তত্ত্ব আলোচনায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলা-রসের আস্বাদনের সঙ্গী ছিলেন স্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দ। আবেশে তিনি সংস্কৃতে আটটি শ্লোক পাঠ করেছিলেন। পরমভক্ত কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে বলেছেন যে এই শ্লোক আটটি মহাপ্রভুরই রচনা: ['এই মত মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা। / প্রলাপ করিল কিছু শ্লোক পড়িয়া॥ / পূর্বে অষ্ট শ্লোক করি লোকে শিক্ষা দিল। / সেই অষ্ট শ্লোক অর্থ আপনে আস্বাদিল॥ / প্রভুর **শিক্ষাষ্টক** শ্লোক যেই পড়ে শুনে। / কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥' অন্ত্য: ২০]। এ-বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা কঠিন।

এই আটটি শ্লোককে বৈষ্ণবগণ আচরণী শিক্ষামন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। এই জন্যেই বোধ হয় এদের 'শিক্ষাষ্টক' বলে। এই শ্লোকগুলির মধ্যে দিয়ে মহাপ্রভুর জীবন-বেদ তথা তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে নিজস্ব আচরণ-দর্শন কি, তার তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। এই শ্লোকগুলির মধ্যে দিয়ে হরি বা কৃষ্ণ নাম-মাহাত্ম্য, কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ ও তাতে তদ্গত হওয়ার অবস্থার কথা সুসংবদ্ধ এবং শিক্ষণীয় ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্ত বৈষ্ণব ও শিষ্যদের সামনে একটি শিক্ষাযোগ্য আদর্শ-বাক্য তুলে ধরবার জন্যেই এই শ্লোকগুলি তাঁর পদাবলীতে উদ্ধৃত করেছেন,—যাতে চৈতন্য-ধার্মিকেরা নাম-মাহাত্ম্য, প্রেম-স্বরূপ ও ভক্তিধর্মের সার কথাগুলি অনুধাবন করতে পারেন। এই শ্লোকগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ভাবে সাধারণেও পরিচিত। যেমন: ১। 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। / অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'॥ [অর্থ: 'তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম। / আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥ / তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণবে করিবে। তাড়ন-ভর্ৎসন করে কিছু না বলিবে॥'

'শিক্ষাষ্টকের'র শেষ শ্লোকটিতে কান্তকে বা অপ্রকৃত নায়ককে [শ্রীকৃষ্ণকে] মধুরভাবে ভাবিত বা কান্তা অপ্রাকৃতা নায়িকা বা রাধা আপনার যা-কিছু তা সর্বস্ব অর্পণের কথা উল্লেখ করে বলেছেন: 'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা। / যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো, মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপর:॥' [অর্থ: সেই হরি কৃপা করে আমায় আলিঙ্গন করুন অথবা তাঁর চরণ তলে আমাকে মর্দন করুন কিংবা অদর্শনের দ্বারা আমাকে মর্মাহত করুন, সেই লম্পট যাতে সুখী হন তাই ই করুন, কিন্তু আমি মনে করি যে তিনিই আমার প্রাণনাথ, অপর কেউ নন।]।

৮. খেতুরীর মহোৎসব বা খেতুরীর বৈষ্ণব মহাসম্মেলন: খেতুরী বা খেতরী বাঙলার [অধুনা 'বাঙলাদেশ' রাষ্ট্রের] রাজশাহী জেলার গড়ের হাট পরগণার একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। এইখানেই প্রখ্যাত বৈষ্ণব সাধক নরোত্তম বিখ্যাত জমিদার বংশে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমাংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ দত্ত। ইনি অল্প বয়সেই প্রবল ধর্মানুরাগ বশত গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে যান ও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। কিছু কাল এখানে থেকে উক্ত শতাব্দীর তৃতীয় পাদে তিনি শ্রীনিবাসের সঙ্গে নিজ জন্মভূমি দর্শন করতে ফিরে আসেন। কিন্তু পিতৃব্যপুত্র সন্তোষের অনুরোধে ঐখানেই পৃথক কুটীর নির্মাণ করে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং

সংসারাশ্রমে আর প্রত্যাবর্তন করেন নি। সাধন-ভজন-গান কীর্তন, প্রার্থনা ও কবিতা রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি দিনপাত করতে থাকেন।

এই অবস্থায় তিনি স্ব-আশ্রমে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, রাধাকৃষ্ণ প্রমুখের বিগ্রহ-মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সমগ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ জানিয়ে এক বিরাট মহাসম্মেলনের আয়োজন করেন। সময়টি হচ্ছে তাঁর বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের অনতিকাল পরে ['খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ে—সম্ভবত তৃতীয় পাদে, ' হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।] এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন উক্ত পিতৃব্য পুত্র, সন্তোষ। এই মহোৎসবই খেতুরীর বৈষ্ণব মহাসম্মেলন বা 'খেতুরীর মহোৎসব' নামে বাংলা-দেশের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে।

এই মহোৎসবের তাৎপর্য এই রকম : ১। মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে যে এই উৎসব থেকেই বা এঁদের প্রচেষ্টাতেই বাঙলায় রাধাকৃষ্ণের যুগল চিন্তা-জাত উপাসনার ধারা প্রবর্তিত হয়। ২। এই উৎসবের নেত্রীত্ব গ্রহণ করেছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর প্রথমা পত্নী পূজনীয়া জাহ্নবাদেবী। ৩। এই মহোৎসবে বাঙালাদেশের প্রায় সমস্ত বৈষ্ণবই যোগদান করেছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের যে-সমস্ত সাক্ষাৎ পার্ষৎ তখনও জীবিত ছিলেন, তাঁদেরও মহাসমাদরে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয়েছিলো। ৪। মোটামুটি ভাবে এই অনুষ্ঠানের ফলকে আশ্রয় করেই সমগ্র উত্তরবঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ঘটে ও প্রচার-কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ৫। এখানেই নরোত্তমের চেষ্টায় প্রথম পালাবদ্ধ রসকীর্তনের প্রতিষ্ঠা ঘটে; যা সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ৬। এই রসকীর্তনের প্রবেশক হিসাবে নরোত্তম 'গৌরচন্দ্রিকার'ও প্রবর্তন করেন। ৭। নরোত্তমের বিশিষ্ট ও অভিনব বৈষ্ণব-ভজন, রস সঙ্গীতের এই ধরণের একটি আঙ্গিক রচনার কাজে তাঁকে সাহায্যে করেছিলেন সে-যুগের প্রখ্যাত মার্দঙ্গিক দেবীদাস ও গৌরাঙ্গদাস। প্রধান দোহার গায়ক দু-জন হলেন শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ এবং আরও অনেক বিদগ্ধ বৈষ্ণব মহাজন। ৮। ধ্রুপদ গানের ঠাটে বা গঠনে বিলম্বিত লয়ে এই পদাবলী কীর্তনশৈলী গড়ের বা গরাণহাটী নামে পরিচিত হয়। ৯। পরম বৈষ্ণব, বৈষ্ণব-সাহিত্য-সমালোচক, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন : "প্রাচীন বৈষ্ণব সমাজে জনশ্রুতি শুনেছি, এঁরা চারজন পুরীধামে গিয়ে শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদরের কাছে গীত ও বাদ্য শিক্ষা করে এসেছিলেন। খেতুরীর মহোৎসবে : 'শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের উল্লাসে। / সুসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিল দেবীদাসে॥ / দেবীদাস গায়ক বাদকগণ লইয়া। / আইলেন গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে হর্ষ হইয়া' ॥" ১০। খেতুরীর বৈষ্ণব মহাসম্মেলনে নরোত্তমের আন্তরিকতায় যে পালাবদ্ধ বৈষ্ণব রসকীর্তন-ধারার সূচনা হয়, তা বাঙালীর কবিহৃদয়ের নিভৃতে যতগুলি দ্বারা ছিলো সবগুলিকে সঙ্গীত রসসমুদ্রের দিকে উন্মুক্ত করে দিয়ে তার সাঙ্গীতিক প্রতিভাকে আরও সমৃদ্ধ ও শ্রীময়ী হয়ে উঠতে সাহায্য করে; এবং এই-খানেই খেতুরীর মহোৎসবের সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

সাধক কমলাকান্তঃ শাক্ত ধারণার অন্যতম প্রধান সাধক হলেন কমলাকান্ত। তিনি কেবল একজন আত্মনিমগ্ন শ্রদ্ধেয় সাধকই নন, একজন প্রতিভাবান কবিও। এ-প্রসঙ্গে তাঁর পাণ্ডিত্যের কথাও সম্ভ্রমের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়।

সাধক-কবি কমলাকান্তের জন্ম হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকা-কালনায়। তাঁর পিতার নাম মহেশ্বর এবং মাতার নাম মহামায়া। পিতা মৃত্যুর পর ইনি মামার বাড়ী চান্নায় চলে আসেন। এখান থেকেই তাঁর দিব্য-ভাব-জীবনের প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং তিনি দিবারাত্র জগন্মাতা মহামায়ার মাতৃপ্রেমে বিভোর হয়ে থাকতেন। কমলাকান্তের ঈশ্বরীয় মহাভাবের এই তন্ময় অবস্থা দৃষ্টে কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক সাধক তাঁকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। কিংবদন্তী এই যে, কমলাকান্তের সাধনায় পরিতৃপ্ত হয়ে মহামায়া তাঁকে গোপকন্যা ও বাগ্‌দিনীর ছদ্মবেশে দেখা দেন। ক্রমে কমলাকান্তের খ্যাতি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে বর্দ্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্রের কানে পৌঁছায়। তিনি কবিকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে নিয়ে আসেন। মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজধানীর অনতিদূরে কোটালহাট গ্রামে তাঁর গৃহ ও কালীমন্দির নির্মিত হয়। এখানে তিনি পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করে এবং দীর্ঘদিন সাধন ভজন ও শাক্তপদ রচনা করতে থাকেন। পরে অলৌকিক ভাবে ঐ সাধন-আসনেই দেহ রক্ষা করেন।

আগেই বলেছি যে, "মহারাজ তেজশ্চন্দ্র কমলাকান্তের সাধনগুণে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে সভা-কবি নিযুক্ত করেন। কেউ কেউ বলেন, ইনি তেজশ্চন্দ্র মহারাজের 'গুরু' ছিলেন, কেউ বলেন—তিনি ছিলেন মহারাজের 'আশ্রিত কবি'।" সে যাই হোক, মহারাজের পুত্র মহতাবচাঁদ কবি রচিত মাতৃপদগুলি থেকে ২৫০টি নির্বাচিত করে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীকান্ত মল্লিক 'কমলাকান্তপদাবলী' নামে পূর্বোক্ত পদসংগ্রহটি কলকাতা থেকে পুনর্মুদ্রিত করেন।

সাধনায় চরম-সিদ্ধি, পাণ্ডিত্য এবং কবি দৃষ্টি এই তিনে মিলে কমলাকান্তের শাক্তপদগুলিকে অন্ত্য-মধ্য বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট গীতিকাব্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি শাক্ত-সাধনার ভাব-তন্ময়তায় পরিমগ্ন থেকেও কবি-চেতনাজাত শিল্পবোধকে বিসর্জন দেননি। তিনি সংযমী শিল্পীর মতো কবিতার স্বর্ণথালেই কাব্য-রস ভক্ত-পাঠককে পরিবেশন করেছেন। তাই রামপ্রসাদের মতো সুরে বা গানে যুক্ত না হয়েও বিশুদ্ধ পাঠ্য-কবিতা হিসাবেও সেগুলি সেব্য। মূল্যবান রত্ন সংস্থাপনে স্বর্ণহার যেমন বহু মূল্য মণিহারের মর্যাদা পায়, তেমনি কবি কমলাকান্ত তাঁর মাতৃমহাভাব সমুদ্রের গভীরে ডুব দিয়ে হৃদযন্ত্রণায় সৃষ্ট শব্দ-মুক্তাগুলিকে আহরণ করে নিয়ে এসে, নিপুণভাবে কাব্য-মণিহার রচনা করে, একই সঙ্গে বঙ্গভারতী এবং আরাধ্যার কণ্ঠে দুলিয়ে দিয়েছেন। এই জন্যেই বোধহয় সমালোচকেরা তাঁর কাব্য-মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। এবং এই বৈষ্ণব বিনতি ও আকুতিই তাঁকে তাঁর পদ মধ্যে কোথাও কোথাও ব্রজবুলি প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করেছে। কমলাকান্তের এই

কবি বিশিষ্টতার কথা বলতে গিয়ে সমালোচক মন্তব্য করেছেন : 'It is not his mediative speculation nor his theological tenets nor the vague coating of symbolism in his songs which constitute their charm ; over and above all these tower his spiritual sense his imagination and emotions, his extraordinary personality ; and the palpitating humanity which vivifies every line, imparts a soul-felt meaning to his devotional songs'. এই মন্তব্য যে কতখানি সত্য তা তাঁর : 'শুকনো তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা ভাঙে পাছে। / তরু পবন বলে সদাই দোলে, প্রাণ কাঁদে মা থাকতে গাছে ॥' অথবা ; 'আর কিছু নাই শ্যামা তোর কেবল দুটি চরণ রাঙা। /শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি দেখে হলাম সাহস ভাঙা ॥ / জাতি বন্ধু সুত দারা সুখের সময় সবাই তারা। / বিপদকালে কেউ কোথা নাই ঘরবাড়ী ওড়্ গাঁয়ের ডাঙা ॥'—পদগুলি পাঠ করলেই বোঝা যাবে। এরা সব সত্যই 'best words in best order',—এক একটি নিটোল গীতি-কবিতা।

কবি কমলাকান্ত সম্পর্কে আলোচনার উপসংহারে খুব স্বাভাবিক ভাবেই রামপ্রসাদের সঙ্গে তুলনা এসে যায়। এ সম্পর্কে অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী বলেছেন : "বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস কবিরাজের যে পার্থক্য, শাক্ত পদাবলী রচনায় রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের মধ্যেও সেই পার্থক্য। একজন ভাবতন্ময়, আত্মহারা—অন্যজন সচেতন শিল্পী ; একজন সরল অনাড়ম্বর—তাঁহাতে ছন্দোনৈপুণ্য নাই, বাক্ চাতুরী নাই—আছে আত্মহারা ভক্তের আত্মহারা ভাব : অপরজন আত্মময় হইলেও আত্মহারা নহেন ; তাঁহার বিচার আছে, সংযম আছে—তাই ছন্দের মাধুরী ও শ্রুতিমধুর শব্দ-ঝঙ্কারের প্রতি তাঁহার সজাগ দৃষ্টি, 'রসনা রোচন, শ্রবণ-বিলাস, রুচির পদ'-এর প্রতি আকর্ষণ।"

১০. **তন্ত্রবিভূতি**। মধ্যযুগের বাঙলায় মনসামঙ্গল কাব্যের অসংখ্য লেখক-সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তরবঙ্গের কবি তন্ত্রবিভূতির নাম মোটামুটি ভাবে আজ সাহিত্যের ইতিহাসকার ও পাঠকগণের কাছে পরিচিত। কারণ দীর্ঘকালের অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি [১৯৮০] এই কবির কাব্যকে মুদ্রিত গ্রন্থের মাধ্যমে শিক্ষিত গৌড়জনের সামনে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু কবির 'তন্ত্রবিভূতি নামটি বাঙলা সাহিত্যে দ্বিতীয়-রহিত, কিম্ভূত, বিস্ময়াবহ কিন্তু চিত্তাকর্ষক।' কারণ, 'বিভূতি'—বোঝা গেল কবির নাম। কিন্তু 'তন্ত্র' বলতে কবি কি বোঝাতে চাইছেন ? কবি কি জাতিতে তাঁতী ছিলেন ? হতে পারে ; কারণ, উত্তরবঙ্গে মালদহ জেলার কালিয়াচক থানা, যেখানে কবির রচনার মূল প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র তার চারদিকে আজও বহু তন্তুবায় সম্প্রদায়ের বাস। তাঁদের অধিকাংশ বৈষ্ণব অথবা মুসলমান জোলা। আবার, কবি তান্ত্রিক মতাবলম্বী ছিলেন বলে নিজেকে 'তান্ত্রিক বিভূতি'—সংক্ষেপে তন্ত্রবিভূতি নামে নিজেকে পরিচিত করিয়েছেন ;—এও হতে পারে ; তবে অধিকাংশের যুক্তি-

এই যে : ১। চৈতন্যদেবের তিরোধানের মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে রচিত এই মনসাপুরাণের কোথাও শ্রীচৈতন্যের বন্দনা বা তাঁর নামোল্লেখ নেই। কবির তন্ত্রাসক্তিই তার কারণ। ২। মালদহের কালিয়াচক থানা যদি কবির জন্মস্থান হিসেবে গৃহীত হয় তবে তার ৭।৮ মাইলের মধ্যেই তো রূপ-সনাতন ও জীব গোস্বামীর জন্মভূমি রামকেলি। অতএব বৈষ্ণব অনুষঙ্গের এত কাছে থেকেও কবি আদৌ বৈষ্ণব প্রভাবের স্পর্শ পেলেন না, তা কি ভাবে সম্ভব। ৩। কাব্যখানির সর্বাঙ্গে তান্ত্রিক ধর্ম বিশ্বাসের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। ৪। কবি কাব্যমধ্যে ভণিতায় বহুবার নিজেকে 'দ্বিজ' 'দ্বিজ সুত' ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করেছেন। ৫। এই কাব্যমধ্যে বিবিধ পুরাণের এমন সার্থক অনুসরণ আছে যাতে তাঁকে উচ্চতর সমাজের মানুষ বলেই মনে হয়।

তন্ত্রবিভূতির কাব্যের নাম 'মনসা-পুরাণ'। 'মনসা-পুরাণ'-এ মঙ্গলকাব্যের সাধারণ রীতি অনুসারে কবির কোন আত্ম-পরিচয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না! তাই আভ্যন্তর পরিচয় দৃষ্টে বলা হয়ে থাকে যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে কবির জন্ম হয়েছিলো এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই তাঁর কাব্য-রচনা সম্পূর্ণ হয়। এই গ্রন্থের কাহিনীবয়নে উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য না থাকলেও দেবখণ্ডে কিছু বৈচিত্র্য বা অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায় এবং আদিরসের বর্ণনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পর্ণোগ্রাফিকে ছুঁয়ে গেছে। এ-প্রসঙ্গে লখিন্দর কর্তৃক মাতুলানীর প্রতি বলপ্রয়োগ উল্লেখ্য।

তন্ত্রবিভূতির কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে সমস্ত সমালোচকই বেশ উচ্ছ্বসিত। কেউ কেউ তাঁকে কবিকঙ্কণের সমগোত্রীয় বলে উল্লেখ করে খুশি হন। অবশ্য এ-কথা ঠিকই যে তন্ত্রবিভূতির কাব্য-কুশলতায় অশ্রদ্ধেয় হবার মতো কিছু নেই। তিনিও অপরাপর মধ্যযুগীয় কবির মতই জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন দিকেই তাঁর রসানুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তাঁর সঙ্গীত শাস্ত্র জ্ঞান বা কাব্য-বাণী প্রয়োগেও সরসতা যথেষ্ট আছে। চরিত্র-চিত্রাঙ্কনে বিশেষ নিপুণতাও লক্ষণীয়। সব মিলিয়ে তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে : 'তাঁহার কাব্যকে উত্তর বাংলার মনসা-মঙ্গল কাব্যের ভিত্তি স্বরূপ বলা যাইতে পারে। কারণ, উত্তর বাংলার প্রায় সকল মনসা-মঙ্গল কাব্যের কবিই তন্ত্রবিভূতির কাব্য দ্বারা যে কেবল মাত্র প্রভাবিতই হইয়াছেন তাহাই নহে, তাঁহার বহু অংশ আত্মসাৎ করিয়াছেন।' লঙ্কার রাজার নারকেল খাবার বা পাবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চাঁদের রসিকতা সম্পর্কে দু-চার চরণ উদ্ধৃত করে কবির কাব্য-কুশলতার উদাহরণ দেবো। যেমন : নারকেলের জন্যে আকুল লঙ্কেশ্বর : 'ছাড়িলাও রাজ্য আমি আর যুবতীর কাছ। কোথা গেলে পাব আমি নারিকেল গাছ॥' উত্তরে চাঁদের সকৌতুক উক্তি : 'চান্দো বোলে শুন মিতা রাজা লঙ্কেশ্বর। / পর্বতের মধ্যে গাছ প্রহরী বিস্তর। / সাত কোটি নরে রাখে উনকোটি নাগ। / ফল তুলিতে সঙ্কট বড় ঘাড়ে ধরে বাঘ॥'

১১. সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল : সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল এই কাব্যটির রচয়িতা। এটি আলাওলের শেষ জীবনের রচনা। তখন কবির

মন আর ঐহিক সুখ ও বস্তুর প্রতি লগ্ন নয়। তিনি অধ্যাত্মচিন্তায় ক্রমশই নিমগ্ন হয়ে পড়ছেন। 'সয়ফুলমুলুকে'র উপসংহারে তাই চরম আত্মনিবেদনের ভাষায় কবি বলেছেন: 'যদি মোর কবি রসে সুখ লাগে মনে,/আশীর্বাদ কর মোরে ফকীরি কারণে।/ঈশ্বরেতে মুক্তি মাগ আমার লাগিয়া,/পড়িও ফতেহা একমুষ্টি অন্ন খাইয়া॥'

আলাওল এই কাব্য আরাকান-রাজের প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের অনুরোধে রচনা করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কাব্যের দুই-তৃতীয়াংশ রচনার সময়েই মাগন ঠাকুরের মৃত্যু হয় এবং কাব্যটিও অসমাপ্ত থেকে যায়। প্রায় তার পরেই কবিকেও চরম ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হয়। আরাকান রাজের কারাগারে তাঁর আশ্রয় জোটে। কিছু দিন বাদে কারামুক্ত কবি আবার রাজসভায় আসীন হন এবং বিচারপতি কাজী সৈয়দ মসুদ শাহার অনুরোধে কাব্যটির বাকী অংশ সমাপ্ত করেন। এইজন্যই কাব্যটি রচনা করতে প্রায় বার বছর [১৬৫৮-৭০ খ্রীস্টাব্দ] সময় লেগেছিলো।

কবি আলাওল মূলত অনুবাদক-কবি। কিন্তু তাঁর অনুবাদ মৌলিক রচনার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে; এবং যা 'সয়ফুলে'র রচনা কার্যে অনেকখানিই গণনীয়। কারণ, কবি 'আলফা লায়লা' বা আরব্য রজনীর কাহিনী অনুসরণে স্বাধীনভাবে এই বাঙলা কাব্যটি রচনা করেন। নায়ক সয়ফুলমুলুক এবং নায়িকা হচ্ছেন বদিউজ্জমাল। একজন মিশরের বাদশাহের পুত্র, অপর জন বোস্তানের পরীরাজ্যের রাজকন্যা। এদের প্রেম যেন স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে মেল বন্ধন। মানুষ ও পরীকন্যার মধ্যেকার এই প্রেম, কাব্যটিকে একটি মহৎ রোমান্টিক প্রেমকাব্যের আবেগানুরাগে রঞ্জিত করেছে। কবি ছিলেন কাদেরীয়া সম্প্রদায়ের সূফী-সাধক। তাই মর্ত্য ও মানুষী প্রেম সাধনার মধ্যেও কবি ঈশ্বরীয় অনুভাবনার স্পর্শ পান। ফলে সয়ফুল ও বদিউজ্জমাল বা সয়ফুল সুহৃদ সৈয়দ ও বদিউজ্জমালের সখী মল্লিকার মহান প্রেমের মধ্যে দিয়ে কবি যেন আপন অন্তরতমের প্রতি প্রেম নিবেদন করতে চেয়েছেন। এই দেহ ও দেহাতীতের প্রেম কবির কাছে যেন পূজা হয়ে গেছে।

কাব্যটি রচনা করতে দীর্ঘ সময় লাগায়, কবির মধ্য-জীবন-পথে দুর্যোগ ঘনিয়ে ওঠায় কাব্যটির সর্বাংশে প্রতিভা বা কুশলতার রঙ সমান ভাবে ধরে নি। শেষাংশের শিল্পকর্ম বেশ দুর্বল, কেন্দ্রচ্যুতি প্রকট, শাখা কাহিনীর বাহুল্যে মূল কাহিনী আচ্ছন্ন—যৌবনের সৌন্দর্যবোধ [যা নিয়ে কাব্য আরম্ভ হয়েছিলো] ও কল্পনার বিস্তার যেন জীবনের অপরাহ্ন বেলায় অনেকখানি ফিঁকে হয়ে গিয়েছে। এ-সব সত্ত্বেও কাহিনীর একটা অংশ, অর্থাৎ সৈয়দ-মল্লিকার প্রেম, কবির মৌলিক সংযোজন বলে এখানে আবেগের আবেশ অনেকখানি গাঢ়।

এই কাব্যের বিষয়বস্তু একদিন বাঙালীর কাছে, বিশেষ করে মুসলমান ভাইদের কাছে একান্ত রসনা-রোচক হয়েছিলো বলে এর পুঁথি যেমন প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে, তেমনি আলাওল ছাড়াও আরো অনেকে এই একই বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন;—যাঁদের মধ্যে দোনা গাজীর নাম উল্লেখযোগ্য।

১২. বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী: কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের মহৎ গ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ উল্লেখিত হয়েছে : 'শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। /শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ।/ এই ছয় গোসাঞিির করি চরণ বন্দন।/যাহা হৈতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ॥' অর্থাৎ এইখানেই আমরা বৃন্দাবনের ছয় গোঁসাই বা 'ষড় গোস্বামী' কথাটির প্রথম ব্যবহার পেলাম। এবং এই ছয় জন গোস্বামী হচ্ছেন : ১. গোস্বামী রঘুনাথ ভট্ট। ২. গোস্বামী রঘুনাথ দাস। ৩. গোস্বামী গোপাল ভট্ট। এবং দুই ভাই ৪. সনাতন গোস্বামী ৫. রূপ গোস্বামী ও এঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র ৬. জীব গোস্বামী।

এঁরা প্রত্যেকেই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ শিষ্য এবং একনিষ্ঠ ভক্ত। মোটামুটি ভাবে এঁরা চৈতন্যদেবের নির্দেশেই বৃন্দাবনে বসবাস করেছেন এবং চৈতন্যদেবের জীবনাচরণ অনুধ্যায়ী ভাবোদ্বেল বৈষ্ণ ধর্মকে সুদৃঢ় সুনিশ্চিত-রীতিবদ্ধ-স্মৃতি-দর্শন অনুশাসিত একটি ধর্মমত [Religion] এ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এঁরা সকলেই নির্লোভ-নিরহঙ্কার এবং নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব-তাপস হিসেবে পরম সুখ্যাত ছিলেন। কিন্তু ছয় গোস্বামী সম্পর্কে এটাই পরম কথা নয়; কারণ, এঁরা আপন প্রজ্ঞা ও মনীষার দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে একটি সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এর মধ্যে আবার রূপ-সনাতন ও জীব গোস্বামীর অবদান সর্বাধিক।

আমরা জানি যে নীলাচলে ভাবাবিষ্ট চৈতন্যদেবকে আশ্রয় করে কীর্তন-স্মরণ ও ভাবাবেগের স্রোত বয়েছিলো। ফলে, এখানে তত্ত্ব আদর্শ ও দার্শনিক মননশীলতার চর গড়ে উঠতে পারে নি। অন্যদিকে বাঙলা দেশে কি অদ্বৈত মহাপ্রভু, কি, নিত্যানন্দ গোঁসাই বৈষ্ণব সমাজে ও ধর্মে গণতান্ত্রিকতার বিস্তার ঘটাবার বা সাধারণ মানুষকে আবিষ্ট করবার প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন ঠিকই ; "কিন্তু 'কাল্ট'কে 'রিলিজিয়ন'-এ রূপান্তরিত করতে হলে কেবল ভাবাবেগ ব্যতিরিক্ত উন্মত্ততার পরিবর্তে যে বিশেষ দার্শনিক মননের সুকঠিন ভিত্তির প্রয়োজন, তা এখানেও অনুপস্থিত ছিলো।" কিন্তু চৈতন্য-প্রভাবের যে তৃতীয় কেন্দ্র—বৃন্দাবন, 'সেখানেও উক্ত ছয় গোস্বামী [বিশেষত সনাতন, রূপ ও জীব] অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে আবেগমূলক বৈষ্ণবমতকে একটা সর্বভারতীয় দার্শনিক প্রত্যয়ে' প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 'আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, সনাতন ও রূপ চৈতন্যের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবও দুই ভ্রাতাকে উপযুক্ত পাত্র জানিয়া তাহাদিগকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। সনাতন ও রূপ বৃন্দাবনে বাস না করিয়া বাঙলা দেশে থাকিলে অথবা পুরীধামে অবস্থান করিলে তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আদর্শের বাহিরে যাইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। ফলে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি প্রস্তুতিতে বিলম্ব হইয়া যাইত। তাঁহারা বাঙলা-পুরী প্রভাবের বাহিরে ছিলেন বলিয়া দূরে বসিয়া সম্পূর্ণ নিস্পৃহ চিত্তে শাস্ত্রানুশীলন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।' তাই কেবল রূপ-সনাতন নয়, উক্ত ছয় গোস্বামীর নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক প্রত্যয়ের দৃঢ় ভিত্তি রচনায় একান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

রঘুনাথ ভট্ট ছিলেন আন্তরিক ভক্ত। সঙ্গীতজ্ঞ-সুকণ্ঠ-বিনয়ী প্রচার-প্রতিষ্ঠাকুণ্ঠ।

রঘুনাথ কিছু রচনা না করলেও শুধুমাত্র আদর্শ জীবনাচরণের কারণে ['কৃষ্ণকথা পূজা দিতে অষ্টপ্রহর যায়'] বৈষ্ণব-সমাজে ষড়গোস্বামীর অন্যতম হিসাবে শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন।

কায়স্থ সন্তান **রঘুনাথ দাস** অতুল বৈভব ও সুন্দরী পত্নী দু-পায়ের এই দুই শিকল কেটে চৈতন্যদেবের স্মরণ নেন। আবাল্য সম্পদে পরিবর্ধিত রঘুনাথ বৃন্দাবনে এসে রূপ-সনাতনের সাহচর্যে সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করেন। রঘুনাথ ভারতীয় যতি-জীবনের আদর্শ প্রতীক হলেও কিন্তু, বৈষ্ণবশাস্ত্র-সাহিত্যে অ-রসিক ছিলেন না। তিনি সংস্কৃতে অনেকগুলি স্তব-স্তোত্র, কিছু কাব্যও রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে 'মুক্তাচরিত্র' ও 'দান-কেলিচিন্তামণি' সুপরিচিত। 'রঘুনাথের সংস্কৃত শ্লোক রচনার হাতটি বড় মিষ্ট।...ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিঃসঙ্গ, নির্লোভ মুনিবৃত্তি পালন করিলেও কবিতার ছন্দ অলঙ্কার-রসের ঐশ্বর্য সৃষ্টিতে কিছুমাত্র কৃপণতা করেন নাই।'

ষড় গোস্বামীর অন্যতম **গোপাল ভট্ট** সম্পর্কে নানা ধরণের বিতর্ক আছে। সেই সব বিতর্ক বাদ দিয়ে সংক্ষেপে বলি যে ইনি পরম চৈতন্যভক্ত এবং অন্যদিকে একজন বিশিষ্ট চৈতন্যতত্ত্বজ্ঞ। রূপ ও সনাতন যবন স্পর্শ দোষ কারণে পরম কুণ্ঠিত থাকতেন এবং বৃন্দাবনে কাউকে মন্ত্রদান করতেন না। ফলে, গোপাল ভট্টকে প্রধানত ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হতো। রূপ-সনাতনের মৃত্যুর পর গোপাল ভট্টই বৃন্দাবনের বৈষ্ণব-সমাজের গুরুরূপে মানিত হয়েছিলেন।

এরপর আসে ষড় গোস্বামীর মধ্যেকার শেষ তিনজন অর্থাৎ সনাতন-রূপ ও জীব এর কথা। প্রথম দুজন ছিলেন সহোদর এবং তৃতীয় জন ভ্রাতুষ্পুত্র। আগেই বলেছি যে মূলত এঁদের চেষ্টাতেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দর্শন এবং তত্ত্বচিন্তা রীতিনির্দিষ্টতা [codification] লাভ করে। 'তন্মধ্যে সনাতন বৈষ্ণব মতের উপনিষদ ভাগবতের ব্যাখ্যার দ্বারা, রূপ ভক্তিশাস্ত্র ও আলঙ্কারিক রসতত্ত্বকে বৈষ্ণব-ধর্মের অনুকূলে স্থাপন করে এবং জীব গোস্বামী বৈষ্ণব দর্শনের সুদৃঢ়ভিত্তির ওপর বিরাট সৌধ তৈরি করে চিন্তা, জ্ঞান ও তত্ত্বদর্শনের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। প্রতিভার তারতম্য বিচারে জীব গোস্বামীর সংগ্রহ বুদ্ধি, বিশ্লেষণ শক্তি এবং সংহতি সৃষ্টির বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। সনাতন মূলত ভাষ্যকার, ছোটভাই রূপ কবি ও মর্মগ্রাহী রসবেত্তা ; অন্যদিকে জীব হচ্ছেন দার্শনিক।' এবং মূলত এই ত্রয়ীর প্রচেষ্টায় Chaitanya Cultকে আমরা Chaitanya Religion-এ পরিণত হতে দেখি। সনাতনের 'বৈষ্ণবতোষিনী', রূপের 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' এবং জীবের 'হরিনামামৃত ব্যাকরণ', 'ভাগবত সন্দর্ভ' ইত্যাদি বহুখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করা গেল।

১৩. উজ্জ্বলনীলমণি : বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর অন্যতম এবং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রশংসাধন্য রূপ রচিত 'উজ্জ্বলনীলমণি' বৈষ্ণব রস-তত্ত্বালোচনার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। চৈতন্যদেব তিরোহিত হওয়ার পরেই এই গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়—এমন মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। সে যাই হোক, প্রধানত এই গ্রন্থকে অবলম্বন করেই বৈষ্ণব

কাব্যরসভাবনা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের অভিব্যক্তির পথে বইতে শুরু করে এবং 'উজ্জ্বল'-এর পরবর্তী সমস্ত কাব্য সৃষ্টি ও চেতনা একেই অনুসরণ করতে থাকে। এই অনুসৃতিতেই উজ্জ্বলনীলমণির চূড়ান্ত সার্থকতা। কেউ কেউ মনে করেন যে স্বয়ং চৈতন্যদেব রূপকে এই ধরণের গ্রন্থ রচনা করতে উদ্বোধিত করেছিলেন।

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের আস্বাদন ক্ষেত্রে রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'র aesthetic convention-ই যে সর্বাপেক্ষা কার্যকর হয়েছিলো। এ-ছাড়া এরই মধ্যে দিয়ে রূপের কাব্য রসাস্বাদন ক্ষমতা, প্রখর, জ্ঞান এবং ভক্তিশাস্ত্রে পারঙ্গমতা যে কতখানি তা বোঝা যায়। অধিকন্তু, 'উজ্জ্বলনীলমণি'-কে ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্থাপন করলে এর গুরুত্ব তো বাড়েই, উপরন্তু ঐ বিষয়েরও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে সংস্কৃতে রচিত রস-অলঙ্কার শাস্ত্রের এই গ্রন্থে শৃঙ্গাররসকে নতুন প্রেক্ষিত থেকে পর্যালোচনা করে সমগ্র নন্দনতত্ত্বকেই যেন রূপ অভিনব রূপে উপস্থিত করলেন। রূপ গোস্বামী তাঁর বক্ষ্যমান গ্রন্থের পূর্ববর্তী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-তে শান্ত-প্রীতি-প্রেম-বাৎসল্য-মধুর এই পাঁচ পর্যায়ে যে ভক্তি রসকে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন, উজ্জ্বলনীলমণিতে এসে তাদেরই মধ্যেকার উজ্জ্বলতম বা মধুরতম শৃঙ্গার রসকেই নতুন ব্যাখ্যার দ্বারা উপস্থিত করা করেন। ফলে, প্রধানতম বা উজ্জ্বলতম যে শৃঙ্গার রস তা নবীন অধ্যাত্মব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হয়। তাই এই গ্রন্থের নাম "উজ্জ্বল-নীলমণি' বা কৃষ্ণের উজ্জ্বল বা শৃঙ্গার রসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। লেখক সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রোক্ত শৃঙ্গাররসকেই বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণকে 'নায়কচূড়ামণি' বা শ্রেষ্ঠ নায়ক রূপে গ্রহণ করে সেই আলোয় উজ্জ্বলরসকে উপস্থাপিত করেছেন।" এবং এই কাজ করতে গিয়ে তাঁকে মধুরা রতিকে প্রেম-স্নেহ-মান-প্রণয়-অনুরাগ-ভাব বা মহাভাব ইত্যাদি সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত করে উপস্থিত করতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রূপ গোস্বামী বা তাঁর সহযোগিগণ যে জীবনের পরিমণ্ডল থেকে, যে ভক্তি-সিদ্ধি থেকে মধুর-শৃঙ্গার বা আদি রসকে তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তা পরবর্তী কালে তরলায়িত হলে কি বিষময় ফল ফলতে পারে সে সম্বন্ধে কোন ঋষিদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারেন নি। তাই, রূপের মনন-ভক্তি মন্থন করে রচিত " 'উজ্জ্বলনীলমণি' ১৬শ-১৭ শতাব্দীর বৈষ্ণবধর্ম, সাহিত্য ও দর্শনকে পরিপূর্ণতা দিলেও, পরিপুষ্ট করলেও—একটা নতুন রস প্রতীতি ও উপলব্ধির সৃষ্টি করলেও" এর তত্ত্ব-রস কালে যখন বাস্তব জীবনে চোঁয়াতে আরম্ভ করলো তখন অচিরেই অধ্যাত্ম-সাধনাহীন অজ্ঞ-সাধারণ ভক্ত তাতে ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতার অম্লরস মিশিয়ে পাতন-ক্রিয়ায় পরিপক্ক হয়ে পড়লো ;—যেমন করে ব্রহ্মরূপী অন্ন চোলাই-এ পরিণত হয়। অবশ্যই মধুরা রতিকে নিয়ে উত্তরকালে কলুষতাপূর্ণ দেহারতির আয়োজন হলেও 'উজ্জ্বলনীলমণির'র মর্যাদা ও বিশিষ্টতার হানি হয় না।

১৪. **পবনদূত :** বাঙালার শেষ স্বাধীন হিন্দুনরপতি লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল

আনুমানিক ১১৭৯-১২০৬ খ্রীস্টাব্দ [ড. ডি. সি. সরকার]। রাজা লক্ষ্মণের রাজসভাকে ধোয়ী, শরণ, জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতির ধর প্রমুখ কবিগণ অলঙ্কৃত করতেন। এঁর মধ্যে কবি ধোয়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; ইনি অনেকগুলি কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু একমাত্র 'পবনদূত' এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এ সংগৃহীত ২০টি শ্লোক ছাড়া এঁর রচিত আর কিছুই আমাদের হাতে এসে পৌছায় নি।

কবি ধোয়ী, ধোই, ধোয়ীক, ধুয়ী ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিলেন। কবি জয়দেব এঁকে শ্রুতিধর বলেছেন ['বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ'] এবং কোথাও বা ইনি 'কবিরাজ' বিশেষণে ভূষিত হয়েছেন। কবি স্বয়ং আপন কাব্যের ১০১ ও ১০৩ শ্লোকে নিজের 'কবিক্ষ্মাপতি' বিশেষণটির ব্যবহার করেছেন।

বাঙলার এই কবি ধোয়ীর সংস্কৃতে রচিত 'পবনদূত' কাব্যের জন্য সর্ব ভারতে কিছু খ্যাতি আছে। কিন্তু আদি মধ্যযুগের এমন একজন খ্যাতিমান কবির জীবন-কথা প্রায় কিছুই জানা যায় না। তবে জলালুদ্দিন তাব্রিজি [হলায়ুধ মিশ্র-এর ছদ্মনামে] 'সেক-শুভোদয়া' গ্রন্থে কবিরাজ ধোয়ীকে একজন তন্তুবায় এবং প্রথম জীবনে মূর্খ বলে উল্লেখ করেছেন ["তারপর সেক সমস্ত ব্রাহ্মণদের ডেকে বললেন, 'এই ধোয়ী একজন তন্তুবায়; তবু ইনি মহাপণ্ডিত বলে সকলের মধ্যে প্রশংসিত হলেন কেন?' ...ইত্যাদি।" অনুবাদক: অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭১]। এবং কাব্যমধ্যে সুহ্মদেশের স্নিগ্ধ মধুর ও অন্তরঙ্গ বর্ণনা পাঠে মনে হয় যে ইনি রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।

সে যাই হোক, 'কালিদাসের মেঘদূতের আদর্শে যত দূতকাব্য পরবর্তীকালে রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পবনদূত প্রাচীনতম। মন্দাক্রান্তা ছন্দে ১০৪টি শ্লোকে ধোয়ী সুকৌশলে তাঁর পৃষ্ঠপোষক লক্ষ্মণসেনের স্তুতিবাদ করিয়াছেন। লক্ষ্মণসেন নাকি দক্ষিণ দেশে গিয়াছিলেন; সেখানে কুবলয়বতীনাম্নী এক গন্ধর্ব-কন্যা তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াছিলেন। দক্ষিণা মলয়বায়ুকে দূত করিয়া বিরহিণী কুবলয়বতী লক্ষ্মণসেনের নিকট প্রেমবার্তা প্রেরণ করিতেছেন, ইহাই পবনদূতের বিষয়বস্তু। কাব্যটির মৌলিকত্ব বিশেষ কিছু নাই, ভাব-গভীরতার পরিচয়ও এখানে স্বল্প, তবে কোন কোন শ্লোকের চিত্র-গরিমা এবং কল্পনার মাধুর্য চিত্তকে স্পর্শ করে' [ড নীহাররঞ্জন রায়]। কবিরাজ ধোয়ী তাঁর কাব্যের নায়ক করেছেন তৎ-সময়ে জীবিত সর্বগুণসম্পন্ন একজন নরপতিকে। 'চরিতকাব্য বা ঐতিহাসিক আখ্যান কাব্যে মানবচরিত্র নায়ক হতে পারে বটে, কিন্তু গাথাকাব্যে সমসাময়িক ব্যক্তিকে নায়ক করে ধোয়ী অবশ্যই তাঁর কাব্যে একদিকে যেমন অভিনবত্বের সঞ্চার করেছেন, অন্যদিকে তেমনি কিছু দুঃসাহসিকতার পরিচয়ও দিয়েছেন। রাজা লক্ষ্মণসেন সত্য-সত্যই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গিয়েছিলেন কিনা; অথবা তাঁর পবনদূতের ভ্রমণ পথের ভূগোল সঠিক কিনা, এ-প্রশ্ন থাকলেও এর কাব্য-সৌন্দর্যকে একেবারে তুচ্ছ করা যাবে না।'

পরিশেষে এই কাব্যের মধ্যে আদিরসের যে উদ্দাম বর্ণনা আছে তাকে উদাহরণ

হিসেবে গ্রহণ করে অনেকে সে যুগের সমাজ ও রাষ্ট্রের নৈতিক অধোগতির ইতিহাস রচনার চেষ্টা করে থাকেন। তাঁদের মতে, এই নৈতিক অবক্ষয় নাকি মুসলিম বিজয়কে সহজ করে দিয়েছিলো। অর্থাৎ সেই সময়ের বাঙালী বিশেষ করে সমাজের ওপরের তলার লোকেরা বড়ই কদাচারী ছিলেন। এই দৃষ্টান্ত-অবলম্বনে ঐ ঐতিহাসিকগণ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত, সুসভ্য [!] উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর লেখা 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', বা 'বিবর', 'পাতক', 'প্রজাপতি' ইত্যাদি কয়েকখানি গ্রন্থ অবলম্বন করে কোন সিদ্ধান্তে পৌছাবেন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা যায়।

এহো বাহ্য, এই কাব্যের একটি শ্লোকে চিরকালীন বাঙালী চরিত্রের বিশিষ্টতা ভারি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে: 'গোষ্ঠীবন্ধঃ সকলকবিভির্বাচি বৈদর্ভীরীতির্বাসো গঙ্গাপরিসর ভূবি স্নিগ্ধ ভোগ্যা বিভূতিঃ। সৎসু স্নেহা সদসিকবিতাচার্যকং ভূভুজাং মে ভক্তি লক্ষ্মীপতি চরণয়োরস্তু জন্মান্তরেঽপি॥' [অনুবাদ: 'সমস্ত কবিদের সঙ্গে গোষ্ঠীপ্রীতি, বৈদর্ভীরীতিতে কাব্যরচনা, সুপ্রসর গঙ্গাতীরে বাস, মোটামুটি সচ্ছলতা, সুজনের স্নেহ, সুকবিরূপে সুনাম এবং জন্মান্তরেও লক্ষ্মীপতির চরণে ভক্তি, এই-ই আমি কামনা করি']। এর দুশো বছর পরের ভারতচন্দ্র ['আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'] বা আরো দুশো বছর পরের নজরুল ['ক্ষুধাতুর শিশু না চায় স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন']-এর কামনার মধ্যেকার পার্থক্য কি দূরতর ?

১৫. কবি কৃষ্ণরাম দাস: আধুনিক বেলঘরিয়া রেলস্টেশনের মাইলখানেক পূর্বে বা কলকাতা শহর থেকে মাইল আটেক উত্তরে নিমিতা বা নিমতা বা নিমতে গ্রামে আনুমানিক ১৬৫৬-৫৭ খ্রীস্টাব্দে কবি কৃষ্ণরামের জন্ম হয়। এঁর পিতার নাম ভগবতী দাস। কবি জাতিতে কায়স্থ। ইনি কালিকামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল কমলামঙ্গল ইত্যাদি বেশ কয়েকজন দেবদেবীর প্রশস্তি করে কাব্য রচনা করায় কবির বহুমুখী কাব্যকৃতিত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এতগুলি কাব্য রচনার মধ্যে এঁর 'রায়মঙ্গল' এবং 'কালিকামঙ্গলে'র কাব্যরস ও বৈশিষ্ট্য এঁকে সমধিক খ্যাতি এবং পরিচিতি দান করেছে। অধিকন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দু-জন শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের 'কালিকামঙ্গল'-এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এতে কৃষ্ণরামের কাব্য-প্রতিভার মৌলিকতা প্রমাণিত হয়।

প্রথম কাব্য 'কালিকামঙ্গল' কুড়ি বৎসর বয়সে রচিত। তরুণ কবির এই কাব্য মোটামুটিভাবে তাঁর কাব্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল। অধিকন্তু এমনও বলা যেতে পারে যে তাঁর কালিকামঙ্গল পূর্ববর্তীদের থেকে পূর্ণাঙ্গ এবং ভারতচন্দ্র ছাড়া বাঙলা সাহিত্যে অ-তৃতীয়। কলকাতার কাছে কবির বাস, তাই বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর নাগর রুচিকে পরিতৃপ্তি দিতে আরম্ভ করলো তখন ভারতচন্দ্রের পাশে পাশে মনে হয় কৃষ্ণরামেরও ভাঁড়ারে হাত পড়েছিলো। কেননা, তাঁর এই কাব্যের বহুলাংশে আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট তথাপি তাঁর 'কালিকামঙ্গল' সম্বন্ধে মন্তব্য করা যায় যে: ক)

সেই সময়ে এরই মধ্যে তবু মঙ্গলকাব্যের কিছু প্রাচীন বৈশিষ্ট্য বজায় ছিলো। খ) এতে দেব অংশের প্রাধান্য নিতান্ত কম ছিলো না। গ) ভাষা-ছন্দে কবির কিছু অধিকার ছিলো তাও স্বীকার করতে হয়। ঘ) শাক্ত বিষয়ে কাব্য রচনা করলেও বৈষ্ণব প্রভাব কবি এড়িয়ে চলতে পারেনি। ব্রজবুলিতেও তাঁর কিছু কিছু রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ['লোচন সারস/তাই মধুলালস/ভ্রমরপতি ভুরু জোর। / মালতিমালা কবরী ভেল বেড়ল/তড়িত জড়িত ঘনঘোর।।'] ঙ) রুচির গ্রাম্যতা, অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহারে নিষ্কুণ্ঠ হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে কবির প্রতিভার প্রশংসা করতেই হয়।

কবির অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাব্য 'রায়মঙ্গলে'র রচনাকাল ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দ বলে কবি নিজেই গ্রন্থ মধ্যে উল্লেখ করেছেন [১৫০৮ শক] দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবনের ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণ রায়-এর প্রশস্তি রচনা এই কাব্যের উপজীব্য। এরই পটভূমিকায় সপ্তদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের সমাজ ঐতি-হাসিক দ্বন্দ্ব এই কাব্যখানিতে বিবৃত হয়েছে। এর অপর ভাগে আছে চণ্ডীমঙ্গলের বণিকখণ্ডের অনুরূপ বণিক পুষ্প দত্তের গল্প। কবি হিন্দু হয়েও হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অধিকারের লড়াইতে যে ভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন তাতে তাঁর সমাজ মনস্কতার প্রসংসা করতে হয়। এই অ-সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী আজকের প্রগতিশীল সুসভ্যতার মধ্যেও একান্ত দুর্লভ। হিন্দী-উর্দুর ব্যবহার; চরিত্র-সৃষ্টি ও ঘটনা বর্ণনার মধ্যে কবির মুন্সীয়ানা লক্ষণীয়; তাছাড়া কৃষ্ণরামের আগে তো বাঘ বা তার দেবতার মহিমাকীর্তন করে কোন কাব্য রচিত হয় নি, সেদিক থেকেও এই কাব্যের অভিনবত্ব ও কবির রচনা-শক্তির প্রশংসা করতে হয়।

এর পর কবির 'ষষ্ঠীমঙ্গল' [১৬৭৯-৮০], 'শীতলামঙ্গল' [? ১৬৮৬-এ পরে] এবং 'কমলামঙ্গল' [?] কাব্য তিনটি রচিত হয়। এই কাব্যত্রয়ের কোথাও কবির কাব্য-প্রতিভার বিন্দুমাত্র অবশেষ লক্ষ্য করা যায় না। আসলে কিছু ব্রতকথা, রূপকথাকে সম্বল করে সমিল পয়ারে বাঁধলেই তা কাব্য আখ্যা লাভ করতে পারে না,—এখানেও পারে নি। ১৭-শ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের প্রতিভাবান কবির সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল, কৃষ্ণরাম দাসের প্রতিভায় এমন কিছু উপাদান ছিলো না যা দিয়ে সেই ধ্বসে যাওয়া পাড়ে শক্ত বা স্থায়ী কোন বাঁধ দিতে পারা যায়। তাই যা হওয়ার তাই-ই হয়েছে। শুধু মাত্র সাহিত্যের ইতিহাসকারের অনুসন্ধিৎসাকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকা ছাড়া আর প্রায় কিছুই তাঁর এই শেষ কাব্যত্রয়ের ভাগ্যে জোটে নি।

১৬. **দৌলতকাজী :** বাঙলার একেবারে পূর্বপ্রান্তে, এমন কি তা ছাড়িয়েও ব্রহ্ম এলাকায় আরবীয় ইসলামী অনুপ্রবেশ বেশ পুরাতন,—এমন কি বাঙলায় তুর্কীরাজ্য প্রতিষ্ঠারও অনেক আগে। অথচ এখানের রাজসভা বা উচ্চতর মহলে ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসল-মানগণ অচিরেই বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করেন। তার প্রমাণ, এখানে বাঙলা ভাষার ব্যাপক ব্যবহার, ও কাব্যাদির রচনা ইত্যাদি। এবং এরই সূত্র ধরে এখানকার বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিকগণ বাঙলা সাহিত্যকে [সপ্তদশ শতাব্দীতে] এমন এক নতুন বস্তু

দান করলেন যা অনাস্বাদিতপূর্ব, জীবনরসে ভরপুর, মানবীয় প্রেমে আবেগ তপ্ত। বাঙালীকে সেদিন এই অভিনব রস-প্রাশনে যিনি সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর নাম কবি দৌলতকাজী।

দৌলত চট্টগ্রামের রাইজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামের কোনো এক সম্রান্ত কাজীবংশে যতদূর সম্ভব ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এরূপ আনুমানিক জন্ম তারিখ বলার কারণ কবি তাঁর অসম্পূর্ণ একখানি মাত্র কাব্যে নিজের পরিচয় সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলেন নি। কবি অল্প বয়সেই বিভিন্ন বিদ্যায় পারঙ্গম হয়ে যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের আশায় আরাকান রাজ্যের রাজধানী রোসাঙ্গ নগরীতে বৌদ্ধ রাজা থিরি-থু-ধর্মা [শ্রীসুধর্মা : ১৬২১-৩৮ খ্রীস্টাব্দ]-র রাজসভায় আসেন এবং এই রাজার লস্কর-উজীর বা প্রধান অমাত্য বা সমর সচিব আশরফ খানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং তারই অনুরোধে 'লোরচন্দ্রানী' বা 'সতীময়না' কাব্যটির রচনা আরম্ভ করেন। কাব্য-সমাপ্তির পূর্বেই কবির অকাল প্রয়াণ ঘটে। কবির মৃত্যুর প্রায় ত্রিশ বছর পরে [১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে] ঐ রাজসভারই অপর এক কবি আলাওল অসমাপ্ত কাব্যটিকে সম্পূর্ণ করেন।

রাজা লোর বা লোরক, স্ত্রী ময়না এবং প্রথমে প্রেমিকা ও পরে দ্বিতীয়া স্ত্রী চন্দ্রানীর রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানটি দৌলতের স্বকপোলকল্পিত নয়। ইনি কাব্যের মূল পেয়েছিলেন মিয়া সাধনের 'মৈনা সৎ' কাব্য থেকে। হয়তো মুল্লা দাউদের 'চন্দ্রায়ন' কাব্য-প্রসঙ্গও তাঁর ছিলো। এই কাব্যপাঠে আমরা আরো জানতে পারি যে : ১) দৌলতের কাব্য-বিষয় মৌলিক নয়। ২) তিনি 'ময়নামতী মালিনী' সংবাদের বারমাস্যার মধ্যে জ্যৈষ্ঠ মাসের বর্ণনা আরম্ভ করেই প্রয়াত হন। ৩) তিনি পণ্ডিত ও ভাষাবিদ্ ছিলেন। কিন্তু তারই সঙ্গে প্রকৃত ও রসজ্ঞ জ্ঞানীর মতো ৪) বেদ-পুরাণ-বৈষ্ণব-সাহিত্য,এমন কি কালিদাস, জয়দেব,বিদ্যাপতি প্রমুখের কাব্যও নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন। ফলে, নিরস পাণ্ডিত্য নয়, যথার্থ কবির মতো সত্যকে, ন্যায়-নীতিকে, যথার্থ মানবাদর্শকে, এক কথায় জীবনায়নকেই তাঁর সৃষ্টি-কর্মে পাথেয় করেছিলেন। তাই মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে তাঁর একটি সম্মানীয় আসন লাভ খুব সহজেই সম্ভব হয়েছিলো।

দৌলতের সহজ সরল ও আয়সহীন সরসতা তাঁর কাব্যকে 'লোকজীবনের সার্থক রোমান্টিক প্রণয়গাথার শিল্পমূল্য দান করেছে।' তার মধ্যে আবার সতী ময়নার ত্যাগ-তিতিক্ষা, আত্মবিলোপকারী স্বামীপ্রেম সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে। লোর ও চন্দ্রানীর উতরোল প্রণয়কেলীর পাশে ময়নার সতীত্ব বা সত্যনিষ্ঠা ও প্রেমে বিশ্বাস প্রত্যূষাকাশের শুকতারার মতো দীপ্যমান। এইখানে কবির ভাষা সূর্যালোকিত স্ফটিকের মতো ঝক্‌ঝক করে উঠেছে। নিটোল হীরের মতো উজ্জ্বল-দৃঢ় সত্যাশ্রয়ী, অথচ প্রেমানুরক্তিতে তুলসীর মতো ভক্তিনত ময়নার প্রসঙ্গে কবি বলেছেন : 'বিপরীত

বায়ু বলে / সত্য ঘট নাহি টলে / সতীত্বকে টলাইতে নারে ॥' এবং এই কারণেই 'ভাগ্যবতী ময়নারাণী, / সত্যের প্রতিষ্ঠা শুনি / প্রশংসন্তে সকল জগত।'

না, কেবল ময়নাকে নয়, তার কবিকেও 'সকল জগত' এই ভাষায় প্রশংসা করে থাকে : ক. 'সঠিক ভাবে বলতে গেলে দৌলত কাজীই মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্ত্য-জীবনরসের কবি।' খ. 'দৌলত মুসলমান হলেও হিন্দুর কাহিনীকে ঠিক হিন্দু কবির মতোই বর্ণনা করেছেন। চিত্রকল্প উপমা উদাহরণ প্রভৃতিতে কবি সর্বত্র হিন্দু মনোভাব বজায় রেখেছেন। গ. 'এই রোমান্টিক কাব্যের আদ্যন্ত মর্ত্যের জীবনরসে, মাটির পবিত্র ও জীবনের গন্ধে পূর্ণ' ['ছোট বড় রঙ্গ যত মাটিতে সকল।']। ঘ. 'রচনারীতির বিচারে কবির বাণী-ভঙ্গিমায় ক্লাসিক ও রোমান্টিক রীতির পরিমিত সংমিশ্রণ বিস্ময়কর'। ঙ. দৌলতের কাব্যে এমন বহু পদ আছে যা গাঢ় ও গভীর ভাববাহী হয়ে এক একটি লোক-প্রবচনের সৃষ্টি করেছে : 'যুবক পুরুষ জাতি নিষ্ঠুর দুরন্ত। / এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শান্ত ॥' অথবা 'যাহার নাহিক লজ্জা কি ফল গঞ্জনা। / তস্করেতে ধর্মকথা বেশ্যাকে ভর্ৎসনা ॥' চ পরিশেষে, আলাওল যেহেতু দৌলতের অসম্পূর্ণ কাব্য সমাপ্ত করেছিলেন, সেহেতু উভয়ের তুলনার প্রসঙ্গে যেটি সার হিসেবে বলা উচিত, তা হচ্ছে : 'আলাওলের রচিত অংশে পাণ্ডিত্য আছে, শব্দাড়ম্বর আছে, অস্বাভাবিক ও অবান্তর গল্পের সমাবেশ আছে, কিন্তু দৌলত কাজীর রচনায় যে প্রাঞ্জলতা, যে স্বাভাবিকত্ব ও ভাবপ্রকাশক স্বল্পভাষিতার নিদর্শন আছে, আলাওলের রচিত অংশে তাহা পাওয়া যায় না। এইরূপে বহু গ্রন্থপ্রণেতা, দীর্ঘজীবী ও পণ্ডিত আলাওল দৌলত কাজীর ন্যায় একজন খণ্ডকাব্য প্রণেতা ও স্বল্পজীবী কবির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন।'

১৭ **'মৃগলুব্ধ'** : মধ্যযুগের ভারতবর্ষে একেবারে পূর্ব সীমান্তের চট্টগ্রাম বা তৎ-সন্নিহিত অঞ্চলে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বৌদ্ধ ধর্ম আত্মরক্ষা করেছিলো। কিন্তু তা ও বেশি দিন সম্ভব না হওয়ায় তাঁরা ক্রমে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে হিন্দু অথবা মুসলমান-দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিলেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা হিন্দু ধর্মকে আশ্রয় করতে আরম্ভ করেন তাঁরা মূলত শিব বা শিব ভাবনাতে আত্মসমর্পণ করাকেই অনেকখানি সহজ মনে করেছিলেন। কিন্তু এই শৈব-করণ এখানের জনসাধারণে অচিরে প্রভাব বিস্তার করলেও বৃহত্তর বঙ্গের শিবচিন্তা,—বিশেষ করে লৌকিক শিব ভাবনা বা তৎ-সৃষ্ট সাহিত্যগুলির কোন প্রভাব এ-অঞ্চলের সংস্কৃতি-চিন্তায় পড়ে নি। অর্থাৎ উপরতলায় শিবসংস্কার ও তারই সাহিত্যিক ঐতিহ্যই তাঁরা অনুসরণ করলেন ; লৌকিক শিব-সাহিত্য বা শিবায়ন বা 'শিবমঙ্গলকাব্য' তাঁদের কাছে যেন অপরিচিতই রয়ে গেল। তাই এখানে শিবমাহাত্ম্য নিয়ে যে কাব্য রচিত হলো, তা আকৃতিতে মঙ্গলকাব্যের মতো বটে ; কিন্তু প্রকৃতিতে সংস্কৃত মহাভারত, শিব পুরাণ, হরিবংশ, দেবী ভাগবত ইত্যাদির প্রভাবে রচিত শিব-বিষয়ক কাব্য। যার নাম 'মৃগলুব্ধ'। বাঙালার লৌকিক

শিবমঙ্গল কাব্যের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই,—অর্থাৎ এ বাঙলা মঙ্গলকাব্যের খোলসে ঐ সব আর্ষ পুরাণগুলির অনুবাদ মাত্র।

মৃগ ও এক লুব্ধ[ক]-র কাহিনী এই কাব্যের উপজীব্য হওয়ায় এই কাব্য 'মৃগলুব্ধ' বা 'মৃগলুব্ধ সংবাদ' নামে পরিচিত হয়েছে। বিভিন্ন শৈবপুরাণে রাজা মুচুকুন্দ নামে জনৈক শিবভক্তকে নিয়ে এক কাহিনী প্রচলিত আছে, যাকে আমরা শিবচতুর্দশী ব্রতকথার অন্তর্গত করতে পারি। ঐ শৈব রাজার কাহিনী নিয়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত মাত্র দুজন কবির দুখানি [ড. দীনেশচন্দ্র সেন তৃতীয় আর এক কবির কথা উল্লেখ করলেও তাঁর পুঁথি কেউ দেখে নি।] পুঁথি সম্প্রতি [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ: ১৩২২ বঙ্গাব্দ] আবিষ্কৃত হয়েছে।

'মৃগলুব্ধে'র দুজন কবির নাম ১। রামরাজা এবং ২। রতিদেব। এই দুই কবির কাব্যের আবিষ্কারক মুন্সী আবদুল করীম রামরাজাকেই এই কাব্যের প্রাচীনতম কবি বলেছেন। এই কবির সম্বন্ধে কিছুই জানা না গেলেও তাঁর যে কিছু পাণ্ডিত্য ছিল, তা তাঁর কাব্য পাঠেই বোঝা যায়।

এই কাব্যের দ্বিতীয় কবি রতিদেব আপন জন্মস্থান হিসেবে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত 'সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা'কে নির্দেশ করেছেন। তাঁর পিতার নাম গোপীনাথ এবং মাতার নাম বসুমতী। ইনি সুপণ্ডিত, কিন্তু কবিত্ব-শূন্য ছিলেন না; রতিদেব বহু জায়গায় তাঁর পূর্ববর্তী রামরাজার কাছে অধমর্ণ হয়েছেন—অবশ্য আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই তাঁর ঋণকে তিনি ধনে পরিণত করতে পেরেছিলেন। রতিদেবের রচনার একটু উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে: 'কেনে কাল বনে আইলা / ব্যাধ হাতে প্রাণ দিলা / মোক বাম হইলো ভগবান। / বনে খাই তৃণ পানি / অপকার নাহি জানি / কেনে বিধি এত বিড়ম্বন ॥' ব্যাধের জালে আটকে পড়া মৃগকে দেখে মৃগীর হাহাকারের মধ্যে কবির অন্তরের মমতার স্পর্শ পাওয়া যায়।

১৮. **'সদুক্তিকর্ণামৃত':** আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন যে: 'নানা কবির রচনা হইতে মাধুকরী বৃত্তিতে সংগ্রহ করিবার কাজটা হয়তো বাঙলাদেশেই আরম্ভ হইয়াছিল।' এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হয়েও বলা যায় যে দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে বাঙলাদেশে উক্ত মাধুকরীবৃত্তির এমন অন্তত দুটি উদাহরণ আমাদের হাতে এসেছে যাতে করে আমরা বাঙালীর সংকলন পটুত্বকে শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হই। এদের মধ্যে কেবল 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সংকলনটিই এখানে আলোচ্য।

এই 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র সংকলক ছিলেন শ্রীধর দাস। শ্রীধর স্বনামখ্যাত বঙ্গ নৃপতি লক্ষ্মণসেনের 'প্রেমৈকপাত্র সখা' [মহাসামন্ত ও বন্ধু] বটু দাসের পুত্র ও রাজার 'মহামাণ্ডলিক'। গ্রন্থটির সংকলন কাল ১২০৬ খ্রীস্টাব্দ [১১২৭ শকাব্দ]। এই সংকলনের মোট 'প্রবাহ' পাঁচটি। প্রত্যেকটি প্রবাহ আবার নানা 'বীচি' [ঢেউ]-তে বিভক্ত, যাতে অন্তত পাঁচটি করে কবিতা আছে। সব মিলিয়ে ২৩৭০টি পদ এতে গৃহীত হয়েছে—যাদের রচয়িতার সংখ্যা হচ্ছে ৪৮৫ জন। এই রচয়িতাগণের

অনেকের নাম পাওয়া যায় নি;—উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশেরই কেবল নামই মাত্র পাওয়া গেছে; আর ঐ-সব ছোট ছোট পদ অবলম্বনে কবিদের কোন পরিচয়ই খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

এটিকে একটি সর্বভারতীয় সংকলন হিসেবে গ্রহণ করা যায়; কারণ, একদিকে যেমন কালিদাস, ভাস, ভর্তৃহরি, অমরু,রাজশেখর প্রমুখের পদ এখানে সংকলিত হয়েছে, তেমন অন্যদিকে আছে, লক্ষ্মণ-সভার পঞ্চরত্ন, [জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতি, গোবর্ধন, শরণ] ও লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন প্রমুখ সেন রাজাদের লেখা প্রকীর্ণ শ্লোক। এ ছাড়া কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে আরও প্রায় আশী জন পরিচয়হীন কবির কবিতা পাওয়া যাচ্ছে, যাঁদের ভণিতায় নাম শুনে মনে হচ্ছে তাঁরা বাঙালী। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায়: ১। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' বাঙালীর দ্বারা সংকলিত এবং প্রধানত বাঙালী কবির রচিত পদসমূহের সংকলন। ২। বাঙালী বহু পুরাতন সময় থেকেই 'উদ্ভট' [যে কবিতার কবির নাম জানা নেই] ও প্রকীর্ণ শ্লোক রচনার মধ্যে দিয়ে তার লিরিক-মনের প্যাটার্ণকে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। ৩। পদসংকলনের এই ঐতিহ্য পরবর্তী কালে বিশেষত বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিলো।

বলা বাহুল্য, 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-তে ধৃত শ্লোকগুলি সংস্কৃতে রচিত। এদের বিষয়বস্তু বহু বিচিত্র। জীবন ও জগতের প্রায় সমস্ত শাখাকে অবলম্বন করে কত বিভিন্ন মানসিকতার ছবি ঐ সব কবিগণ ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা ভাবতে বিস্ময় লাগে। যুদ্ধবিগ্রহ, গাছপালা, পশুপক্ষী, ঋতু-বিষয়ক, নায়ক-নায়িকার মনোভাব ও আচরণ এবং সর্বোপরি আদি রস সব কিছুই কবিদের বিষয়ীভূত হয়েছে। কিন্তু সব বিষয়কেই আচ্ছাদিত করে রেখেছে জীবন-সংরাগ মাখানো মানব-রস। এই জীবনায়নের প্রভাব পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষভাবে না পড়লেও রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ে বা মঙ্গলসাহিত্যে পরোক্ষভাবে ছায়া প্রসারিত করেছে। এখানকার দেবদেবীরাও মানুষের গুণ ও স্বভাবকে অতিক্রম করে খুব বেশি দূর যেতে পারেন নি। এই মানবীকরণ, স্নেহ ও প্রীতির দীপ জ্বালিয়ে আমাদের জীর্ণ কুটিরে দেবতাদের আত্মীয় যে মানুষ তার অনুসন্ধান করা, কি বাঙালীর আজীবনের বৈশিষ্ট্য? 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র শ্লোকগুলি কি তারই নজীর? এই সংকলনের সম্বন্ধে শেষ দুটি কথা এই যে: ক। 'এই সংকলনের অন্তিম তিনটি প্রবাহ' চাটু, অপদেশ ও উচ্চাবচ-এ বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক এমন সব উজ্জ্বল চিত্র আছে, যা মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যেও বিরল।' খ। "এখানে ধৃত 'অসতীব্রজ্যা, ও 'শৃঙ্গার প্রবাহ'-এর শ্লোকগুলিতে আদি ও ভক্তিরস যেন একই আধারে সমীভূত হতে চাইছে। 'বিলাসকলাকুতূহলে'র মধ্যে দিয়ে পরবর্তীকালের বৈষ্ণব সাহিত্যে যাদের আশ্রয় জোটে।"

'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এ গৃহীত একটি শ্লোকে পৌষ মাসের বাঙলার ছবি এই রকম: 'শালিচ্ছেদসমৃদ্ধহালিকগৃহাঃ সংসৃষ্টনীলোৎপল / স্নিগ্ধশ্যামযবপ্ররোহনিবিড়ব্যাদীর্ঘ-সীমোদরাঃ / মোদন্তে পরিবৃত্তধেন্বনডুহশ্ছাগাঃ পলালৈর্নবৈঃ / সংসক্তধ্বনদিক্ষুযন্ত্রমুখরা

গ্রামাগুড়ামোদিনঃ ॥' [অর্থ : কৃষকের ঘর শালিধানে বোঝাই। মাঠে মাঠে ষাঁড় ও ছাগল চরে বেড়াচ্ছে। গুড় তৈরির জন্যে গ্রামগুলি আখমাড়াইয়ের কলের আওয়াজে মুখরিত]।

অথবা, 'ধূমেন রিক্তমপি নির্ভর বাষ্পকারি দূরীকৃতানলমপি প্রতিপন্ন তাপম্। / দৈন্যাতিশূন্যমপি ভূষিত বন্ধুবর্গ আশ্চর্যমেব খলু খেদকরং॥' [অর্থ : গরীবের ঘর ধোঁয়াশূন্য হয়েও ভাপে বোঝাই। আগুন না থাকলেও তাপ রয়েছে। দারিদ্র্যের ফলে সব খালি, কিন্তু ভূষিত বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা পূর্ণ—এটাই আশ্চর্য ও খেদের কথা]। সুখ ও দারিদ্র্যে পূর্ণ এই তো বাঙলার চিরন্তন ছবি।

১৯ **'সঞ্জয়ের মহাভারত'**ঃ রামায়ণ মহাভারত এই দুই আর্য মহাকাব্য মধ্যযুগের বাঙালীর স্বাভাবিক রসতৃষ্ণার কারণেই 'ভাষায়', অনূদিত হয়। এর মধ্যে মনে হয় বিশালতা, বিষয়বস্তুর জটিলতা এবং উপযুক্ত প্রতিভার অভাবের কারণে মহাভারতের অনুবাদ রামায়ণের মতো ব্যাপক ও জনপ্রিয় হয় নি। তবে চৈতন্য পূর্ব বা সমসাময়িক সময়ে অঙ্গুলিমেয় দু একজন, সম্পূর্ণ নয়—মহাভারতের এক বা একাধিক পর্ব অনুবাদ করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য ঐ সব কবিগণের প্রচেষ্টাকে পৃষ্ঠপোষণা দান করেছিলেন দেশের তৎকালীন মুসলীম প্রশাসকগণ। প্রসঙ্গত একথা বলা প্রয়োজন যে, এই পৃষ্ঠপোষণা মামুলি কোন বদান্যতা নয়—উক্ত প্রশাসকগণের অনেকেই হিন্দুদের এ সমস্ত চিরায়ত সাহিত্যকে সত্যই অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসতেন। যেমন, চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁ মহাভারতের গল্প শুনে খুবই খুশি হতেন।

সে যাই হোক, চৈতন্যদেবের জীবনকালের সমসময়ে [১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ] যে দু-চারজন কবি-যশ-প্রার্থী মহাভারতের জটিল কাহিনী-অরণ্যে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে 'সঞ্জয়' নামে এক কবির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এই সঞ্জয় নামক কবির অস্তিত্ব এবং তাঁর দ্বারা মহাভারতের নিশ্চিত অনুবাদ সম্পর্কে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে বেশ একটি সমস্যা ঘোর হয়ে আছে। প্রসঙ্গটি এই রকম : ১। বঙ্গের ধনামধন্য সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে [১৪৯৩†-১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ] বা তার কিছু পরবর্তী [হোসেন শাহের পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ-এর রাজত্বকাল (১৫১৯-১৫৩২ খ্রীস্টাব্দ)] 'কবীন্দ্র' উপাধিক পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী নামে দু-জন মহাভারতের অনুবাদকারের কাব্যের নিশ্চিত সন্ধান পাওয়া পাচ্ছে। ২। ঐ দু জন

† 'There is no means of ascertaining the exact date of his accession, but it appears to have been signalised by the issue of a a gold coin, dated 149३, which bears not only his regal titles, but also an emphatic decleratiou of his noble descent' : *History of Bengal* : [Ducca 1972] : Reprint vol. II : p. 143.

একই প্রশাসক বংশের পৃষ্ঠপোষণায় প্রায় সম-সময়েই মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন। ৩। এ-পর্যন্ত যে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে কবীন্দ্র পরমেশ্বরকেই মহাভারতের আদি অনুবাদক বলা যায়। ৪। উক্ত দুই উল্লেখযোগ্য ভারত অনুবাদকারের কিছু পরবর্তীকালেই সম্ভবত সঞ্জয় নামে এক ব্যক্তিত্ব [গায়েন বা লিপিকারও হতে পারেন] ছিলেন সে-কথা একেবারে অস্বীকার করলে বোধহয় ঐতিহাসিকতার ম্যাদা রক্ষা হবে না। ৫। এই সঞ্জয়ের কোন পরিচযই জানা যায় না। সঞ্জয়ের কোন একখানি পুঁথি অনুসরণে এ-কথা মনে করা হয় যে, হরিনারায়ণ দাস নামধেয় কোন কবি 'মহাভারতের সঞ্জযের'র নামের আড়ালে মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন। ৬। কারো মতে ইনি ব্রাহ্মণ, কারো মনে ইনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় বৈদ্য, কেউ বা বলেন যে ইনি অব্রাহ্মণ। ৭। সঞ্জয়ের নামে প্রচলিত কাব্যের সবচেয়ে বড় অধিষ্ঠানভূমি পূর্ববঙ্গ এবং সে কাব্য সে অঞ্চলে যথেষ্টই পরিচিত। ৮। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষণীয় যে আদি মহাভারতকার রূপে যাঁর প্রতিষ্ঠা আজ স্বীকৃত হয়েছে সেই কবীন্দ্র পরমেশ্বরের কাব্যের অনুকরণে [অনুলিখন বললেই বোধহয় সবচেয়ে উপযুক্ত হয়] কবি সঞ্জয় অধিক পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তবে তিনি কিছু কিছু নতুন পালা তাঁর কাব্যে যে প্রযুক্ত করেন নি এমন নয়। যেমন 'দ্রৌপদী যুদ্ধ' ইত্যাদি। ৯। '১৯৬৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ড. মুনীন্দ্রকুমারঘোষের সম্পাদনায় অতিবৃহৎ সঞ্জয়ের মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হইতেছে মহাভারতের অন্যতম অনুবাদক সঞ্জয় নামে প্রকৃত কোন কবি ছিলেন, যিনি বিশাল আকার মহাভারত লিখিয়াছিলেন। তবে ইনি কখনোই মহাভারতের আদি-অনুবাদক নহেন। কারণ, তাঁহার ভাষা অতি-আধুনিক। তবে সমস্ত উপাদান বিচার করিয়া মনে হয় যে, কবীন্দ্রের পরে সঞ্জয় নামীয় কোন কবি বা লিপিকার বা পাঁচালীকার কবীন্দ্রের রচনাকে নিজের বলিয়া আত্মসাৎ করিয়া এবং কোন কোন অংশকে একটু-আধটু বর্ধিত করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া একখানি নূতন মহাভারত অনুবাদের কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।' ['যিনিই হউন, একজন সংগ্রহকার যে জোড়াতাড়া দিয়া 'সঞ্জয় মহাভারত' সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা অযৌক্তিক এবং সংগ্রহকার যে পৌরাণিক সঞ্জয়ের অন্তরালে আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও স্বীকৃতব্য''—ড. সুকুমার সেন]। ১০। পরিশেষে, সঞ্জয় এবং তাঁর মহাভারত সম্পর্কে এরকম মন্তব্য করা যায় যে : কোন ক্ষীণ ধারণা এবং বুদ্ধির মানুষ পরমেশ্বরের সৃষ্টির ওপর কলি ফিরিয়ে কিছু গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা এই মহাভারতখানি তৈরি করেছিলেন। এবং তিনি নিজের কীর্তি [?] সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলেই পুরাণের সঞ্জয়ের নামের আড়ালে বসে কবীন্দ্রের সুনামের অংশে, ভাগ বসাতে ব্যর্থ চেষ্টা পেয়েছিলেন।

২০ **'কালিকামঙ্গল' [রামপ্রসাদ রচিত]** : সাধক কবি রামপ্রসাদের শাক্তপদগুলি তার কাব্যসৌন্দর্যে, তার সুরমাধুর্যে আজও বঙ্গবাসী মাত্রেরই হৃদয় উদ্বেল করে তোলে। তাঁর সমস্ত প্রতিষ্ঠা ও সিদ্ধি, মাতৃভাবরসে সমৃদ্ধ এই ছোট ছোট গেয়

কবিতাগুলির মাধ্যমেই। এইখানেই তাঁর অন্তরের ভক্তি স্ফূর্তি এবং ধর্ম-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এ-হেন কবির এই প্রকারের প্রতিভা-বিকাশের মাধ্যমের বাহিরে অন্যত্র ভ্রমণের কারণ কি, তা অনুধাবনযোগ্য। অর্থাৎ কবি রামপ্রসাদ হঠাৎ 'কালিকামঙ্গল' রচনা করলেন কেন? আর সেই রচনাকার্যে তাঁর কবি-ক্ষমতা কি সার্থকতা লাভ করেছে? এ-বিষয়ে পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। যেমন: ক. যে সাংসারিক অস্বচ্ছলতা ও অর্থনৈতিক পীড়ন কবির মানসিক স্থৈর্যকে বিঘ্নিত করতো তা অনেকখানি নিবৃত্ত হয় নবদ্বীপাধিপতির বদান্যতায়। তিনি কবির কাব্যপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দান করেন; একশ বিঘা জমি[1] নিষ্কর ভোগের স্বত্বও কবিকে দেন। অনেকখানি এরই কৃতজ্ঞতায় কবি রাজার উপাস্যা ও কবির আরাধ্যা কালিকার প্রশস্তি-সূচক এই 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী' রচনা করেন। এতে মনে হয় রাজার বিদগ্ধ মন পরিতৃপ্ত হয়েছিলো। খ কবির কাব্যের নাম 'কবিরঞ্জন' ["কবিরঞ্জন রাজ কৃপায় 'কবিরঞ্জন' উপাধি পাইয়া নিজ বিরচিত বিদ্যাসুন্দরের নাম 'কবিরঞ্জন' রাখিলেন।'—গুপ্ত কবি]। গ. রামপ্রসাদের এই কাব্য কবে রচিত হয়েছিলো তার কোন উল্লেখ গ্রন্থের মধ্যে নেই। তবে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের রচনাকাল ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দে। এখন, ১। রামপ্রসাদের 'কবিরঞ্জন' কি ভারতচন্দ্রের আগে রচিত হয়েছিলো [কারণ, 'প্রবাহমান নদী সন্নিধানে সরোবর খননের ন্যায় নিতান্ত অবিজ্ঞের কার্য' কি রামপ্রসাদ করবেন?—রামগতি ন্যায়রত্ন]? ২। উভয়ের কাব্য কি সমসময়েই রচিত হয়েছিলো [কারণ, 'মসীযুদ্ধের সুলভ উত্তেজনার উন্মুখ প্রতিবেশে শক্তির পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন' (রামপ্রসাদের এই স্বভাবকে অস্বীকার করা যায় না, আজু গোঁসায়ের সঙ্গে তাঁর চাপান-উতোরের প্রসঙ্গ এখানে স্মরণ করা যেতে পারে) অথবা 'কবির লড়াই দেখিতে অভ্যস্ত মহারাজ ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদকে একই বিষয়ে কাব্য রচনায় প্রণোদিত করিয়া উভয়ের শক্তি-প্রতিদ্বন্দ্বিতার মল্লযুদ্ধ উপভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন।'—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়] ? ৩। এ-বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত এই রকম: এক. রামপ্রসাদের 'কবিরঞ্জন' মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ-নিরপেক্ষভাবেই লেখা হয়েছিলো। কারণ, এতে কোথাও মহারাজার নাম উল্লেখ নেই; অথচ কবি তো অকৃতজ্ঞ নন; কারণ তিনি তাঁর 'কালীকীর্তনে' উপকারপ্রাপ্ত রাজকিশোর নামে এক ধনী ব্যক্তির নাম বার বার করেছেন। দুই 'কবিরঞ্জন' ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের সমসময়ে বা পরবর্তীকালে লেখা হয়েছে। এমন মনে করার কারণ; প্রথমত, গম্ভীর স্বভাবের serious কবি,

[1] ক. 'বাঙ্গালা ১১৬৫ সালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় ১৪ / চৌদ্দ বিঘা ভূমি রামপ্রসাদ সেনকে নিষ্কররূপে প্রদান করেন,' —গুপ্ত কবি। খ. "...একশ বিঘা জমি 'মহোত্তরাণ' হিসাবে দান করেন।"—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। [বা. সা. ই. : ৩ : ২ : পৃ. ২০৭]।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পরিহাসসিক্ত চটুলতা পছন্দ করেননি এবং এর মধ্যে নিজের আরাধ্যা কালিকার রূপকে আন্তরিক ভাবে খুঁজে পাননি ; তাই ভারতচন্দ্র-নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত সাধকের দৃষ্টিতে, বীরাচারী তান্ত্রিকের সাধন-বিশ্বাসে নিজস্ব ভঙ্গীতে একটি কালিকামঙ্গল রচনা করার ইচ্ছাতেই এটি সৃষ্টি করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, কাব্যরস-প্রকাশে অপ্রাসঙ্গিক হলেও সুন্দরকে দিয়ে শব সাধনা করানো, বিদ্যা-সুন্দর বা অন্যান্য পাত্রপাত্রীদের দিয়ে যত্রতত্র কালীর স্তব-স্তুতি ও বন্দনা করানোতেই মনে হয় যে, এই কাব্য কবির ধর্মবিশ্বাস প্রকাশের অন্যতর একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তৃতীয়ত, বিদ্যা ও সুন্দর শাপভ্রষ্ট দেবদেবী, তাঁরা মর্ত্যে এসেছেন কালিকার পূজা-প্রচারের জন্য : 'সাবধানে শুন পুত্র সর্বকথা কহি। / শাপভ্রষ্ট তোমা দোঁহাকার জন্ম মহী॥ / বিদ্যাবতী হারাবতী তুমি মালাধর। / মমপূজা প্রকাশার্থে হইয়াছ নর॥' চতুর্থত, 'কবিরঞ্জনে' পরধর্ম, বিশেষত বৈষ্ণব সমাজের প্রতি কটাক্ষ আছে, এই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর পেছনে কাব্য-প্রেরণা অপেক্ষা ধর্মান্ধতার সংঘর্ষাত্মক প্রবৃত্তিই প্রকট। তাই আমরা বলতে চাই যে 'কবিরঞ্জন' রচিত হয়েছে ভারতচন্দ্রের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিস্পর্ধী রূপে ;—তাই এ হয় ভারত-এর সমসাময়িক, না হয় পরবর্তী।

কাব্য হিসাবে 'কবিরঞ্জন' খুব উচ্চস্তরের নয়। চরিত্র-চিত্রণে ও তাদের ক্রমবিকাশে কবি সার্থকতা দেখালেও বাগ্-বৈদগ্ধ্য, চারুতা, শব্দ-কারুকর্মে ভারতচন্দ্র থেকে অনেক দূরেই রয়ে গেছেন। অধিকন্তু ভারতচন্দ্র যেখানে আদি রসের চূড়ান্ত করেও রুচিহীন হন নি, স্থূলতাকে পরিহার করতে পেরেছিলেন, সেখানে 'ভক্ত কবি রামপ্রসাদ অবিশুদ্ধ কামপিপাসাকে ভারতচন্দ্রের মতো শিল্প-সৌকুমার্যের দ্বারা পরিশুদ্ধ করতে পারেন নি। একদিকে ভক্তকবির নির্বেদ বৈরাগ্য, আরেকদিকে অনঙ্গরঙ্গের আসক্তি এই দুই বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির টানে তাঁহার বিদ্যা-সুন্দরের প্রেমের চিত্রগুলি অতিশয় জান্তবধর্মী হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন স্থানে তিনি এতটা লঘুচেতনা ও কুরুচিপূর্ণ ভাষা ও ইঙ্গিত ব্যবহার করিয়াছেন যে, ভক্তকবির প্রতি ভক্তি রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়ে।' আসলে, রামপ্রসাদের প্রতিভা প্রকৃতপক্ষে গীত-কবিতা বা পদাবলী রচনারই প্রতিভা। ভাবপ্রবণ কবির কোন ভাব-প্রেরণার সংক্ষিপ্ত রসস্ফূর্তি যত স্বাভাবিক হয়, দীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে তাহা তত স্বাভাবিক হইতে পারে না।'

এই অস্বাভাবিকতার জন্যে, উৎকট কামপিপাসার স্থূল বর্ণনার কারণে, এবং সর্বোপরি ভক্তকবির সঙ্গীত প্রতিভার ছায়ায় পড়ে 'কবিরঞ্জন' লোকের রসনা-রোচন হতে পারে নি।

২১. **'ময়নামতীর গান :** ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৩২১ বঙ্গাব্দে ঢাকা সাহিত্য পরিষদের ৩নং গ্রন্থ হিসাবে 'ময়নামতীর গান' প্রকাশিত হয়। কোন এক ভবানী দাস এই কাব্যের রচয়িতা। ত্রিপুরা রাজ্যের শোভনগাজী নামক এক স্কুল শিক্ষকের কাছ থেকে একখানি এবং চট্টগ্রামের অপর এক মুসলমান ভদ্রলোকের কাছ থেকে আর একটি পুঁথি সংগ্রহ করে উক্ত সম্পাদকদ্বয়

'ময়নামতীর গান' সম্পাদনা করেন। প্রথম সংগৃহীত মূল পুঁথির প্রারম্ভে 'কয়েকটি মুসলমানী ও বৈষ্ণবিক ঘোষা বেশী ছিল।' সেগুলিকে সম্পাদকদ্বয় গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় বাদ দেন।—যদিও প্রাচীন পুঁথি সম্পাদনার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুতর ত্রুটি। এর পরে, ভট্টশালী মহোদয়-দুজনের ব্যবহৃত দুই পুঁথি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ চট্টগ্রাম থেকে আরও দুটি পুঁথি সংগ্রহ করেন। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সংগৃহীত মোট চারটি পুঁথির সাহায্যে করিম সাহেব 'ময়নামতীর গানে'র একটি পাঠ তৈরি করেন এবং তা ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র সেন এবং বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটি এই রকম : "১৯২৪ সনে স্বর্গত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, স্বর্গত ডক্টর বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দুইখণ্ডে গোপীচন্দ্রের কাহিনীর তিনটি পাঠ প্রকাশিত হয়। প্রথমটি 'গোপীচন্দ্রের গান'; ইহা মৌখিক সংগ্রহ এবং মৌখিক বা লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত - ইহাতে রচয়িতার কোন নাম নাই। দ্বিতীয় সংগ্রহটি পুঁথি হইতে মুদ্রিত হইয়াছে, ইহার নাম 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী', ইহার রচয়িতার নাম ভবানীদাস [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এটিকেই পূর্বেই 'ময়নামতীর গান' নামে প্রকাশিত করেছিলো]। তৃতীয় সংগ্রহটিও হস্তলিখিত পুঁথি অবলম্বন করে মুদ্রিত ইহার নাম 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' এবং ইহার রচয়িতার নাম সুকুর মামুদ।" আবার দু খণ্ডে প্রকাশিত ঐ তিনটি মুদ্রিত গ্রন্থ ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে [রথযাত্রা ১৩৬৬] ড আশুতোষ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে 'গোপীচন্দ্রের গান' নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

'ময়নামতীর গান' বা 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী'র রচয়িতা ভবানী দাস সম্বন্ধে কিছু সংশয় পণ্ডিতমহলে বর্তমান। এ-বিষয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন : "ময়নামতীর গান' পড়িয়া হিন্দু ভবানী দাস যে পুস্তকের রচয়িতা নহেন, কিন্তু একজন মুসলমান ইহার রচয়িতা এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি।" তিনি একের পর এক যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে : ১। এই পুঁথি চারখানিরই সংরক্ষক ছিলেন মুসলমান, অর্থাৎ মুসলমানের ঘর থেকেই পুঁথিগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। ২। এর মধ্যে প্রচুর ভাবে আরবী-ফার্সী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। ৩। এর ভাব পরিবেশের মধ্যেও ব্যাপকভাবে ইসলামী আবহাওয়া লক্ষ্য করা যায়। ৪। তিনি আরও বলেছেন : 'এখন কেহ যদি আপত্তি করেন যে, মূল পুঁথি ভবানী দাসেরই লিখিত, মুসলমান কর্তৃক তাহার পরিবর্তন হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, এই রূপ হইলে কেবল ভাষার পরিবর্তন হইত, ভাবের পরিবর্তন হইত না'। অপরাপর গবেষকগণও পুঁথি বিচার করে দেখেছেন যে এতে মাত্র চার জায়গায় ভবানী দাসের ভণিতা আছে, এবং সেই ভণিতাও মূল কাব্য-দেহের সঙ্গে ঠিকমতো মিশ খায় নি, যেন বাইরে থেকে এনে ভবানী দাস নামটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সব শেষে মন্তব্য এই যে : "ভবানী দাসের

'ময়নামতীর গানে' মুসলমান কবি বিলক্ষণ হাত চালাইয়াছিলেন। এমনও হইতে পারে মূলগান মুসলমানের রচিত। তাহাতে ভবানী দাস নিজের নাম জুড়িয়া দিয়াছেন।"

লোক-মুখে প্রচলিত [oral tradition], লোক-গাথা 'গোপীচন্দ্রের গান'-এর কাহিনীর ওপর ভিত্তি করেই 'ময়নামতীর গান'-কে লিখিত রূপ দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু রচয়িতার কবিত্বগুণ না থাকায় এবং ধর্মপ্রচারের প্রবৃত্তি প্রবল হওয়ায় কবি পুঁথির প্রথম থেকেই যে ভাবে নাথধর্মের তত্ত্বকথা বা যোগ-মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন তাতে এর সাহিত্য-রস কাব্য-কুম্ভে সঞ্চিত হতে পারে নি। নাথধর্মের প্রতি অনুরাগের ফলে কবি উদ্দাম আবেগে এই 'ময়নামতীর গান'কে নাথ-তত্ত্ববিষয়ক প্রচার গ্রন্থ হিসাবে রচনা করলেও এর পরিণতির মধ্যেই যা একটু মানবিকগুণ ও কাব্যোচিত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কাব্যের শেষে রাজা গোপীচন্দ্র বারো বছরের সন্ন্যাস জীবনের কৃচ্ছ্রসাধন ও যোগ চর্চা সম্পন্ন করে এসে চার রাণীর সঙ্গে মিলিত হলেন, এবং : 'নানা দ্রব্য নানাবস্তু করিল ভোজন। / সেই নিশি গোয়াইল আনন্দিত মন॥' অর্থাৎ ধর্মপ্রচার, নাথ-যোগতত্ত্ব প্রসঙ্গ, রাজার সন্ন্যাস জীবনের মাহাত্ম্য প্রকাশ সবই তুচ্ছ করে 'অসার' ভোগ বিলাস ও উত্তপ্ত জীবন-কামনাকেই কবি প্রতিষ্ঠিত করলেন। রচনার ভাষা চরিত্র-সৃষ্টি, কাব্যিকতা ইত্যাদির মরু-শুষ্কতার মধ্যে তথাকথিত ভবানী দাসের রচিত 'ময়নামতীর গান'-এর এইটুকুই যা মরূদ্যান।

২২. **'হপ্তপয়কর'** : সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি-ব্যক্তিত্ব এবং বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি সৈয়দ আলাওল-এর শেষ জীবনের রচনা এই 'হপ্ত[সপ্ত]পয়কর' কাব্য। দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রানী'র সমাপ্তি অংশ ধরে এটি কবির চতুর্থ রচনা। সম্ভবতঃ ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে সাজাহান-পুত্র শাহ সুজার শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের আগেই আলাওল এই কাব্যটির অনুবাদ কার্যের সূচনা করেন। অনেকে মনে করেন 'হপ্তপয়কর'-এর রচনাকাল ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দ। তখন বোধ হয় কবির বয়স সত্তরের কাছাকাছি [ড. শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতে ১৫৯৭-১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দ কবির আয়ুষ্কাল]। বৃদ্ধ জরাজীর্ণ 'চিন্তাকুল' চিত্তে কবি আলাওল পারস্য দেশের কবি নিযামী গজনভী [আলাওলের ভাষায় 'নেজামি গঞ্জনি'] সমরকন্দ [১১৪৯-১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ] রচিত ফারসী ভাষার বিখ্যাত কাব্যপঞ্চকের অন্যতম 'হফ্‌ত পয়কর'-কে [রচনাকাল ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ] পরিচ্ছন্ন বাঙলায় ও পদ্যে অনুবাদ করেন। আলাওল এই কাব্যটির অনুবাদের ক্ষেত্রেও আরাকান রাজ শ্রীচন্দ্রসুধর্মার সমরসচিব সৈয়দ মুহম্মদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন।

পারস্যরাজ বাহ্‌রাম ও তাঁর রাণীর গল্প এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। কবি গজনভী আরব্য রজনী বা 'আলফা লায়লা'র ঢঙে এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন ; ফলে অবাস্তব রোমান্টিকতা এর কাহিনীকাঠামোটিকে স্বাদু করে তুলেছে। প্রথমে রাজপুত্র পরে রাজা হয়ে বাহ্‌রাম নানা কেরামতির সাহায্যে, নৃত্যগীত শিকার ইত্যাদি ভোগ-

তারল্যের মধ্যে দিয়ে, সাতটি রাণী সংগ্রহ করেন। ঐ রাণীদের কাছ থেকে সপ্তাহব্যাপী একটি করে সাতটি গল্প শুনে সবশেষে কি ভাবে সুখে-আনন্দে রাজত্ব করতে থাকলেন তারই সরস রোমহর্ষক কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা এই কাব্যের উপজীব্য। যে স্বাদে লোকে আরব্য-রজনী বা ঐ ধরণের গল্প পাঠ করে এখানেও সেই একই স্বাদ; তবে পদ্যে রচিত, আর কাব্য গুণ বিবর্জিত এই যা। এখানে আমরা আলাওলের অনুবাদের দু-চার চরণ আস্বাদ করতে পারি: 'কহে রাজকন্যা প্রতি/শুহ গুণবতী/কহ এক প্রসঙ্গ উপাম। / এই মতে সপ্ত রাতি / সপ্ত বিজ্ঞা কলাবতী / কহিলেক সপ্ত সুপ্রসঙ্গ ॥,

২৩ **'অভিনব জয়দেব':** প্রাচীন যুগের বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চর্চার গৌরবস্থানের উল্লেখ করতে গিয়ে গিয়ে আজও বাঙালী জয়দেবের প্রতিভা ও কবিত্বের স্মরণ করে। চৈতন্যদেব এই জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্য দিবা-রাত্র আস্বাদন করতেন। পরবর্তী সমস্ত কবিই জয়দেবকে তাঁদের কাব্য রসধারার 'আদি গঙ্গা ভগীরথ' হিসেবে বরণ করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন মিথিলার কবি বিদ্যাপতি নিজেকে 'অভিনব জয়দেব' বিশেষণে বিভূষিত করে, গৌরব প্রকাশের মাধ্যমে। অ-বঙ্গীয় [আজকের ভূগোলের বিচারে] বিদ্যাপতির কবি-প্রাণতা ও কাব্য-সুষমা এমনিতেই রসিক বাঙালীকে আকৃষ্ট করছিলো, তার ওপর তিনি যখন 'অভিনব জয়দেব' উপাধি ধারা শ্লাঘা প্রকাশ করলেন তখন বাঙালী তাঁকে আরও আপনার করে নিলেন। অর্থাৎ জয়দেবের মাধ্যমে বিদ্যাপতি আমাদের হৃদয়ের অন্দর মহলে জায়গা পেলেন।

আমরা জানি যে, কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর বাঙালী নন। তাঁর জন্ম মিথিলাতে। যদিও এই মিথিল [তিরহুত] পাল এবং সেন রাজত্বকালে, বাঙলা দেশের অন্তর্গত ছিলো। নানা পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে একথা মনে করা হয়ে থাকে যে ১৩৭০ থেকে ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যাপতি জীবিত ছিলেন। তিনি ভোগীশ্বর, কীর্তিসিংহ, শিবসিংহ, ভৈরবসিংহ প্রমুখ একাধিক ব্রাহ্মণ রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।

বিদ্যাপতির প্রধান খ্যাতি তাঁর অপূর্ব-রস-সমৃদ্ধ পদসমূহে—এখানেই তিনি আদর্শ মেনেছিলেন 'পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী' কবি জয়দেবকে। এই পদ-রচনা সূত্রেই তাঁর 'অভিনব জয়দেব' বিশেষণ গ্রহণে শ্লাঘাপ্রকাশ। অবশ্য সংস্কৃত ও অর্বাচীন অপভ্রংশে লেখা কিছু গ্রন্থও আছে যা তাঁর পাণ্ডিত্যখ্যাতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে; যেমন: 'পুরুষ পরীক্ষা', 'ভূ-পরিক্রমা', 'কীর্তিপতাকা', লিখনাবলী', 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' ইত্যাদি।

বিদ্যাপতির পদগুলিই কবিকে অমরত্ব দান করেছে। অগাধ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে উত্তাল ভাবাবেগের সুসমঞ্জন মিলনের ফলে তাঁর এই পদগুলির অপূর্ব দেহ গঠিত হয়েছে। নিখুঁত শব্দচয়ন, সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ, নারী-মনস্তত্ত্ব জ্ঞান তাঁর রাধাকে অতুলনীয়া নায়িকায় পরিণত করেছে। আবার বিরহ বা ভাব সম্মিলনের পদে অতলস্পর্শী গভীরতার সঙ্গে বিচ্ছেদের সীমাহীন শূন্যতা, বিরহকাতরা

রাধার হৃদয়-ভাঙ্গা হাহাকার, সঙ্গত ছন্দ এবং প্রয়োজনীয় শব্দ এবং অলঙ্কারের সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। ঈশ্বরের সৃষ্টিতেও খুঁত আছে; কিন্তু 'অভিনব জয়দেব' তিল তিল করে বিশ্বসৌন্দর্য সংগ্রহের পর তাঁর অ-খুঁত পদগুলিকে রচনা করেছেন। এমন হৃদয় নেঙড়ানো রস-ভাবনা যা বিদ্যাপতির পদগুলির ছত্রে ছত্রে পর্যায়ক্রমে গ্রথিত তা-ই পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে অনুসৃত হয়েছে। জয়দেবের সরল সংস্কৃতে যে কৃষ্ণ-কথা এবং তার ভাব-মাধুর্য রস-দেহ লাভ করেছিলো, তা ই বিদ্যাপতির মনন-এর সাহায্যে পরিপুষ্ট হয়ে একটি পূর্ণ অবয়ব পেয়েছে; যাকে, রসমুগ্ধ বাঙালী এই সুদীর্ঘকাল ধরে উপভোগ করে এসেছে। বিদ্যাপতি তাঁর রাধাকে জয়দেবের ভাবলোক থেকে আবাহন করে নিয়ে এসে নিজের ভাব ও কল্পনা, আপন বুদ্ধি ও বোধ দিয়ে নতুন করে, অভিনব রূপে সাজিয়ে নিয়েছেন। এবং এইখানেই মিথিলার কবির 'অভিনব জয়দেব' শিরোপা গ্রহণ সার্থক হয়েছে।

জয়দেব থেকে বিদ্যাপতির এই উত্তরণ, উভয়ের মধ্যে যে বিশিষ্টতা সৃষ্টি করেছে তা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় সুন্দর করে ধরা আছে: 'জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা। জয়দেবের কবিতা উৎফুল্লকমলজালশোভিত, বিহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর; বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গসঙ্কুলা নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা। জয়দেবের গান, মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি; বিদ্যাপতির গান সায়াহ্ন সমীরণের নিঃশ্বাস'। জয়দেব বঙ্গকবিভারতীর বরপুত্র, বিদ্যাপতি 'অভিনব জয়দেব'।

২৪ **মুনিদত্ত:** বাঙলা ভাষার আদি গ্রন্থ, চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এর [প্রচলিত ও সংক্ষিপ্ত নাম: 'চর্যাপদ'] ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে প্রকাশিত হওয়া, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পরেই দেশে বিদেশে-বাঙালী-নির্বিশেষে ভাষাবিদ, লিপিবিদ, জ্ঞানী-মনীষী বিদ্বান-গবেষকগণ নানাভাবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে এর আলোচনা করেছেন। এই চর্যা-র যে সংস্কৃত টীকাগ্রন্থটি আবিষ্কৃত হয়েছে নেপালের রাজদরবার থেকে তার রচয়িতা হলেন মুনিদত্ত।

কে এই মুনিদত্ত? কি তাঁর পরিচয়? এ সমস্ত আজ আর সম্পূর্ণভাবে জানবার কোনও উপায় নেই। কারণ টীকাগ্রন্থের শেষ কটি পাতা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাঁর নাম পাওয়া যায়নি। তবে এই টীকাগ্রন্থের যে তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া গিয়েছে তাতেই মুনিদত্তের নাম পাওয়া যায়। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'মুনিদত্ত সম্ভবত ১৪শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন'। কিন্তু ড. আহমদ শরীফ বলেছেন: 'চর্যাগীতির টীকাকার মুনিদত্ত কোন শতকের লোক? তত্ত্বগ্রন্থের টীকা, ভাষার জটিলতার জন্যে রচিত হয় না, তত্ত্বের ব্যাখ্যার জন্যেই রচিত হয়। কাজেই চর্যাগীতির রচনাকাল ও টীকাকারের মধ্যে সময়ের ব্যবধান আবশ্যিক নয়। তবে মুনিদত্তের টীকার রচনাকাল

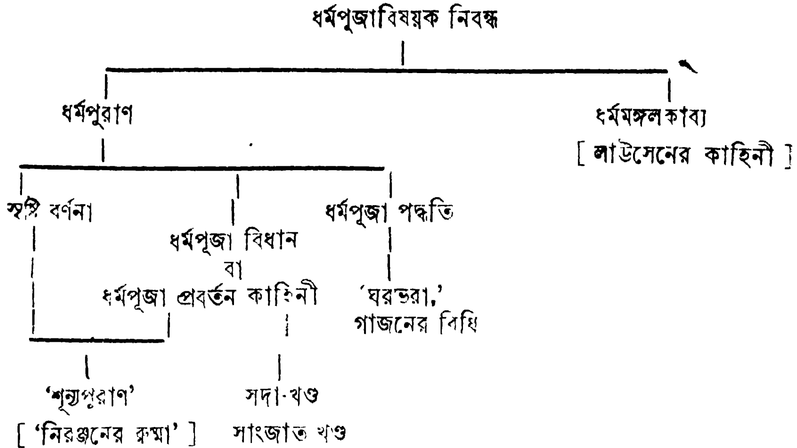
ও প্রাপ্ত পুঁথির লিপিকালের মধ্যে ব্যবধান যে সামান্য ছিল না,তার প্রমাণ মূল ও টীকার পাঠে পার্থক্য। মুনিদত্তের সময়ে চর্যাগীতি সংগ্রহটি বহুল প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। কাজেই মুনিদত্তের এই টীকা নেপালীদের জন্যে রচিত হলে অবশ্য ভিন্ন কথা, কিন্তু বাঙালীর জন্যে রচিত হলে তা বৌদ্ধ বিলপ্তির আগেই রচিত হয়েছিল বলে মানতে হবে। সে-ক্ষেত্রে টীকা রচনার কাল এগারো-বারো শতকের পরে যায় না।'

মুনিদত্ত চর্যাপদগুলির ব্যাখ্যা সূত্রে বৌদ্ধতান্ত্রিক পারিভাষিক শব্দগুলির যে সরল-অর্থ প্রকাশ করেছেন তার দ্বারা বজ্রযান, সহজযান-বিষয়ে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি প্রমাণ হয়। তিনি পরমত ও পরধর্ম সম্বন্ধেও যে সহিষ্ণু ছিলেন এমন মনে করার কারণ, এই যে, তিনি তাঁর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সহজ মত ছাড়াও শৈব-নাথ প্রভৃতি ধর্ম-সম্প্রদায়ের মতামতকেও গ্রহণ করেছেন। এ-ছাড়াও মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকা গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিসীম। কারণ, "আমরা যদি মুনিদত্তের টীকা না পাইয়া শুধু 'চর্যাচর্য' এবং তিব্বতী অনুবাদ পাইতাম, তাহা হইলে চর্যাপদের দার্শনিক বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করা সুকঠিন হইত। কারণ, তিব্বতী অনুবাদ প্রধানতঃ আক্ষরিক, তদ্দ্বারা বজ্রযান ও সহজযানের সূক্ষ্ম তত্ত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করা দুরূহ হইত।"…অধিকন্তু 'মুনিদত্তের টীকার উদ্‌ঘাটিত তত্ত্ব সংস্কৃত ও অপভ্রংশে রচিত মন্ত্রযান বিষয়ক নানা গ্রন্থে বর্ণিত দার্শনিক মতের বিরোধী নহে, এবং মুনিদত্ত স্বমত প্রমাণ করিতে গিয়া বহু সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও দেশীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি' থেকে যে সমস্ত উদ্ধৃতি ও প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন তার দ্বারাও মুনিদত্তের টীকার প্রামাণিকতা এবং মূল্য স্বীকৃত হয়।

মুনিদত্তের টীকার আর একদিক থেকে ঐতিহাসিক তাৎপর্য এই যে এই সংস্কৃত টীকাগ্রন্থখানি প্রমাণ করে যে বৌদ্ধ তান্ত্রিকাচার কেবল হীন, নীচ জাতীয়ের মধ্যেই সাধ্য ছিলো না; উচ্চ কোটির ব্রাহ্মণ্য অনুধ্যানেরও এ অঙ্গ হতে পেরেছিলো। কারণ, তা না পারলে মুনিদত্ত কখনই দেবভাষা সংস্কৃতে এর টীকা রচনা করতেন না। 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি' নামে চন্দ্রকীর্তি বা কীর্তিচন্দ্র মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকাভাষ্যটির তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন।

২৫. **'নিরঞ্জনের রুষ্মা'** : নাথপন্থার সঙ্গে যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধমতের যেমন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, ধর্মপূজার সঙ্গে কিন্তু সেই সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে নাথ-পন্থাকেই সহজসিদ্ধির প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু বাঙলায় বহুকাল থেকে প্রচলিত ধর্ম পূজা হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধমতের বিশেষত শূন্যবাদের মিশ্রণে তৈরি হয়েছে বলে এতদিন মনে করা হতো। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় এই মন্তব্যকে পরিমার্জন করে বলা হয়েছে যে, ধর্মের 'শূন্য' সূর্য—বৌদ্ধ শূন্যবাদ নয়। তাই ধর্মপূজা এক অর্থে সূর্য পূজা। সে-যাই হোক, 'ধর্মপূজা একটি সঙ্কর ধর্ম'। এই বিমিশ্র ধর্মপূজার প্রসঙ্গে ধর্মপূজাবিষয়কশাস্ত্র-কাব্য-ইত্যাদিরও নানা বিভাগ-উপবিভাগ আছে এবং তারই মধ্যে একটি,—যা 'শূন্যপুরাণ' নামে পরিচিত। এবং যা ১৩১৩ বঙ্গাব্দে

প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই 'শূন্যপুরাণে'র একটি অংশের নাম 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'। সমস্ত ধর্মপূজা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ছড়া-কবিতা-পাঁচালীকে একটি ছকের মাধ্যমে শ্রেণী-বিভক্ত করলে আমরা ধর্মপূজার মধ্যে 'নিরঞ্জনের 'রুষ্মা'র স্থানটিকে সহজে চিহ্নিত করতে পারবো। ছকটি এইরকম :



এর মধ্যে "শূন্য পুরাণের অর্বাচীন অংশে 'শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা' নামে একটি ছড়া-কবিতা পাওয়া যায়।" এটি নানা দিক থেকে যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনই সেদিনের সমাজ-ইতিহাসের কিছু সাক্ষী এ বুকে ধারণ করে রেখেছে।

বাঙলার পাল রাজারা [রাজত্বকাল ৭৫০-১১৬০ খ্রীস্টাব্দ] বৌদ্ধ ছিলেন। ফলে, বাঙলায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বাস বেশ যথেষ্ট সংখ্যাতেই ছিলো। পরে সেন রাজারা বাঙলা অধিকার করে [রাজত্বকাল ১০৯৬-১২৫০ খ্রীস্টাব্দ] ব্রাহ্মণ্য ধর্মের, পুনরুদ্ধার করেন। ফলে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজে বেদবিরোধী বৌদ্ধেরা বিশেষভাবে নিন্দিত হয়ে সমাজের নিম্নস্তরে পতিত হলেন। এঁরা মনে করলেন যে এই অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র মুসলমানেরাই; তাই দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙলার চরম রাষ্ট্রিক সঙ্কটের সময়, লামা তারানাথের সাক্ষ্যে জানা যাচ্ছে যে, ঐ সব বৌদ্ধগণ মুসলমান সেনাপতির গুপ্তচরের কাজ করেছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন যে ত্রাণকর্তা মুসলমানেরা ব্রাহ্মণদের অত্যাচার বন্ধ করবার জন্যেই হিন্দুর দেবতারা মর্ত্যে মুসলমানের মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন। 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'য় এই বিষয়টির কৌতূহল উদ্রেককারী বর্ণনা আছে। 'ব্রাহ্মণেরা ধর্মঠাকুরের ভক্তদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতো, দক্ষিণা না পেলেই তারা শাপ দেয় সদ্ধর্মীদের ধ্বংস করে—ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে সবাই সন্ত্রস্ত। তাই ভক্তেরা এর থেকে নিস্তার পাবার জন্যে ধর্মঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলো : 'মনেতে পাইয়া মর্ম / সভে বলে রাখ ধর্ম /

তোমা বিনে কে করে পরিত্রাণ। / এইরূপে দ্বিজগণ / করে সৃষ্টি সংহরণ / এ বড় হইল অবিচার॥' ভক্তগণের এই রকম কাতর প্রার্থনায় বৈকুণ্ঠে ধর্মঠাকুরের আসন টলে উঠলো : 'বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম / মনেতে পাইয়া মর্ম/মায়ারূপে হইল খনকার। /ধর্ম হইল যবনরূপী/শিরে নিল কাল টুপি/হাতে শোভে বিকচ কামান। /যতেক দেবতাগণ সবে হয়ে একজন / আনন্দেতে পরিল ইজার। / বিষ্ণু হৈল পয়গম্বর / ব্রহ্মা হৈল পাকাম্বর / আদম্ভ হইলা শূলপাণি।' এইভাবে গণেশ গাজী হলেন, কাজী হলেন কার্ত্তিক, হায়া বিবি [Eve] হলো দেবী চণ্ডিকা এবং পদ্মাবতী হলেন নূর। এ-ছাড়াও মুসলমানগণ হলেন দেবতা, যত ফকির হলেন মুনিরা এবং শেখ হচ্ছেন নারদ এবং স্বয়ং ইন্দ্র হলেন মৌলনা। এইভাবে 'নিরঞ্জন নিরাকার' অর্থাৎ বুদ্ধদেব এবং অন্যান্য দেবদেবীগণ মুসলমানের বেশ ধরিয়া যাজপুরের [উড়িষ্যা] বৈদিক হিন্দুদের ধ্বংস করিয়াছিলেন—'শূন্যপুরাণে'র 'নিরঞ্জনের রুম্মা' ছড়াটির ইহাই তাৎপর্য।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই 'নিরঞ্জনের রুম্মা' আবার 'কলিমা জালাল' [আরবী, =রুদ্র-বাক্য] নামেও উল্লিখিত হয়েছে [এই জালালি ছোট ও বড় দু-ভাগে বিভক্ত। 'নিরঞ্জনের রুম্মা'ই বড় জালাল]। অন্যদিকে, এই আবির্ভাবের উল্লেখ ১৪শ শতাব্দীতে দিল্লীর বাদশাহ ফিরুজশাহ তুঘলক উড়িষ্যা ও বাঙলায় যে অত্যাচার করেছিলেন তারও স্মৃতিবাহক। তাই দেখা যাচ্ছে যে ১৬শ শতাব্দীতে ধর্মপূজক সম্প্রদায় একদিকে যেমন উচ্চবর্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন, তেমনি হিন্দু-মুসলমানের প্রভাবকে নিজেদের মধ্যে সংহরণ করে নিতে দ্বিধা করেন নি। ফলে, মুঘলযুগে [১৭শ-১৮শ শতাব্দী] "ইসলামের প্রভাবে নিরঞ্জন খাঁটি একেশ্বরবাদের ঈশ্বর হইয়া উঠিয়াছেন। এই জন্য সেকালের মুসলমানেরা ঈশ্বর পরমেশ্বর, ভগবান প্রভৃতি ঈশ্বরবাচক শব্দগুলি বর্জন করেও 'নিরঞ্জন' বর্জন করেন নি।"

২৬. **'ভক্তিরত্নাকর'** : এই গ্রন্থটিকে বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাসের মহাকোষ-গ্রন্থ বলা হয়ে থাকে। এই মহৎ গ্রন্থটির লেখক অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি নরহরি চক্রবর্তী। ইনি 'ঘনশ্যাম' নামেও পরিচিত। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গার পূর্বতীরে বহরমপুরের সন্নিকটে সয়দাবাদে সংসার-জীবনে বসবাস করতেন। ইনি একান্ত কুণ্ঠার সঙ্গে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন : 'বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সর্বত্র বিখ্যাত। / তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥ / না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম। / নরহরি দাস আর ঘনশ্যাম।'

ইনি বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যেমন : তিনখানি বৈষ্ণব-ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থ : 'ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তমবিলাস' ও 'শ্রীনিবাসচরিত'। দু-খানি পদসংগ্রহ : 'গীতচন্দ্রোদয়' ও 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'। কেউ কেউ মনে করেন যে 'ছন্দঃ সমুদ্র' ও 'পদ্ধতিপ্রদীপ' নামে আরও দুটি গ্রন্থ তাঁর রচনা। নরহরি পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। পদাবলী রচনাতেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিলো। ছন্দ এবং সঙ্গীত শাস্ত্রেও তাঁর পারঙ্গমতা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। কিন্তু এ সমস্তকে অতিক্রম করেছে

তাঁর বাস্তব বুদ্ধি, ঐতিহাসিক বোধ এবং বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি পরমভক্তিবিনম্র শ্রদ্ধা, যা 'ভক্তিরত্নাকর'গ্রন্থে বিবৃত রয়েছে। এটি অবিসংবাদিতভাবে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্য-ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতম সংগ্রহ। পনেরটি তরঙ্গে রচিত এই মহাগ্রন্থে ১৬শ থেকে ১৮শ এই তিন শতাব্দীর বৈষ্ণব সমাজ, সম্প্রদায় এবং আচার্যদের সম্পর্কে যে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়—তার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। অবশ্য কেউ কেউ ভক্তের দৃষ্টিতে দেখা এর সব তথ্যকে নির্বিচারে গ্রহণ করতে চান না। কবি নরহরি প্রসঙ্গে এই বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই অসঙ্গত নয়। কারণ, কবি ভক্তির আবেশে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু তথ্যের গোলমাল পাকিয়ে ফেলেছেন। এছাড়াও 'গ্রন্থটির মধ্যে সংহতির অপ্রতুলতাকে লক্ষ্য করতেও অসুবিধা হয় না। মাঝে মাঝেই প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটেছে—ভাবের ঘোরে ঢুলে পড়ার মতো। লেখক ঘটনা চরিত্র তত্ত্বকথা ও তথ্য পরিবেষণকে তাঁর কাব্যে সমানুপাতিক ভাবে ব্যবহার করতে পারেন নি। ফলে বর্ণনা ও কাব্যগুণ হয়েছে নীরস ও তথ্য সর্বস্ব। তবে কবি মাঝে মধ্যে তথ্য ও ঘটনা বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে স্বরচিত পদ ব্যবহার করে এর কাব্য-পাঠের ঊষরতাকে দূর করতে পেরেছেন বলে মনে হয়।'

আগেই বলেছি যে ধ্রুপদী সঙ্গীতে নরহরির ছিলো একচ্ছত্র অধিকার। তার সার্থক প্রমাণ আছে 'ভক্তিরত্নাকরে'র পঞ্চম তরঙ্গে। এ-বিষয়ে লেখকের জ্ঞান ও আলোচনা তুলনা রহিত। এই গ্রন্থে বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বীর কর্তৃক বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামীর পুঁথি-পেটিকার অপহরণ, শ্রীনিবাস আচার্যের বিবাহ ['গোষ্ঠী সহ রাজার উল্লাস অতিশয়। / আচার্য বিবাহে বহু অর্থ কৈল ব্যয়।'], নরোত্তমের কবি জীবনের মাহাত্ম্য, খেতুরীর মহোৎসবের প্রসঙ্গ ইত্যাদি বহু বহু বিষয়ের বর্ণনা আছে ; যার জন্যে একে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের-সমাজের-সাধনার-ভক্তির-সাধকের-আচার্যগণের আচরণ-চেষ্টাদির মহাকোষগ্রন্থ হিসাবে সম্মান দেখানো হয়েছে।

২৭. **'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'** : এটি বৈষ্ণব-পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ। সংকলক প্রখ্যাত বৈষ্ণব-পণ্ডিত ও সাধক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। ইনি নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঠিক জন্ম সময় জানা না গেলেও ইনি যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্তমান ছিলেন [জগদ্বন্ধু ভদ্রের মতে ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে এঁর জন্ম হয়] সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমেই তাঁর এই বিখ্যাত পদ সংকলনটি প্রণয়ন করেন [অনেকের মতে ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ, কারো মতে ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে]। ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দে বৃন্দাবনে এঁর মরলীলার অবসান হয়।

বিশ্বনাথ পণ্ডিত ও দার্শনিক। কিন্তু সাধক হিসাবেও বৈষ্ণব মণ্ডলে তাঁর স্থান খুবই উচ্চে। বাল্যেই এঁর মধ্যে সন্ন্যাসভাবের স্ফুরণ হলে একান্ত তরুণ বয়সে পিতার নির্দেশে ইনি দার পরিগ্রহ করেন ; কিন্তু অচিরেই সংসার ত্যাগ করে ইনি বৃন্দাবনবাসী হন। এবং সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে তাঁর অধীত বিদ্যার সাহায্যে তিনি প্রায় ষোল-খানি সংস্কৃতটিকা গ্রন্থ, কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ এবং 'বল্লভ'-'হরিবল্লভ' এই দুই ভণিতায়

বৈষ্ণব-পদও রচনা করেছিলেন। কিন্তু এঁর সমস্ত সাহিত্য-কীর্তির গৌরব ছাড়িয়ে পদ-সংকলক হিসেবে খ্যাতি অভ্রংভেদী হয়ে উঠেছে।

বৈষ্ণব ভাব-যমুনায় ষোড়শ শতাব্দীতে যে উদ্বেল জোয়ার এসেছিলো তা সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যেই দার্শনিকতা ও তত্ত্ব নির্দেশনার বাঁধা পথে চালিত হতে হতে গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হয় এবং উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভা-নিবিষ্ট ভক্তি ও সাধনার অভাবে সমগ্র বৈষ্ণবীয়তায় অবক্ষয়ের ভাঁটার টান ধরে। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রতিফলিত হয় বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে। কারণ, বলা হচ্ছে: 'অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিস্তর লেখক বৈষ্ণব পদাবলী-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দুই-চারি জন ছাড়া কাহারও রচনা উল্লেখযোগ্য নয়।' এবং 'অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুই একজন পদকর্তা কিছু কিছু কবিত্বের পরিচয় দিলেও এ-যুগ মৌলিক পদাবলীর যুগ নহে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, প্রথা-পালনের জন্যও অনেক বৈষ্ণব কবি লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন মাত্র। ফলে প্রায় সব ক্ষেত্রেই, আন্তরিকতার স্থলে কৃত্রিম কলাকৌশল প্রাধান্য পাইয়াছে।'

কিন্তু এই ভাব-দৈন্যের অন্ধকারে আশার সবচেয়ে তীব্র আলো এসেছিলো পদ-সংকলন গ্রন্থ রচনার দিক থেকে। এই যুগেই অনেকগুলি বড় বড় পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ সংকলিত হয়ে অসংখ্য বৈষ্ণব-পদ ও পদকর্তার পরিচয়, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। অশক্ত প্রতিভা নিয়ে নতুন পদ-সৃষ্টির অসম প্রতিযোগিতায় না নেমে, বৈষ্ণব ভক্ত-সাধক এবং পণ্ডিতগণ পদ-সংরক্ষণের যে ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, তাতে তাঁদের বাস্তব-বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির প্রশংসা না করে পারা যায় না। এবং এই কাজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বিশ্বনাথ। এ বিষয়ে তিনি প্রাথমিকেরও মর্যাদার অধিকারী।

'ক্ষণদা'-র অর্থ রাত্রি। সংগ্রাহক ত্রিশটি রাত্রি অর্থাৎ একমাসের প্রত্যেক রাত্রের এক এক উৎসব অনুসরণ করে যাতে পূর্ণ মাস ধরে গীত হতে পারে সেই ভাবে তিরিশটি 'ক্ষণদা'য় সমস্ত সংগ্রহটিকে ভাগ করেছেন। প্রত্যেক ভাগের শেষে বিশ্বনাথ যে শ্লোকটি ব্যবহার করেছেন ['ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব বিভাগে'] তা থেকে এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, তিনি পূর্ব ও উত্তর দুটি ভাগে ভাগ করেই তাঁর সংকলনটিকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাল তাঁকে সেই সুযোগ দেয় নি। তার আগেই তিনি গতায়ু হন। নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন ভাব প্রকাশকে রসবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে বিশ্বনাথ মোট ৪৫ জন কবির মোট ৩০৯টি পদ সংগ্রহ করেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁর স্বরচিত প্রায় ৫১টি পদ। এই সংগ্রহ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস প্রমুখ বহু কবির পদ সংগৃহীত হলেও চণ্ডীদাসের কোন পদকে এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এ-সম্পর্কে কবির মনোভাবের প্রকৃত কোন ব্যাখ্যা করা কঠিন। এই সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' বাঙলা কবিতা সংকলনের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

২৮. **সহজিয়া চণ্ডীদাস:** পুরানো যুগের বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত

হলে সবচেয়ে বড় যে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় তা হচ্ছে 'চণ্ডীদাস-সমস্যা'। কারণ, 'অনন্ত', 'অনন্ত বড়ু', 'দ্বিজ', 'দীন', 'সহজিয়া' ইত্যাদি কত উপনামে বিশেষিত হয়ে বেশ কিছু সংখ্যক চণ্ডীদাস পুরাতন বাঙলা সাহিত্যে নানাধরনের-ভাবের বিষয়ের যে কাব্য-কবিতা রচনা করেছেন,—তা সবের হিসাব নিতে গিয়ে সাধারণ পাঠকদের বিড়ম্বনার একশেষ হতে হয়। কিন্তু এত অসুবিধা সত্ত্বেও, প্রত্যেকটি চণ্ডীদাসের রচনা-বস্তুর পার্থক্য অনুসন্ধান করে নিয়ে, পৃথক চিহ্ন দিয়ে আলাদা-আলাদা পরিচয়ের সীমায় এনে তাঁদের উপস্থিত করতেই হয়; নচেৎ যোগ্যতমের সম্মান রক্ষা করা যায় না। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই এখানে 'সহজিয়া চণ্ডীদাস' নামে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের এক চণ্ডীদাস-কবির সম্বন্ধে ও তাঁর প্রতিভার বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হবে।

এ-কথা জানা আছে যে, গোপনীয়তায় সাধ্য সূক্ষ্ম প্রেমরস এবং তার ক্রম-অধঃপতিত রূপ, স্থূল কামচর্চা, বা সহজ বৈষ্ণবমতকে কোনদিনই শিষ্ট বৈষ্ণবসমাজ কিংবা হিন্দুসমাজ প্রীতির চোখে তো দেখেই নি, প্রকৃতপক্ষে অবহেলাই করে এসেছে। অথচ এই অবহেলা উপেক্ষা করেই এই পথে এমন কিছু কিছু সাধক এসেছেন যাঁদের সাধ্য পথ এবং আরাধ্য দেবতাকে প্রদত্ত নৈবেদ্য হিসাবে রচিত গান-কবিতাগুলিতে অনাস্বাদিত-পূর্ব রসের সন্ধান পাওয়া যায়। এ-প্রসঙ্গে অন্তত 'চণ্ডীদাস' নামধেয় এক সাধক কবির নাম করতে পারি 'যাঁর নামে প্রচারিত সাধনভজন সংক্রান্ত অনেক রাগাত্মিকা পদে চিত্রসৃষ্টি ও কাব্যকলার যে সূক্ষ্মতা দেখা যায়, বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাসে তাহার মূল্য বিশেষভাবে স্মরণীয়।' কিন্তু এই চণ্ডীদাসের জীবন-পরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সম্বল নানা ধরনের মুখরোচক গল্প-কথা। যেমন, এঁর বাড়ী বাঁকুড়া জেলার ছাতনায়, রামী নামে জনৈক রজক-কন্যাকে ইনি সাধন-সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে এই অবৈধ ও অসবর্ণ প্রণয় সেদিনের রক্ষণশীল সমাজ আদৌ ভালো চোখে দেখে নি। তার ওপর চণ্ডীদাসের সহজ-সাধনার অঙ্গ হিসাবে দেহমার্গীয় প্রেমচর্চার আচার-আচরণকেও নৈষ্ঠিক ও রক্ষণবাদী বৈষ্ণব সমাজ কোনদিনই অনুমোদন করে নি—ফলে তাঁকে প্রচুর গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে এ-সবই গল্প মাত্র—এর মধ্যে কোন সত্য নেই। অবশ্য ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় রামী চণ্ডীদাস সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন: 'Through the story of the love-episodes of Candidasa,....with the washer-woman Rami, is still shrouded in mistery and as such cannot be credited historically as supplying proof of Candidasa himself being an exponent of the Sahjiya practice, yet we should remember that tradition always indicates possibility.'

সে যাই হোক, চণ্ডীদাসের জীবন-পরিচয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকুক, তাঁর নামে প্রচলিত 'রাগাত্মিকা, প্রহেলিকা ও প্রচ্ছন্ন তাৎপর্যপূর্ণ পদগুলির অধিকাংশই বুদ্ধির

বলকে উজ্জ্বল, কোনটির রূপক-প্রতীক প্রশংসার যোগ্য, কোথাও বা কল্পনাশক্তি শিল্প-রূপ লাভ করেছে।

আমরা এখানে দু-চার বিন্দু তাঁর কাব্যামৃত পান করবো : ১. 'মৃত্তিকার উপরে / জলের বসতি / তাহার উপরে ঢেউ। / তাহার উপরে বিপরীত বসতি / তাহা কি জানয়ে কেউ॥' ২. 'মাটির জনম / না ছিল যখন / তখন করেছি চাষ / দিবস রজনী / না ছিল যখন / তখন গণেছি মাস॥' ৩. 'শুন রজকিনী রামী। ও দুটি চরণ / শীতল জানিয়া /শরণ লইনু আমি॥' ক। এই সব পদের ভাষা আধুনিক। খ। ব্যাপক ব্যবহারে প্রচুর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ভাষা-দেহে। গ। সহজ সাধনতত্ত্বের গূঢ় পন্থার নির্দেশক, তাই এই পদগুলিকে বহু সময় অর্থহীন হেঁয়ালি বলে মনে হয়েছে। ঘ। কবির বাক্‌ভঙ্গীতে চারুত্ব দুর্লক্ষ্য নয়। ঙ। তত্ত্ব-সাধনার কাঁটাকে ধন্য করে এগুলি যে এক একটি কবিতা-ফুল হতে পেরেছে তার প্রধান কারণ 'সহজিয়া চণ্ডীদাস' আগে কবি, পরে সাধক। এতকথা বলার পরেও আক্ষেপ এই যে 'সহজিয়া চণ্ডীদাসে'র পদের কোন প্রামাণ্য সংকলন নেই।

২৯. 'মীনচেতন' বা 'গোরক্ষবিজয়' : নাথধর্ম ভারতের একটি প্রাচীন ধর্ম। যোগপন্থা এই ধর্মের সাধ্য। এখানে দেহই ভিত্তি, মন তার নিয়ামক। এই নাথধর্ম ও যোগসাধনা বিবর্তনের নিয়মে গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর ভারতের জনসমাজে বিভিন্ন ভাবে আজও প্রচলিত রয়েছে। এবং স্বাভাবিক ভাবেই, পাতঞ্জল মুনির চেষ্টায় এই যোগ-সাধনা শাস্ত্রভুক্ত হয়ে যখন একটি অভিজাত ধারার সৃষ্টি করলো, তখনও তারই পাশে পাশে আর একটি লৌকিক ধারাও বইতে থাকে। বাঙলার নাথধর্ম ঐ লৌকিক ধারারই ভিন্নতর রূপ মাত্র। আবার কখন যে এরই মধ্যে শিবোপাসনা প্রবেশ করেছিলো তা নিশ্চিত করে না বলা গেলেও, নাথ বা যোগী-সম্প্রদায় শিবোপাসক, শিবের গোত্রেই তাঁদের পরিচয়। নাথগুরুগণ শিবকে তাদের গুরু বলে স্বীকার করেছেন ['মোর গুরু মহাদেব জগত ঈশ্বর।'] বাঙলাদেশে শিবোপাসক নাথধর্মেরই প্রচলন। এঁরা এখানে এখনও যোগী বা যুগী নামেই পরিচিত। 'দশম শতাব্দীর দিকে সারা উত্তর-ভারতেই গোরক্ষপন্থী নাথসম্প্রদায় ছিল, পশ্চিম-ভারতেও এঁদের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। বাঙলাদেশেও এই সম্প্রদায় অতি প্রাচীন কাল থেকেই নিজেদের সাধন ভজন করে আসছিলেন এবং এখনও নানা শাখা-প্রশাখায় এঁরা বাঙলা দেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছেন। এঁদের ধর্ম-কর্ম ও আচার-আচরণকে কেন্দ্র করে অনেক ছড়া-পাঁচালী, লোকগীতি-আখ্যানকাব্য পাওয়া গেছে।' এই রকমই একটি আখ্যানকাব্যের নাম 'মীনচেতন' বা 'গোরক্ষবিজয়।' এই কাহিনী, নাথধর্ম সম্পৃক্ত অপরাপর ছড়া-গান ইত্যাদির সঙ্গেই লোকমুখে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কৃষক বা সাধারণ মানুষের কণ্ঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। এবং এ-রকম মনে করা অযৌক্তিক হবে না যে সপ্তদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে উক্ত কাহিনী সংকলিত ও পুঁথিবদ্ধ হয়।

আলোচ্য 'মীনচেতন' কাব্যের মীননাথ হচ্ছেন আদিগুরু শিবের ['আদিনাথ'] শিষ্য। এই মীননাথের শিষ্য হচ্ছেন গোরক্ষনাথ। শিষ্য গোরক্ষনাথ কিভাবে অধঃপতিত ও মোহমুক্ত গুরুর 'চেতনা' বা জ্ঞান ফেরালেন বা তাঁকে উদ্ধার করলেন তাই নিয়েই এর কাহিনী। এই কাব্য কাহিনী সম্পর্কিত সমস্ত পুঁথি অবলম্বনে মোট তিনটি সম্পাদিত সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে : **ক** ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত শ্যামদাস সেন বিরচিত 'মীনচেতন' ; **খ** ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে মুন্সী আবদুল করীম সাহেব সম্পাদিত ও শেখ ফয়জুল্লা বিরচিত 'গোরক্ষবিজয়' এবং **গ** ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে ড. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ও ভীমসেন-এর লেখা 'গোর্খবিজয়'। তিনজন সম্পাদকের সম্পাদিত তিনজন কবির লেখা পুঁথি ও তিনটি গ্রন্থ-নাম দেখে সাধারণ পাঠকের ঘাবড়ে যাবার কথা। এর সঙ্গে ড. দীনেশচন্দ্র, ড. শহীদুল্লাহ্, ড. সুকুমার সেন প্রমুখ সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও গবেষকগণের নানামুখী মতামত আছে। কিন্তু সেই তর্ক-কাঁটায় ঢাকা মতারণ্যের মধ্যেকার সহজ ও নিরাপদ পথটি এই রকম : ১। 'গোরক্ষ-বিজয়', 'মীনচেতন', 'গোরক্ষবিজয়-মীনচেতন' ইত্যাদি নানা নামের পুথিগুলির মূল কাহিনী,কাঠামো প্রায় একই ; গুরু মীননাথকে কদলীরাজ্যের ষোলশত নারীর ভোগ-মোহগ্রস্ততা থেকে যোগ-চেতনার সাহায্যে জাগিয়ে তোলায় শিষ্য গোরক্ষনাথের চেষ্টা অর্থাৎ মীননাথের চেতনার উদ্বোধন-'মীনচেতন' এবং এই কাজে শিষ্য গোরক্ষনাথের লোভ-লালসাকে জয়—'গোরক্ষবিজয়' ২। সম্পাদকগণ ও অন্যান্য সকলে যত পুঁথি আবিষ্কার ও সম্পাদন করেছেন তাতে ফয়জুল্লা, কবীন্দ্র, কবীন্দ্র দাস, ভীম দাস, শ্যামদাস সেন, ভীমসেন রায় প্রমুখ অনেকজন কবির নাম পাওয়া গেছে। কিন্তু অধিকসংখ্যক মুসলমানী শব্দের ব্যবহার ও ভণিতায় সর্বাধিকবার [১৩ বার] নাম ব্যবহৃত হওয়ার কারণে ফয়জুল্লাকেই এই কাব্যের প্রকৃত রচয়িতা হিসেবে গ্রহণের দাবী সর্বাপেক্ষা জোরালো। ৩। ভীমসেন রায় প্রমুখের নামগুলি গায়েনদের হওয়াই সম্ভব।

বাঙলা বা বাঙলার বাইরে এই মীননাথ বা গোরক্ষনাথের কাহিনী ও তৎসংক্রান্ত নানা অলৌকিক কথা বিভিন্ন আকারে প্রচলিত আছে। কিন্তু 'বাঙলাদেশে এই কাহিনীর উৎপত্তি বিকাশ ও পূর্ণতা যে বাঙলার মাটিতেই ঘটেছে'এমন মনে করলে কিন্তু ভুল হয় না। বিরাট এর কাহিনী, ব্যাপ্তি মহাকাব্যিক চরিত্র ও ঘটনা সংঘাতে, নাটকীয়তায় এই কাব্যের মধ্যে মহৎ সাহিত্যসম্ভাব্যতাকে ধারণ করে রেখেছিলো। কিন্তু 'কবিদের মানসিক পরিবেশের সঙ্কীর্ণতা, অশক্ত কবি-ক্ষমতা, উচ্চ-ভাবকল্পনা এবং সাহিত্যিক পরিমিতিবোধের অভাব ও সর্বোপরি শ্রোতৃসমাজের সাংস্কৃতিক জড়তার জন্যে এবং উচ্চ ভাব, চরিত্রগুলির মহৎ গুণ ও স্বভাবের প্রতুলতা সত্ত্বেও একে সার্থক কাব্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি।' পারলে মধ্যযুগের সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমরা একটি অভিনব কাব্য-সম্পদ লাভ করতাম।

৩০. 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' : এটি একটি ইতিহাসভিত্তিক আখ্যানকাব্য। লেখক মৈমন-

সিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার ধরীশ্বর গ্রামবাসী গঙ্গারাম নামক জনৈক কবি। ঐ কাব্যের একটি মাত্র পুঁথি ঐ গ্রাম থেকে মৈমনসিংহের পত্রিকা, 'সৌরভ'-এর সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার আবিষ্কার করেন। সমগ্র 'মহারাষ্ট্র পুরাণে'র একটি মাত্র খণ্ড 'ভাস্কর-পরাভব' নামক কাণ্ডটিই কেবল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এবং এই খণ্ডের শেষে গঙ্গারাম এই ভাবে তাঁর গ্রন্থ রচনার নির্দেশ করেছেন: 'ইতি মহারাষ্ট্র পুরাণে প্রথম কাণ্ডে ভাস্কর পরাভব শকাব্দ ১৬৭২ সন ১১৫৮ সাল তারিখ ১৪-ই পৌষ রোজ শনিবার'। এর থেকে ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরের একেবার ২৯-৩০ তারিখ পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন এইটি পুঁথিটি লেখার কাল। কিন্তু 'মহারাষ্ট্র পুরাণে'র যেটি বিষয়বস্তু অর্থাৎ বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামা, সেই দুর্যোগের সময়টি এই পুঁথি রচনার মাত্র সাত-আট বছর আগেকার ঘটনা ['Frist Maratha Invasion, 1742 :···By a forced marched he (Nabab Alibardi) arrived at Burdwan on the 15th. April 1742.' *History of Bengal* Vol 2. p. 454] অতএব প্রাপ্ত পুঁথিটি কবির স্বহস্তে লেখা হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।

মহারাষ্ট্র পুরাণের পুঁথিটির আবিষ্কারক মৈমনসিংহের অধিবাসী ; পাওয়াও গিয়েছে মৈমনসিংহ জেলার গ্রাম থেকে। এর মধ্যে মৈমনসিংহের ভাষা আনুপূর্বিক ব্যাহৃত হয়েছে। তা-সত্ত্বেও যেহেতু কবি গঙ্গারাম পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ় অঞ্চলে সংঘটিত বিষয়ের যথার্থ, ইতিহাস অনুমোদিত এবং প্রত্যক্ষদৃষ্টের ন্যায় বর্ণনা করেছেন, সে- হেতু কবিকে রাঢ়ের অধিবাসী হইতেই হবে—এই রকম সিদ্ধান্ত করে কিছু ঐতিহাসিক তৃপ্তি পেতে চান। আঞ্চলিকতার খণ্ডদৃষ্টিতে আছন্ন হয়ে ঐ সব ঐতিহাসিক যুক্তি প্রয়োগ করেন যে কবি গঙ্গারাম রাঢ়ের লোক এবং কোন ক্রমে পুঁথি বা আত্মরক্ষার্থে কবি মৈমনসিংহে পালিয়ে গিয়ে কাব্য রচনা করেছেন এবং স্থানীয় লিপিকরের প্রভাবে কাব্য-দেহে স্থানীয় ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কিন্তু নানা কারণেই এই সমস্ত যুক্তি গ্রাহ্য নয়।

গঙ্গারাম বঙ্গে বর্গীর আক্রমণ ও অত্যাচারের বর্ণনা প্রায় ঐতিহাসিকের নিষ্ঠায় ও কবির দৃষ্টিতে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তৎকালের যুগ ও রুচির প্রভাবে কাহিনীর সূচনায় ও শেষে পুরাণের ঢঙে মহাদেব-নন্দী-পার্বতী-পাপে ভরা পৃথিবীর প্রসঙ্গ এসেছেন তাই এর নাম 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'। যেমন: 'নন্দীকে দেখিয়া শিব বলিছে বচন। / দক্ষিণ শহরে তুমি জাহ ততক্ষণ ॥ / সাহুরাজা নামে এক আছে পৃথিবীতে / অধিষ্ঠান হও যাইয়া তাহার দেহেতে ॥ / বিপরীত পাপ হইল পৃথিবী উপরে। / দূত পাঠাইয়া যেন পাপী লোকে মারে ॥'

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্গীর হাঙ্গামা বাঙালীর জীবনে নিদারুণ দুঃস্বপ্ন। কবি অসাধারণ নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধেয় নিরপেক্ষতায়, সেই দারুণ দিনগুলির বর্ণনা করেছেন। এতে কাব্য-রস ব্যাহত হলেও ঐ ঘটনা সম্পর্কে যে বাস্তব ও নিষ্ঠাপূর্ণ তথ্য লাভ যায় তা একে অভিনবত্ব দান করেছে। সেদিনের দেবদেবীর পাঁচালী কাহিনীর গতানুগতিকতার মধ্যে গঙ্গারামের কাছ থেকে যে ঐতিহাসিক গল্পটুকু পেয়েছি তার লাভই বা কম কি?

৩১. 'নবীবংশ': চট্টগ্রামের পরাগলপুরের বাসিন্দা এবং সুফী ধর্মসাধক কবি সৈয়দ সুলতান এই 'নবীবংশ' কাব্যের রচয়িতা। ইসলাম ধর্মের মহাপুরুষ অর্থাৎ 'নবী'গণের জন্ম-জীবনাচরণ, ধর্মবোধ এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। অনেকে মনে করেন যে এই কাব্যগ্রন্থটি ১৬২৫ বা ৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করা হয়েছে।

কবি সৈয়দ সুলতান বাঙলায় মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে যে সংস্কার, সে সম্পর্কে সচেতন থেকেই তাঁর সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যার অন্যতম ফল এই 'নবীবংশ'-এর সৃষ্টি। তিনি এই গ্রন্থে প্রথম মানব হযরত আদম [আঃ] থেকে শেষ নবী হযরত মহম্মদের [সঃ] জীবন-কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থ যাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই প্রচার ও শ্রদ্ধা লাভ করতে পারে সে জন্যে তিনি হিন্দু সমাজের পূজনীয় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-নরসিংহ-রাম-কৃষ্ণ প্রমুখের সঙ্গে মুসলমানগণের পক্ষে শ্রদ্ধেয় নূ-ইব্রাহিম-মুসা-ইসা প্রমুখের প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন।

কবি সৈয়দ আরবী ভাষায় লেখা সা'লাবীর-র 'কিসাসুল আমবিয়া' ['নবীদের কেচ্ছা'] গ্রন্থের ভাবানুবাদ করেছিলেন তাঁর কাব্যে। হিন্দু-মুসলমান এ সমদর্শী প্রকৃত জীবনবাদী কবি বিভিন্ন ভাষা ও শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন, এমন কি হিন্দু শাস্ত্রও বাদ যায় নি। এই কারণেই কি তাঁর সধর্মীয়েরা তাঁর প্রতি বিরাগ পোষণ করতেন। 'নবীবংশ' রচনায় কবি ভক্তির আবেগে সর্বত্র ঐতিহাসিক সত্যতা বজায় রাখতে পারেন নি, যেমন হযরত মহম্মদের সঙ্গে ইরাকরাজ জয়কুমের যে যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই; কেবল মাহাত্ম্য প্রচারই এর উদ্দেশ্য। কবি তাঁর কাব্যের প্রস্তাবনায় বলেছেন: 'লস্কর পরগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি।/ কবীন্দ্র ভারত-কথা কহিল বিচারি॥ / হিন্দু-মুসলমান তা এ ঘরে ঘরে পড়ে। / খোদা রছুলের কথা কেহ না সোঙরে॥ /...দুঃখ ভাবি মনে মনে করিলুং ঠিক। / রছুলের কথা কথা যত কহিম অধিক॥' এই বাসনা থেকেই সৈয়দের নবী বংশের জন্ম, যার নামকরণেও হিন্দু 'হরিবংশে'র প্রভাব লক্ষণীয়।

৩২. 'অঙ্গদের রায়বার': রামায়ণের বীর চরিত্র বালির পুত্র অঙ্গদ। রাম-রাবণের যুদ্ধে রামপক্ষের অন্যতম সেনাপতি। রায়বার অর্থে 'রাজবার্তা, রাজদূত-কথিত সংবাদ, রাজবার্তাবহ, রাজদূতের কার্য, রাজার স্তুতি, স্তুতি-পাঠক, ভাট' [দ্রষ্টব্য: হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বঙ্গীয় শব্দকোষ': পৃ. ১৯১৭]। ড. সুকুমার সেন এর মতে: "'রায়বার' আসিয়াছে সংস্কৃত রাজদ্বার হইতে। 'রায়বার' মানে শরীর বন্ধন, আশীর্বাদ।" মনে হয় এই অর্থ নির্ণয় ঠিক হলো না। কারণ, রামায়ণে 'রায়বার'-এর যে পরিচয় পাই, এবং 'অঙ্গদের রায়বার' অংশে অঙ্গদের আচার-আচরণ অভিধানকৃত অর্থকেই গ্রহণ করে। প্রসঙ্গত অভিধান 'রায়বার' শব্দটির ব্যাপক, ব্যবহারিক উদাহরণ দিয়ে তাঁর অর্থ নির্ণয়কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সাগর বন্ধন শেষ। লঙ্কার চার দুয়ারে রামচন্দ্রের চারটি থানা পড়েছে। রাবণেরও সৈন্যসজ্জা সম্পূর্ণ। কিন্তু উভয়পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হচ্ছে না। তখন রাম, রাবণের

মতলব বোঝার জন্যে অঙ্গদকে লঙ্কায় পাঠালেন। শ্রীরাম বলেন, 'হে অঙ্গদ মহাবলী। / রাবণ-রাজারে কিছু দিয়ে এস গালি ॥" রামের কথায় রাজা-রামের দূত হয়ে ['সে বালির সুত আমি, সুগ্রীবের চর। / অঙ্গদ নাম ধরি আমি রামের কিঙ্কর ॥'] দূতের কার্য অর্থাৎ রাবণকে গালাগালি দিয়ে যুদ্ধের জন্যে উত্তেজিত করতে গিয়েছিলেন বলে এই অংশের নাম হয়েছে 'অঙ্গদের রায়বার'।

বৈষ্ণব-পদ-সঙ্গীতের যে ধারায় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সমগ্র বাঙলা সাহিত্য পরিপ্লাবিত হয়েছিলো অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে তাতে ভাঁটার টান ধরে। তা ছাড়া তৎকালের সমাজ ও রাজনৈতিক অবস্থায় দেবতা-রাজা কারোরই ওপর আর পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে পারছিলো না। সর্বত্রই মূল্যবোধের অবনয়ন ও সমাজবন্ধনের অবক্ষয় দেখা দেয়। তারই ফলে, মঙ্গল সাহিত্য, রাধাকৃষ্ণ-গান বা রামায়ণ-মহাভারত কথা সর্বত্রই খণ্ড শক্তির প্রকাশ হিসেবে আখড়াই-কবিগান ইত্যাদির প্রচার হতে থাকে। রামায়ণ-মহাভারতের মতো বড় কাহিনীর অনুবাদ করবার ক্ষমতাতেও দমের খামতি দেখা দিয়েছে। ফলে, ছোট ছোট পালায় ভাগ করে প্রধানত রামায়ণের হালকা ও সুপাচ্য অংশগুলি নিয়ে যুগের উপযোগী করে এই 'রায়বার' সমূহ রচিত হতে থাকে। শ্রোতাদের রুচি অনুসরণে এ-বিষয়ে গায়েনদের কৃতিত্বই ছিলো সমধিক। শঙ্কর কবিচন্দ্র, ফকিররাম প্রমুখ কবিরা তাঁদের রামায়ণে এই ধরণের রায়বার যুক্ত করেছিলেন। পরে এদের কিছু কিছু অংশ কৃত্তিবাসের রামায়ণের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায়। আসলে যে তারল্য সেদিনের যুগ-চৈতন্যে দেখা দিয়েছিলো তা থেকে হাল্কা ভাষায়, চটুল রসিকতায় রাজা-রাজসভাকে আক্রমণ করার প্রবণতা দেখা দেয়। সর্বত্রই লঘু রসিকতা, গ্রাম্যস্থূলতা, উৎকট আদিরসের পরিবেষণ। তা-নইলে : 'অঙ্গদ বলিছে, সত্য কহ ইন্দ্রজিতা। / এ যত বসেছে সবাই কি তোর পিতা ॥ /···ধন্যা নারী মন্দোদরী, ধন্য তোর মাকে। / এক জনা এত পতি কেমনে সে রাখে ॥ / ··মোর বাপ কোন বাপে বেঁধেছিলো লেজে ॥ / একে একে কহি, সকল বাপের কথা। / এ সবে কাজ নাই যোগী বাপটি কোথা ॥'

৩৩ **অদ্ভুত আচার্য :** কবি অদ্ভুত আচার্য রামায়ণের অনুবাদক। এঁর প্রকৃতনাম নিত্যানন্দ আচার্য। পাঁচ বছর বয়সে স্বয়ং রামচন্দ্র কবির সম্মুখে উপস্থিত হয়ে হাতের তীর দিয়ে কবির জিহ্বায় রাম নাম লিখে দেন ও রামায়ণ রচনার আদেশ দেন এবং এরই প্রভাবে তিনি অল্প বয়সেই রামায়ণের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। এই অদ্ভুত কাণ্ডের জন্য তাঁর নাম হয় অদ্ভুত আচার্য। কেউ কেউ কল্পনা একটু বাড়িয়ে বলেছেন যে "কবিত্বশক্তি ও সুগায়কতাগুণের জন্য নিত্যানন্দ আচার্য [অথবা 'বড়ু' নিত্যানন্দ] 'অদ্ভুত আচার্য' নাম পাইয়াছিলেন। নামটির আরও একটি ব্যাখ্যা হয়। 'অদ্ভুত আশ্চর্য-রামায়ণ'—ভণিতায় এই বস্তু নাম হইতে 'অদ্ভুত আচার্য রামায়ণ' এই বিকৃতি এবং তাহা হইতে আরও বিকৃতি 'অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ' উদ্ভূত হইতে পারে।" যাই হোক, কবির জীবন-পরিচয়ের মতান্তর অতিক্রম করে মোটামুটি যা জানা যায় তা

এই রকম,—কবির পিতার নাম শ্রীনিবাস [অথবা, কাশী] মাতার নাম মেনকা। কবিরা চার ভাই এবং কবির তিন পুত্র। কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাঁর নিবাস আত্রেয়ী নদীর উত্তর এবং করতোয়ার পশ্চিমে সোনাবাজু পরগণার বড়বাড়ি বা অমৃতকুণ্ডা গ্রামে। এই গ্রাম বর্তমানে পাবনা জেলায়। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী [অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসুও বটেন] সিদ্ধান্ত করেছেন যে আনুমানিক ১৫৪৭ খ্রীস্টাব্দে কবির জন্ম হয় এবং 'তাঁহার কাব্যও ষোড়শ শতাব্দীর শেষে, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত হওয়াই অধিকতর সম্ভাবনা।'

অদ্ভুত আচার্যের জন্ম-সময়, জীবন-পরিচয়ে সংশয় থাকলেও তাঁর কাব্য-প্রতিভার পক্ষে কাল-চিত্ত জয় করতে কোনও অসুবিধা হয় নি। কেউ বা তাঁকে আবেগের আতিশয্যে, কবি কৃত্তিবাসের সমকক্ষ বলতে চেয়েছেন, কেউ বা তাঁর চেয়েও বেশি। কিন্তু তুলনার এই তার-তম বাদ দিয়েও বলা যায় যে তাঁর কাব্য-দেহে, কাহিনী নির্বাচনে অদ্ভুতত্ব বা পূর্বসূরীর অনুসরণ যতখানি না মুখ্য, তার চেয়ে লোক-জীবন চর্যায়, সেখান থেকে রস সংগ্রহে, কৃতিত্ব অনেক বেশী। একটি আর্য কাহিনী-কাব্যের দেহে তিনি এমন সুন্দরভাবে লৌকিকবোধ, রুচি ও রসকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছেন যে সাধারণ বাঙালী অচিরেই তাঁকে আপন করে নিয়েছে এবং সেখানেই তাঁর সার্থকতা। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। দশরথ মৃগয়ার ছল করে তাঁর তৃতীয় স্ত্রী সুমিত্রাকে বিয়ে করতে যান। কিন্তু কৌশল্যা ও কৈকেয়ী সংবাদ পেয়ে দেবতার কাছে কামনা করছে: 'নিরবধি পূজে দোঁহে পার্বতী-শঙ্কর। / সুমিত্রা দুর্ভাগা হৌক মাগে এই বর॥' সতীন সম্পর্কে ঠিক এমনই মনোভাবের পরিচয় পাচ্ছি আমরা বাঙলার লৌকিক ছড়াগুলির মধ্যেও; যেমন: 'অশ্বথ কেটে বসত করি। / সতীন কেটে আলতা পরি॥' বা 'আগুন যখন হুদ হুদাবে, সতীনকে ঠেলে দেবো। সতীন আমার জনমের বাদী।' এই বাঙালীয়ানার শক্তিতেই অদ্ভুত আচার্যের জয়। কবি রাম-জননী কৌশল্যাকে মা-যশোদার প্রতিরূপে, মমতাময়ী মায়ের বর্ণসুষমায় অঙ্কিত করে বাৎসল্য-মধুর বাঙালীর অন্তঃপুরে ঠাঁই পেয়েছেন। কবি কৃত্তিবাসের গৌরব-কিরণ যদি প্রতিবাদী হয়ে না দাঁড়াতো, তা হলে অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের পক্ষে বাঙালীর হৃদ-সিংহাসনে একটু বড় জায়গা করে নিতে অসুবিধা হতো না। অনেকে মনে করেন যে অদ্ভুত-কাব্যের বহু অংশ বেনামে কৃত্তিবাসের কাব্যের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে।

সে যাই হোক, অদ্ভুত আচার্য ছিলেন বাঙালীর কবি। তাই তিনি 'বাঙালী চেতনার সার্বিক আদর্শ-মহিমাঙ্কনে এবং বাঙালী জীবনের চাপল্য-তরল সাধারণ মুহূর্তের চিত্রণে সমপরিমাণে তাঁর লেখনী ছিল মুক্ত পক্ষ,—সিদ্ধ হস্ত।' এবং সেখানেই তাঁর সিদ্ধি।

৩৪. কোরেশী মাগন: এই কোরেশী মাগনের ভণিতায় 'চন্দ্রাবতী' নামক একটি আখ্যায়িকা কাব্য পাওয়া গিয়েছে। সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ এই কবি

মাগনের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে নানা ধরণের সন্দেহ পোষণ করেন। সংশয়গুলি এইরকম : ১. 'চন্দ্রাবতী' কাব্যের কোরেশী মাগন এবং কবি আলাওলকে উৎসাহদাতা ও রোসাঙ্গ রাজ্যের অমাত্য মাগন ঠাকুর কি একই ব্যক্তি? ২. মন্ত্রী মাগন নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং কাব্যকলারসে যথেষ্ট আসক্ত ছিলেন [আলাওলকে কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত করাই তো তার যথেষ্ট প্রমাণ], তাই তাঁর পক্ষে 'চন্দ্রাবতী' নামক কাব্য রচনা করা সম্ভব হলেও : ক) "মাগন মুসলমান হইলে কখনও 'ঠাকুর' উপাধি ব্যবহার করিতেন না।" খ) 'চন্দ্রাবতী' কাব্যে যে মোট এগার বার 'মাগন' ভণিতা ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে পাঁচবার শুধু 'মাগন' এবং ছয়বার 'কোরেশী মাগন'-এর দেখা মেলে। একবারও 'ঠাকুর মাগন' বা 'মাগন ঠাকুর'-এর ব্যবহার পাওয়া গেল না কেন? ৩. আলাওল তাঁর 'সয়ফুলমুলুক' কাব্যে মাগনের পিতার সম্পর্কে বলেছেন : 'রাজ্যপাল সৈন্য-মন্ত্রী আছিলেন তাত। / শ্রীবড় ঠাকুর নাম জগৎ বিখ্যাত॥' অতএব এখানেও মাগনের হিন্দুত্ব প্রমাণিত হয়। ৪. এক দিকে মাগনের উৎসাহে আলাওল 'পদ্মাবতী' রচনা সম্পন্ন ও 'সয়ফুলমুলুক'-এর সূচনা করেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি আলাওলকে গুরু হিসাবে স্বীকার করেন। অবশ্য এই গুরুগিরি কাব্য ও সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে; মাগনের ধর্মগুরু ছিলেন শাহ 'মা-সুম'। এখন উক্ত সংশয়গুলিকে এই ভাবে নিরসন করা যেতে পারে : ১। অমাত্য মাগন ও কবি মাগন এই দুই 'মাগন' আমাদের যুক্তিতে একই ব্যক্তি বলে মনে হয়। ২। কবি আলাওল তাঁর 'পদ্মাবতী', 'সয়ফুলমুলুক' এই দুই কাব্যে তাঁর উৎসাহদাতা রাজামাত্যের 'মাগন' নাম হওয়ার এক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন; অর্থাৎ মন্ত্রী মহোদয়ের যে 'মাগন ঠাকুর' নাম তার মধ্যে তাঁর পিতৃনাম ও কুলনাম কোনটিই উপস্থিত নেই। ওদিকে কবি মাগনও বলছেন মাগন তাঁর 'গুণনাম'। অতএব উভয়ের একই ব্যক্তি হওয়ার সম্ভাবনাই বাড়ে। ৩। কবি আলাওল তাঁর 'সয়ফুলমুলুকে অমাত্য মাগন সম্পর্কে বলেছেন; 'সিদ্দীক বংশেও জন্ম শেখজাদা জাত।' আর কবি মাগনও নিজেকে 'কোরেশী মাগন' বলেছেন। তাই, যেহেতু "ফাতেমীয়রা ছাড়া কোরেশ গোত্রের অন্যান্য শাখার লোকের সাধারণত 'শেখ' নামে পরিচিত। মন্ত্রী মাগন কোরেশ গোত্রের খলীফা আবুবকর সিদ্দিকী বংশীয় শেখ জাদা। কবি মাগনও কোরেশ বংশ-সম্ভূত বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। অতএব নামে উভয়েই অভিন্ন।" ৪। 'অমাত্য মহাজন' মাগন ঠাকুর যদি হিন্দুই হবেন তবে তাঁর ধর্মগুরু মুসলমান শাহ মা-সুম হবেন কেন? ৫। মুসলমানের 'ঠাকুর' পদবী কেন হবে?—এর উত্তরে বলা হচ্ছে : পুরনো বাঙলা পুঁথিতে আমরা মুসলমানের 'মাগন চৌধুরী','টোনা ঠাকুর','গাঙুর ঠাকুর''আলী হোসেন ঠাকুর','জি ঠাকুর'প্রভৃতি নাম পাচ্ছি। এ-ছাড়াও সেদিনের রোসাঙের রাজ্যাধিকারভুক্ত এখনকার চট্টগ্রামের অঞ্চল সমূহে আজও 'ঠাকুর' ইত্যাদি 'আরাকান-রাজ প্রদত্ত খেতাব কিংবা প্রশাসকের পদবীধারী' মুসলমানগণ গৌরব ও আভিজাত্যের সঙ্গেই বসবাস করছেন। 'অতএব মাগনের মন্ত্রী পিতার নাম শ্রীবড় ঠাকুর এবং তাঁর নাম মাগন ঠাকুর

হলেও তাঁরা মুসলমান ছিলেন' [ড আহমদ শরীফ]। ৬. 'ঠাকুর' পদবী থাকলেই যদি হিন্দু হন, তবে টপ্পা-গায়ক 'কালীমির্জা' ও কি মুসলমান; অথবা 'আলকাপ' গায়ক ঝাঁকসু মিঞা?

কবি মাগনের বসবাস মনে হয় রোসাঙ্গ শহরেই ছিল। কারণ, উচ্চ রাজ-পদাধিকারীর রাজধানীতে বসবাসই সম্ভব। কবির কাব্য ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দের [এই সালে কবির মৃত্যু হয়] দু-এক বছর আগে রচিত হয়েছিলো বলে মনে হয়।

কোরেশী মাগনের এই 'চন্দ্রাবতী' কাব্য দেশীয় রূপকথাকে ভিত্তি করে রচিত। এতে রূপকথার সমস্ত প্রকার বৈশিষ্ট্য তো আছেই, তার সঙ্গে প্রণয়কাব্যের আবেশ-জড়িত রোমান্টিকতা একে মনোমুগ্ধকর করে গড়ে তুলেছে। মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যের যুগে রচিত বলেই কি কবি মাগন বীর ভান ও চন্দ্রাবতী দুই নায়ক-নায়িকাকে শাপভ্রষ্ট দেব-সন্তান রূপে দেখিয়েছেন? মাগনকে কি কবিত্বে অথবা পাণ্ডিত্যে প্রথম সারির কবি হিসেবে গ্রহণ করতে না পারলেও, মিষ্টি ও সাজানো-গোছানো পরিচ্ছন্ন ভাষা, ঋজু ভঙ্গি, সুনিপুণ ছন্দ-প্রয়োগ, বিবিধ ঘটনা ও বিভিন্ন রস-সৃষ্টির জন্যে তাঁর প্রশংসা না করে পারা যায় না। নায়ক বীরভান-এর বিলাপের ভাষায়: 'কেমতে শুনিব তোর মুখের বচন। / কেমতে দেখিব তোর পা-এর চলন।। / কেমতে ভুরুর কালা চন্দ্রিমা দেখিব। / কেমতে লোচন চারু পোতলি মিলিব।।'—সেদিনের হিসাবে এখানে যে মৌলিকতা আস্বাদন করা গেলো তার জন্য কবিকে গৌরবদান অবশ্যই করতে হবে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে এই 'চন্দ্রাবতী' কাব্যের কাহিনীর সঙ্গে কিন্তু রামায়ণের অনুবাদক মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর কোনো সম্পর্ক নেই।

৩৫. **'অভয়ামঙ্গল':** চট্টগ্রামের কবি দ্বিজ রামদেবের 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যটি সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে চণ্ডীমঙ্গলের ধারায় রচিত হয়েছিলো [১৬৪৯ বা ১৬৫৪ বা ১৬৫৭-৫৮ খ্রীস্টাব্দ। 'এই তারিখ যথার্থ হউক বা না হউক, রামদেব সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বর্তমান ছিলেন, এ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নহে।'—ড অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]। মধ্যযুগের বিশেষত মঙ্গলকাব্যের কবিদের রীতি-ভঙ্গ করেই বলা যেতে পারে রামদেব তাঁর কাব্য মধ্যে কোন আত্মপরিচয়ই দেননি। তাই, কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং তাঁর পিতার নাম কবিচন্দ্র [উপাধিও হতে পারে] ছাড়া কবির জীবন-পরিচয় আমাদেব কাছে আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত।

দ্বিজ রামদেবের এই 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যটি সম্প্রতি [১৯৫৭] আবিষ্কৃত হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে [ড. আশুতোষ দাস—সম্পাদিত]। সপ্তদশ শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গলকাব্য-ধারার একজন শ্রেষ্ঠ [?] কবির উৎকৃষ্ট কাব্য ঠিক তিন-শ বছর ধরে কোন্ কারণে লোকলোচনের আড়ালে পড়েছিলো তা কেউই বলতে পারেন নি। সে যাই হোক, কবির কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল' ["কবি কোথাও কোথাও 'সারদাচরিত'ও বলেছেন" একে]। তিনভাগে বিভক্ত কাব্যটির প্রথম ভাগে 'সৃষ্টি

পত্তন' মঙ্গল-দৈত্যবধ, ইন্দ্রের শাপমোচন, অভয়ার মর্ত্যে পূজা পাওয়া, কংস-সরোবর তীরে বাস, দশভুজার মূর্তি স্থাপন ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে আখেটি বা কালকেতু ব্যাধের কাহিনী এবং তৃতীয় অংশে ধনপতির উপাখ্যান। সব মিলিয়ে প্রায় বিরাট কাব্য।

রামদেবের কাব্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টি চোখে পড়ে তা হচ্ছে কাব্য-মধ্যে প্রায় এক-শ বৈষ্ণব পদের ব্যবহার। এই পদগুলির অধিকাংশেই কবির নিজের লেখা কিছু কিছুতে ভণিতাও আছে [যেমন : গোবিন্দ দ্বিজ, গোবিন্দ সুত, মনোহর, দ্বিজ উমাকান্ত প্রমুখ]। এই বৈষ্ণবপদগুলিকে কবি কাহিনীর এক এক বক্তব্যবস্তুর প্রকাশক হিসেবে প্রয়োগ করেছেন। কবি শাক্ত বিষয়-অবলম্বনে কাব্য রচনা করতে গিয়ে তাতে এমন নির্বিচারে বৈষ্ণব পদের ব্যবহার তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবকে যতখানি না প্রকাশ করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ধরা পড়েছে একই অঞ্চলের পূর্ববর্তী কবি মাধব আচার্যের অনুসরণ এবং তৎকালের বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলের দুশ্চেন্ত আচ্ছাদনটি। কিন্তু এই কাজেও কবি রামদেবের ক্ষমতা গীতরসমণ্ডিত নয়, বর্ণনাধর্মের নবস পদ্ধতিতে রচিত, যেমন : 'ভাই রে মধুবনে আর ভয় নাই। / আনন্দে বিহারে তথা রাম কানাই ॥ / আজু আপনি মাঠেতে আইলে নন্দের দুলাল। / না ধাইঅ না ধাইঅ বোলে রঙ্গিয়া রাখোয়াল ॥' ···ইত্যাদি।

দ্বিজ রামদেব চট্টগ্রামের কবি এবং তাঁর প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে ঐ একই অঞ্চলে একই বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন দ্বিজ মাধব। এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে, দ্বিজ রামদেব কোনো কোনো দিক দিয়ে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভাষার মধ্যেও সেইরকম প্রভাব ও অনুকরণ সম্যকরূপে লক্ষ্য করা যায়। সামান্য দু-একটি প্রসঙ্গ তুলে এই প্রভাব ও অনুকরণের স্বরূপটিকে বলবার চেষ্টা করবো। যেমন, ১। মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যের সমস্ত শাখার প্রায় সব উল্লেখযোগ্য কবিই ভণিতা ব্যবহারে একটা নিজস্ব রীতি [style] তৈরি করেছিলেন ; কিন্তু, রামদেব এ-বিষয়ে বিশ্বস্তভাবে মাধবের অনুকরণকারী। ২। মাধব-কবি হয়তো ভুল বশত তাঁর পুঁথিতে দুবার গণেশ বন্দনা করেছেন। রামদেবও প্রায় একই ভাষায়, একই আঙ্গিকে ও ভুল [?] করে দুবার গণেশ বন্দনা করেছেন। ৩। যে ধরণের ঘটনা বর্ণনায় মাধব কবি যে যে প্রকারের ছন্দ ব্যবহার করেছেন, রামদেবও তাই করেছেন। ৪। দ্বিজ মাধব গায়কের সময়-নির্দেশানুসারে যে ভাবে পালা ভাগ করেছেন রামদেবও হুবহু ঠিক একই ক্রমে তাঁর পালাগুলিকে ভাগ করেছেন, ইত্যাদি। এ-সত্ত্বেও কেন যে বিশেষভাবে বলা হচ্ছে : 'রামদেবের প্রতিভা দ্বিজ মাধব অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ' তা বোঝা গেল না।

এর পরেও সম্পাদক-সমালোচক হাল ছাড়েন নি। দ্বিজ মাধব 'বেচারা' হয়ে যাবার পর, মুকুন্দরামের তুলনায় রামদেবের 'চরিত্রগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য—বাস্তব-জীবনের সঙ্গে কবির গভীর সংস্পর্শ। নরনারী বা দেবদেবী সমস্ত চরিত্রই প্রতিদিনের

জীবনকেই যেন চিত্রিত করিয়াছে।...অবশ্য বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার সুসামঞ্জস্য থাকিলে সাধারণ ব্যাপারও বিচিত্র রসে ভরিয়া ওঠে, আমাদের কবির সেই শক্তি ততটা তীক্ষ্ণ ছিল না। যদি থাকিত, তাহা হইলে তিনি মুকুন্দরামের গৌরব খর্ব করিতে পারিতেন।' বেশ, রামদেবের কল্পনা ছিলো না, কি রকম বাস্তববোধ ছিলো তা একটি উদাহরণ দিয়ে দেখা যাক: মুকুন্দরামের বেণে মুরারি শীল 'বড় দুঃশীল'। রামদেব তাকে সংশোধন করে 'সুশীল' করে দিয়েছেন। 'মুকুন্দরামের তুলনায় দ্বিজ রামদেবের বাস্তবজীবন-বোধের যে কত অভাব ছিল, ইহা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে'।

অতএব দ্বিজ রামদেবের মধ্যে যথার্থ এবং মৌলিক কোন কাব্যগুণ থাকলে অপরাপর মঙ্গলকাব্য রচয়িতাগণের পাশে তাঁর অল্প একটু ছোট জায়গাও জুটতো। জনগণের রস-প্রীতির ধারায় ভেসেই তাঁর নাম একালের তীরে এসে পৌছাতো। তিনশো বছর পরে এক পুঁথি অন্বেষণকারীকে আশ্রয় করে নতুন করে কাল সমুদ্রে পাড়ি দেবার চেষ্টা করতে হতো না।

৩৬. চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ': সপ্তদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচয়িতা দ্বিজবংশী বা বংশীদাস চক্রবর্তীর কন্যা চন্দ্রাবতী ছিলেন একজন বিদুষী মহিলা। তিনি রামায়ণ রচনা করে পুরাতন বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে একমাত্র মহিলা-কবি হিসাবে গৌরব অর্জন করেছেন। ঠিক কোন সময়ে তাঁর রামায়ণ রচিত হয় তা জানা না গেলেও যেহেতু দ্বিজবংশী সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক ছিলেন, সেহেতু তাঁর কন্যা চন্দ্রাবতীর কাব্য ঐ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হয়েছিলো, এমন মনে করা যেতে পারে।

চন্দ্রাবতীর জীবনের কথা কিছুই জানা যায় নি। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত মৈমনসিংহ গীতিকার একটি পালায় চন্দ্রাবতীর বিয়োগান্তক জীবন-পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রথম যৌবনে এক পুরুষকে ভালোবেসেছিলেন। পরে সেই ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় কি ভাবে চন্দ্রাবতীর জীবন দুঃখের ও বিচ্ছেদের অন্ধকারে আবৃত হয়ে যায় তাই-ই ঐ কাব্যের উপজীব্য। কোন কোন ঐতিহাসিক ঐ সব লোককাব্যকে অস্বীকার করে চন্দ্রাবতী ও তাঁর কাব্যের অস্তিত্বকেই মানতে চান না। কিন্তু যে রকম ব্যাপকভাবে চন্দ্রাবতীর জীবন, পালা, তাঁর রচিত রামায়ণ ও দস্যু কেনারামের পালা মৈমনসিংহে প্রচলিত আছে, তাতে চন্দ্রাবতীর কবি ব্যক্তিত্বকে একটি কাল্পনিক ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া যথার্থ হবে না।

চন্দ্রাবতী যে রামায়ণ সম্পূর্ণ বা তাঁর অংশ বিশেষ লিখেছিলেন তার কোন পুঁথি পাওয়া যায় নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন পুঁথি সংগ্রাহক মৈমনসিংহের অধিবাসী চন্দ্রকুমার দে স্থানীয় মহিলাদের গলায় এই রামায়ণ গান শুনে তা সংগ্রহ করে নেন। 'মেয়েরাই ইহার গায়ক, কবি স্ত্রীলোক, ইহার শ্রোতা ও গায়কেরাও অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীলোক' [ড. দীনেশচন্দ্র]। মৌখিক সংগ্রহ হলেও এটি পূর্ণাঙ্গরূপে সংগৃহীত

হতে পারে নি। এ-ছাড়াও চন্দ্রকুমার গ্রাম্য মহিলাদের কণ্ঠ থেকে এই গান সংগ্রহ করলেও এর গ্রাম্য চেহারা কোথাও বজায় থাকে নি। সংগ্রাহকের গ্রাম্য গাথা-ছড়া-সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক প্রথা না জানা থাকায় এই রামায়ণ পাঠে মনে হয় যে আধুনিক কালে কলকাতায় বসে কোন শহুরে কবি এটিকে রচনা করেছেন। এর গ্রাম্য ভাব-ভাষাভঙ্গি সবই পরিবর্তিত করে এর সাহিত্যিক মূল্যটিকে অবনমিত করে ফেলেছেন।

কিন্তু এত সব সত্বেও চন্দ্রাবতীর মধ্যে যে কবি-প্রাণতা ছিলো তা অস্বীকার করা যাবে না। এতে ধৃত নারীসুলভ কোমলতাটুকু শত পুরুষ হস্তের পরিমার্জনার পরেও অনুভব করতে পারা যায়। মূলে কি ছিলো জানি না, তবে সংগ্রাহক 'চন্দ্রকুমার দে পালাটিকে মোট তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে রাবণের দিক হইতে কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে রাবণের স্বর্গমর্ত্যাদি অভিযান এবং রামের জন্ম, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সীতার বারমাসী এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে সীতার বনবাসের পূর্ব সূচনায় আখ্যান খণ্ডিত হইয়াছে। অনুমান, পালাটিতে সীতার পাতাল প্রবেশ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছিল। স্ত্রী-সমাজে প্রচলিত এই মেয়েলি ছড়াটিতে ধারা-বাহিক কোন কাহিনী নাই, দুই-একটি ঘটনা অবলম্বনে পালার পৃথক পৃথক পর্ব বিন্যস্ত হইয়াছে'। এখানে নারী-কবির চোখে দেখা নারী জীবনের একটি ছবি এই রকম: 'চারিদিকে শোভে তার গো সুগন্ধি কমল। / সুবর্ণ ভৃঙ্গার ভরা গো সরযূর জল ॥ / নানা জাতি ফল আছে গো সুগন্ধে বসিয়া। / যাহা চায় তাহা দেয় গো সখীরা আনিয়া ॥ ঘন ঘন হাই উঠে গো নয়ন চঞ্চল। / অল্প অবশ অঙ্গ গো মুখে উঠে জল ॥'

কবি চন্দ্রাবতী রচিত 'দস্যু কেনারামের পালা' নামে একটি পালায় তাঁর পিতা এক দস্যুকে মনসার ভাসান শুনিয়ে কিভাবে তাঁর শিষ্যে পরিণত করেছিলেন তার বর্ণনা আছে। এই পালায় 'দ্বিজবংশী সুতা' ভণিতা থেকে মনে করা হয় যে এটিও চন্দ্রাবতীর রচনা।

৩৭. **বলরাম দাস:** গবেষকদের মতে দুই, পাঁচ এমন কি উনিশ জন কবি 'বলরাম দাস'—এই নামে পরিচিত হয়েছেন। যাই হোক, আমরা সেই বলরাম দাস সম্বন্ধে আলোচনা করবো যিনি নিত্যানন্দের ভক্ত এবং তাঁর পত্নী জাহ্নবা দেবীর শিষ্য ছিলেন। ইনি সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দোগাছিয়া গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কবি বালগোপালের উপাসক ছিলেন।

কবি বলরাম দাস বাঙলা এবং ব্রজবুলি এই উভয় ভাষাতেই তাঁর পদ রচনা করেছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে নিত্যানন্দ-বিষয়ে এবং অন্যের মুখ থেকে শুনে 'কল্পনায় অনুমানে' চৈতন্যলীলা-কীর্তন প্রচার করেছেন। তাঁর নামে প্রচলিত অসংখ্য পদের মধ্যে নির্ভেজাল বলরামের নামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মতো শ খানেক পদ আছে; যা, সহজ কবিত্ব এবং সরল আন্তরিকতায় পূর্ণ। এদের আমরা খুব সহজেই বৈষ্ণব পদশাখার প্রথম শ্রেণীর পদাবলীর পাশে আসন দিতে পারি। আসলে কবি বলরাম দাস ছিলেন একজন প্রকৃত ভক্ত, তাই অন্তরের আত্যন্তিক ভক্তির আবেগে

তাঁর লেখনী-মুখ থেকে আশ্চর্য সুন্দর কবিতাগুলি জন্ম লাভ করতো—এক একটি ফুলের ফুটে ওঠার মতো। এই ভাব-নবনীত পেলবতা তাঁর কবিতাদেহের স্বাভাবিক গঠনের উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। আমরা এখানে কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা সম্পর্কে রচিত একটি পদের উদ্ধৃতি দিয়ে, 'প্রচলিত পরিচিত শব্দবন্ধে হৃদয়কে ব্যাকুল' করে তুলতে, কবির আশ্চর্য শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবো :

'শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতি দূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে ॥···
নিকটে গোধন রাখ্য মা বল্যা শিঙ্গায় ডাক্য
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈল গোপ জাতি গোধন পালন বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাই যাদব ॥

এখানে প্রতিটি শব্দে মা-যশোদার ভয়-কাতর বাৎসল্য সহজ ভাষাকে অবলম্বন করে যেন আপনিই ঝড়ে পড়ছে—সদ্য সন্তানবতীর বক্ষ পীযূষধারার মতো।

৩৮ নরহরি [দাস] সরকার : বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডের এক বিশিষ্ট বৈদ্যবংশে নরহরির জন্ম হয়। এঁর পিতার নাম নারায়ণ। যতদূর জানা যায়, তাতে বলা যায় যে নরহরি [দাস] সরকার চৈতন্যদেবের থেকে বয়সে দু-চার বছরের বড় ছিলেন ; এই সূত্রে কেউ কেউ মনে করেন যে তাঁর জীবৎকালের বিস্তার ১৪৭৮-১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ইনি চৈতন্যদেবের একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু কি আশ্চর্য, কোন প্রাচীন এবং প্রামাণিক চৈতন্যজীবনীতে নরহরি-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নি। এমনকি যে বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর প্রভাব-উষ্ণতায় তাঁর কাব্য ['চৈতন্যভাগবত'] রচনা করেন, তিনিও চৈতন্যের অপর বিশিষ্ট পার্শ্বচর নরহরি ছাড়া প্রায় সকলের উল্লেখ করেছেন। আগেই বলেছি যে, নরহরি ছিলেন চৈতন্যের সমসাময়িক নবদ্বীপের টোলের একজন ছাত্র, চৈতন্যানুরাগী এবং রাধার অবতার রূপে শ্রদ্ধেয় গদাধরের বন্ধু, তথাপি নরহরি প্রতিষ্ঠিত ও নৈষ্ঠীক বৈষ্ণবগোষ্ঠীর দ্বারা সবাপেক্ষা কম পৃষ্ঠপোষিত হয়েছিলেন। ফলে, গৌরগুণানন্দ ঠাকুরের 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' গ্রন্থে বা দু-চারটি বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়ক বই ও পদ ছাড়া অন্যত্র তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে কম আলোচনা হয়েছে।

কিন্তু এতসব সত্ত্বেও নরহরি এবং তাঁর শ্রীখণ্ডগোষ্ঠী এমন কতকগুলি কাজ করেছিলেন যা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে কিছু অভিনবত্ব সৃষ্টি এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মচিন্তায় কিছু নতুন মাত্রা যোগ করেছিলো। যেমন : ক. নরহরিই প্রথম চৈতন্যদেবেকে শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে পূজা ও প্রচার করেন। শ্রীখণ্ডে গৌর এবং নিতাই-এর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে গৌরাঙ্গ পূজার প্রবর্তন করেন। এই গোষ্ঠী গোপালমন্ত্রের

বদলে গৌরমন্ত্র দিয়ে শিষ্য করার রীতি চালু করেন। খ. গৌরাঙ্গকে নাগর এবং নিজেদের নাগরী রূপে কল্পনা করে নিয়ে গৌরাঙ্গ ভজনা—যা 'গৌরনাগরী' সাধনা নামে পরিচিত, তার উদ্গাতা হচ্ছেন নরহরি। এবং তিনি নিজে এই ভাবে ভাবিত হয়ে কিছু পদও রচনা করেছেন। গ. তিনি [নরহরি] চৈতন্যলীলা প্রকাশের কারণ এবং তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের প্রতি ভক্ত ও দার্শনিকদের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন যে গৌরাঙ্গই কৃষ্ণ এবং গৌরাঙ্গ প্রকট না হলে 'রাধার মহিমা/প্রেমরসীমা/জগতে জানাত কে'? এই মতবাদ স্বরূপ-দামোদর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের দার্শনিক অনুধ্যানের পূর্বগামী। ঘ. চৈতন্যকে পরমতত্ত্বরূপে প্রচারের দায়িত্বও মূলত এঁরই। ঙ. পরবর্তীকালে বৈষ্ণবদের মধ্যে যে নীতিস্খলন দেখা দেয় তার বীজও উপ্ত হয়েছিলো নরহরির 'গৌরনাগরী ভাবে'র মধ্যে দিয়েই।

সে সব যাই হোক, সু-সহজ বাঙলায়, প্রাণের আবেগে গৌরপদাবলী এবং চৈতন্যদেবের নাগর ভাবের পদ তাঁকে সুকবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এখানে নরহরির রচনা ও কৃষ্ণভাবে ভাবিত গৌরবিষয়ক একটি পদ উদ্ধৃত হলো: 'গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে।/ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে॥/সুরধনি দেখি পহু যমুনার ভানে /ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে॥/পুরুষ আবেশেতে ত্রিভঙ্গ হৈয়া রহে/পীত বসন আর যে মুরলী চাহে॥/প্রিয় গদাধর ধরিয়া নিজ কোলে।/কোথা ছিলা, কোথা ছিলা গদগদ বোলে॥/ভাব বুঝি পণ্ডিত রহয়ে বাম পাশে॥/না বুঝয়ে এই রস নরহরি দাসে॥'

'পদকল্পতরু', 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', গৌরপদতরঙ্গিনী' প্রভৃতি বৈষ্ণবপদ-সংকলন গ্রন্থগুলিতে নরহরির বেশ কিছু পদকে সংলিত হতে দেখা যায়।

৩৯. কবীন্দ্র পরমেশ্বর: মহাভারতের আদি অনুবাদকগণের মধ্যে কবীন্দ্র-উপাধি প্রাপ্ত পরমেশ্বর একজন বিশিষ্ট কবি-ব্যক্তিত্ব। এখনও পর্যন্ত যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তাতে তাঁকেই মহাভারতের আদি অনুবাদক হিসেবে গ্রহণ করতে হয়।

হুসেন শাহের বঙ্গদেশ শাসনকালে [১৪৯৩-১৫১৯] তাঁর সেনাপতি লস্কর পরাগল খান চট্টগ্রাম আক্রমণ করে জয়ী এবং সুলতানের নির্দেশে সেখানকার শাসন কর্তা নিযুক্ত হন। ইনি ছিলেন একজন বিদ্যোৎসাহী ও কলারসিক। এঁর সভায় অন্যান্যদের সঙ্গে পরমেশ্বর নামক এক কবিও ছিলেন। বীর সেনাপতি মহাভারতের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী শুনতে ভালবাসতেন। কিন্তু এই রসপিপাসা নিবৃত্তির প্রধান বাধা সংস্কৃত ভাষা। তাই তিনি তাঁর সভাকবি পরমেশ্বরকে অনুরোধ করেন মহাভারতকে সংস্কৃত থেকে বাঙলা ভাষায় রূপান্তরিত করতে; এবং তা এমন ভাবে, যাতে তিনি একদিনের মধ্যেই সমগ্র কাব্যটি শুনে উঠতে পারেন ['এইসব কথা কহ সংক্ষেপে করিয়া।/দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালী রচিয়া॥']। পরমেশ্বর অচিরেই এই কাজ করেছিলেন এবং তাঁর পারঙ্গমতায় মুগ্ধ হয়ে কবির পৃষ্ঠপোষক শাসনকর্তা সম্ভবত তাঁকে 'কবীন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। পরমেশ্বর পরাগলের অনুপ্রেরণায় মহাভারত

অনুবাদ করেছিলেন বলে এটি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'পরাগলি মহাভারত' নামে পরিচিত। কবি তাঁর কাব্যের নামকরণ করেছিলেন 'পাণ্ডববিজয়'।

এক সময়ে মনে করা হয়েছিলো যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী একই ব্যক্তি; কবীন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা না থাকাই তার প্রধান কারণ। ইদানীং অবশ্য প্রমাণিত হয়েছে যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর একজন পৃথক ব্যক্তিত্ব এবং তিনি চট্টগ্রামের লোক। ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের কিছু পরে ও ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই তাঁর কাব্য রচিত হয় বলে মনে করা যেতে পারে।

শাসনকর্তা এবং পৃষ্ঠপোষকের নির্দেশ মেনে চলতে গিয়ে কবীন্দ্র বিরাট মহাভারত-কাহিনীকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছিলেন। বিজাতীয় ও অন্যভাষী লস্করের আকর্ষণীয় হবে ভেবে তিনি মহাভারতের বর্ণনা, ব্যাখ্যানাদি, বিতর্কসমূহ বাদ দিয়ে কেবল কাহিনী-সারটুকুই অনুবাদ করে গেছেন। এতে কাব্য-কায়া-গঠন-বিষয়ে কবির কুশলতার প্রমাণ মিললেও রচনাটি বিবরণধর্মী হয়ে পড়েছে।

এ-ছাড়াও তিনি আরও কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন: ১। ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সহজ-সরল ভাষা ব্যবহার; ২। মূলকে দৃঢ় ভাবে অনুসরণ করবার জন্যেই কল্পনার বা পল্লবিত বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ না করা; ৩। মুসলমান প্রশাসকের মনোরঞ্জনের জন্যে রচিত হলেও কাব্যভাষায় আরবী-ফার্সীর বিরল ব্যবহার, অন্যথায় তৎসম শব্দ প্রয়োগের প্রাচুর্য। ৪। রাজসভার অনুরোধ সত্ত্বেও, রাজসভার কবি হয়েও উৎকট প্রসাধন বা নাগরিক বিলাসের আশ্রয় না নেওয়া। ৫। সারানুবাদে মূলের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন করেও কাব্যগুণকে প্রাধান্য দিতে দ্বিধা-হীনতা। যেমন: 'জেন দুই অগ্নি আসি একত্রে মিলিল।/ভীম ধনঞ্জয় দুই মিশিমিশি হৈল।' অথবা, 'অগ্নি জেন বন দহে নিদাঘ সময়।/ অর্জুনএ ভীষ্ম বীরে সৈন্য করে ক্ষয়॥'—ইত্যাদি অলঙ্কার মণ্ডিত কাব্যপংক্তি কবির কাব্যকে সুখপাঠ্য করেছে।

৪০। **'দোহাকোষ'**: বাঙলা সাহিত্যের আদিযুগের ভূমিকা স্বরূপ এক ধরণের ছোট ছোট কবিতার বিষয়ে কিছু উল্লেখ করতে হয়। এগুলি সাধারণ ভাবে 'দোহাকোষ' নামে পরিচিত। এগুলি প্রধানত সাত থেকে বারো শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিলো। এদের ভাষা হচ্ছে শৌরসেনী অপভ্রংশ; যা আরও কিছু বিবর্তিত হয়ে হয় অবহট্‌ঠ; যেমন, বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা' রচিত হয়েছে শৌরসেনী অবহট্‌ঠ-এ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত দোহাকোষ পঞ্জিকা, সরোরুহবজ্রের দোহাকোষ, কৃষ্ণাচার্যের দোহাকোষ, ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচির সংগৃহীত তিল্লোপাদ ও সরহপাদের দোহাকোষ আমাদের বাঙলা সাহিত্যের আদিযুগের ভূমিকা রচনায় প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করেছে। যদিও এই শৌরসেনী অপভ্রংশের সঙ্গে বাঙলার ভাষা-বংশগত কোন যোগ নেই, তবুও এই দোহাগুলির রচনাকারদের অনেকেই জন্ম সূত্রে ছিলেন বাঙালী, তাই এই দোহাগুলির মধ্যে দিয়ে বাঙালীর জীবন-চর্যার বেশ

কিছু অন্তরঙ্গ ছবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; অধিকন্তু এর মধ্যে বাঙলার নিজস্ব ধর্মমতও ধৃত আছে। তাই এগুলি আমাদের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-প্রসঙ্গে আলোচ্য।

তিল্লোপাদ, সরহপাদ ও কাহ্নপাদ উক্ত দোহাগুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি। এঁদের ঐ সব দোহাগুলিতে সেই সময়ের—যখন বৌদ্ধ-বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ্য শৈবতত্ত্ব ও নাথপন্থা ইত্যাদির আবরণে প্রচ্ছন্ন ভাবে আত্মরক্ষা করছিলো,—বজ্রযান, সহজযান মতাবলম্বী তান্ত্রিক বৌদ্ধদের সাধন-ভজন, আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে কখনও স্পষ্ট, কখনও বা অস্পষ্ট ভাবে আচরণীয় কৃত্যাদির পরিচয় ধৃত হয়েছে। যা আবিষ্কৃত হযেছে,—নাম জানা ও অজানা সব দোহা রচয়িতাই একটি সাধারণ মঞ্চ থেকে, একই দৃঢ় বিশ্বাসে, ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ দু-ধরণের জীবন-বিবিক্ত পুঁথি আশ্রয়ী আচার-বিচারীদের প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ করেছেন। তাঁরা যে সহজসিদ্ধির নির্দিষ্ট সন্ধানী তা মন্ত্রতন্ত্র স্নান-উপবাস প্রভৃতির ভিতরে পাওয়া যাবে না, এই কথা তীব্র ব্যঙ্গের মাধ্যমে তাঁরা বলেছেন। এ-প্রসঙ্গে তাঁদের ভাষা তীক্ষ্ণ ও ঋজু, কোথাও কোথাও কৌতুক-কটাক্ষে স্বাদু! যেমন: 'আগম বেঅ পুরাণে পংডিও মান বহংতি।/পক্ক সিরিফল অলিঅ জিম বাহেরিত ভূময়ন্তি॥'

[অর্থ: আগম-বেদ-পুরাণ পড়ে পণ্ডিত মান বহন করে, পাকা বেলের চারিদিকে যেমন অলি বৃথা ঘুরে বেড়ায়]।

অথবা, 'দেব ন পুজহ তিত্থ ন জাবা।/দেব পুজাহি ন মোকখ পাবা॥'

[অর্থ: দেবপূজা কোরো না, তীর্থে যেয়ো না, (কারণ) দেবপূজায় মোক্ষ পাবে না]

'দোহাকোষ'গুলিতে ধৃত উচ্চ:কোটির ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে এই ভাবে আক্রমণ করার কারণে, তাদের সাধন-ভজন, ধর্মমত ও মানসিক পরিবেশ চর্যাপদেরই সদৃশ হওয়ার ফলে, অধিকন্তু এই দোহাগুলির অধিকাংশই বাঙালীর রচনা হওয়ায় এরা বঙ্গভাষা ও তার সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

৪১ **'প্রেমবিলাস'**: বলরাম দাস ওরফে নিত্যানন্দ দাস এই 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থটি রচনা করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রায় উনিশ জনের মতো বলরাম দাসের নাম পাওয়া গেছে। সেই ভীড়ের বলরামগণের মধ্যে থেকে আমাদের 'প্রেমবিলাসে'র বলরামকে খুঁজে পাওয়া কিছু কঠিন হলেও, এক দিক থেকে সহজ হয়েছে এই কারণে যে ইনি বিখ্যাত বৈষ্ণবগুরু অবধূত নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবাদেবীর শিষ্য ছিলেন এবং তাঁরই আদেশে সন্ন্যাস-জীবনে নিত্যানন্দ দাস নাম গ্রহণ করেন। ইনি দু-দশটি বৈষ্ণব পদ রচনা করে থাকলেও 'প্রেমবিলাস'ই এঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি।

এই বলরাম বা নিত্যানন্দ দাস বর্ধমানের শ্রীখণ্ডের অধিবাসী। কবির পিতার নাম আত্মারাম এবং মাতার নাম সৌদামিনী। কবি অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হন। এবং যেহেতু তিনি জাহ্নবাদেবীর শিষ্য ছিলেন সেহেতু এঁকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের লোক হিসাবে গ্রহণ করতে পারা যায়। এবং মনে করা হয় যে বইটি ১৬০০ বা

১৬০১ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে লেখা হয়েছিলো। আগেই বলেছি যে এই 'প্রেমবিলাস'-এর কবির সংসার জীবনের নাম ছিলো বলরাম দাস; কিন্তু কবি তাঁর গ্রন্থের কোথাও এই নাম ব্যবহার করেন নি, সর্বত্রই গুরুপ্রদত্ত নাম নিত্যানন্দই ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থটি আকারে বেশ বৃহৎ, এবং প্রতিটি পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন 'বিলাস' নামে। এই নিবন্ধ-কাব্যের যেমন কয়েকটি পুঁথি, তেমনি দু-তিনটি মুদ্রিত গ্রন্থও পাওয়া গেছে। এই 'প্রেমবিলাস' বৈষ্ণব-সমাজের সামাজিক ইতিহাস হিসেবে বিশেষ মাননীয়, কারণ 'কর্ণানন্দে', 'ভক্তিরত্নাকরে' এই কাব্যটির উল্লেখ পাওয়া যায়। নইলে অনেক গবেষকই একে জাল বলে বাতিল করার চেষ্টায় ছিলেন।

'প্রেমবিলাস' বৈষ্ণব-ইতিহাস ও সমাজবিষয়ক গ্রন্থ, তাই এতে চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত মহাপ্রভু, তাঁদের যোগ্য ও মাননীয় উত্তরাধিকারী শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ, জাহ্নবাদেবী এবং বীরভদ্রের জীবনের নানা কাহিনী ঘটনা, ভাবানুভূতি প্রভৃতি কোথাও বিস্তৃত, কোথাও বা কৌতূহলোদ্দীপক ভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, বিষ্ণুপুরের বীরহাম্বীর কর্তৃক বৈষ্ণবগ্রন্থপূর্ণ পেটিকা অপহরণের পর কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ-এর মৃত্যু-বিষয়ে কিছু সংবাদ আছে, মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যের শ্রীরঙ্গমে বসবাস সম্পর্কেও কিছু তথ্য আছে, শ্রীনিবাস আচার্যের জীবন ও নীতিকথা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এমন কি, তৎকালের শাসক-সম্প্রদায়ের আচার-অনাচার সম্বন্ধেও এতে অনেক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এই সব কারণেই 'প্রেমবিলাস' ঐতিহাসিকগণের কাছে বিশেষভাবে আদৃত হয়েছে।

৪২. **'রামরসায়ন'**ঃ এই সুবৃহৎ রামায়ণ কাব্যখানির লেখক হচ্ছেন রঘুনন্দন গোস্বামী। এঁর নিবাস বর্ধমান জেলার মানকরের কাছে মাড়ো গ্রামে। কবির পিতাও একজন পণ্ডিত ও ভক্ত মানুষ ছিলেন, নাম, কিশোরীমোহন, মাতার নাম উমা এবং মধুমতী ছিলো তাঁর বিমাতার নাম। ইনি আপন মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত বংশীমোহনের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাই গ্রন্থের প্রতি পরিচ্ছেদের শেষেই তিনি সশ্রদ্ধায় গুরুর নাম উল্লেখ করেছেন। যতদূর মনে হয় যে রঘুনন্দনের এই রামায়ণ কাব্যটি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দু-এক দশকের মধ্যেই রচিত হয়েছিলো [আনুমানিক ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দ]।

আকারে বৃহৎ এই রামচরিত কাব্যটি ঊনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ রচয়িতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এত বড় গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও কবি এর গঠন ও ছন্দোপারিপাট্যে কোন ত্রুটি রাখেন নি। পুরাতন যুগের চিন্তা জগতে, জীবনাচরণে, সমাজ-ব্যবস্থায় যখন আমূল পরিবর্তনের মহাযজ্ঞ আরম্ভ হয়ে গেছে সেই সময়ে এই ধরণের বিষয় অবলম্বনে কাব্য রচনা এক হিসাবে দুঃসাহসিকই বলা যায়। কবি এই এই সাহসিক কর্মে বেশ সহজেই পারদর্শিতা দেখাতে পেরেছেন। কবি তাঁর রামায়ণের বিরাট কলেবরে পূর্ববর্তী প্রায় সব কবিরই কাব্য-বস্তুকে ধারণ করেছেন। ফলে কাব্যখানি সাতটি কাণ্ড এবং বহু পরিচ্ছেদ-উপচ্ছেদে বিভক্ত হয়েছে। এই কাব্যের সবচেয়ে অভিনব অংশ 'উত্তরাকাণ্ড'টি

—কবির এটি যেন এক নতুন সৃষ্টি। "গতানুগতিক সীতার পাতাল প্রবেশ এই অংশে বর্ণিতই হয় নি। বিভিন্ন পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে বৈচিত্র্য এবং চমৎকারিত্ব সৃষ্টির চেষ্টা এই কাব্যের সর্বত্র প্রস্ফুট।...বস্তুত, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই বাঙলা অনুবাদ কাব্যে বাঙালীর জীবনানুসরণের চেয়ে ভাব-ভাষা-ছন্দে-কাহিনীতে সংস্কৃত পুরাণ অনুসরণের যে প্রবণতা ক্রমেই স্ফুটতর হয়েছিলো তারই অত্যুৎকৃষ্ট বিকাশ 'রামরসায়ন'।" প্রাচীন [পয়ার] ধারায় লেখা এই বইটি পড়তে ভালোই লাগে।

৪৩ **'গৌড়ীরীতি'** : পুরাতন ভারতীয় সাহিত্যে গৌড় বা বঙ্গদেশের উল্লেখ নানা প্রসঙ্গে সুপ্রচুর। এর মধ্যে বাঙালীর সাহিত্য-চর্চার বিষয়বস্তু এবং তার রীতি-প্রকরণে নিজস্ব দেশীয় বিশিষ্টতার জন্যে স্বতন্ত্রভাবে তার নাম মর্যাদার সঙ্গেই আলোচিত হয়েছে। গৌড়ের এই সাহিত্যিক style-ই 'গৌড়ীরীতি' নামে পুরাতন ভারতীয় সাহিত্যে পরিচিত হয়েছে। এ-বিষয়ে 'বাঙালীর ইতিহাস'-কার ড. নীহাররঞ্জন রায় যে বিশ্লেষণ করেছেন তা উদ্ধৃত করলে বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা হবে বলে মনে করি। তিনি বলেছেন : "সপ্তম-অষ্টম শতকে গৌড়বঙ্গে যে একটি বিশেষ কাব্যরচনা-রীতির প্রবর্তনা হইয়াছিল এবং সমস্ত ভারতবর্ষে সেই রীতি সুপরিচিত স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার নাম গৌড়ীরীতি। আলঙ্কারিক ভামহ ও দণ্ডী [সপ্তম-অষ্টম শতক] দুই জনই গৌড়ীরীতি বা গৌড়মার্গের কথা বলিতেছেন। দণ্ডীর মতে মানদণ্ডের বিচারে গৌড়ীরীতি 'বিপর্যয়' লক্ষণাক্রান্ত, তাহার রূপ পৃথক, রীতি পৃথক, কিন্তু এই পৃথক রূপ ও রীতি সহজেই 'প্রস্ফুট'।...গৌড়ী একটু অলঙ্কার ও আড়ম্বর বহুল, পল্লবিত। দণ্ডী পরিষ্কারই বলিতেছেন, গৌড়জনেরা অতি ও উচ্চকথন এবং অলঙ্কার ও আড়ম্বর প্রিয়; গৌড়ীরীতির প্রধান লক্ষণই হইতেছে 'অর্থ-ডম্বর' এবং 'অলঙ্কার-ডম্বর', অনুপ্রাসপ্রিয়তা এবং বন্ধগৌরব বা রচনার গাঢ়তা।"

"বাণভট্ট, ভামহ এবং দণ্ডীর সাক্ষ্যে এ-তথ্য পরিষ্কার যে, গৌড়জনেরা সপ্তম শতকের আগেই সুস্পষ্ট লক্ষণাক্রান্ত একটি বিশিষ্ট কাব্যরীতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং এই রীতি সর্বভারত-গ্রাহ্য বৈদর্ভী রীতিমানের পাশেই আপন আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।...এই গৌড়ীরীতির উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস প্রাচীন বাঙলার সংস্কৃতির ইতিহাসের দিক হইতে গভীর অর্থবহ। ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি হইতেই গৌড় ধীরে ধীরে নিজস্ব জনপদকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে যত্নবান হয়, শশাঙ্কে আসিয়া তাহা একটু সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে।...মধ্য-ভারতীয় রাষ্ট্রীয় প্রভাব হইতে মুক্ত, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রই হইয়া উঠিল গৌড়তন্ত্রের রাষ্ট্রাদর্শ। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এই গৌড়তন্ত্র রূপলাভ করিল গৌড়ীরীতিতে—সর্ব-ভারতীয়, বৈদর্ভী রীতিকে অস্বীকার করিয়া, তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র রীতির উদ্ভবে ও বিকাশে। সন্দেহ নাই, এই উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছিল গৌড়জনের নিজস্ব প্রতিভা, প্রকৃতি, রুচি ও সংস্কার অনুযায়ী এবং ইহাদেরই প্রেরণায়, শুধু বিশিষ্ট জনপদসুলভ অহংকৃত স্বতন্ত্র-প্রিয়তা এবং স্বাধিকারপ্রমত্ততায় নয়।"

৪৪. **'গৌরচন্দ্রিকা'** ঃ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যতদিন জীবিত ছিলেন অথবা তাঁর অপ্রকটকালে বিভিন্ন বৈষ্ণব পদকর্তাগণ রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা অবলম্বন করে বহু পদ রচনা করেছিলেন। চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী কালেও রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ে কিছু উৎকৃষ্ট পদ রচিত হয়েছিল। এই সব পদগুলির মধ্যে থেকে সমরস বা একই লীলা-বিষয়ক পদগুলিকে যথাক্রমে সাজিয়ে নিয়ে কীর্তনীয়াগণ তাতে বিভিন্ন তাল-রাগ ও রাগিণী যুক্ত করে গান করতেন বা আজও করে থাকেন, তাকেই পালাবদ্ধ রসকীর্তন বলা হয়। এই ধরণের পালাকীর্তন সূচনার পূর্বে কীর্তনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উক্ত পালার রসোদ্বোধক যে গৌরপদ গান করা হয় তাকেই **'গৌরচন্দ্রিকা'** বলে ['গৌরচন্দ্র কীর্তনের প্রবর্তক, এই হেতু কীর্তন গায়কেরা কীর্তনের প্রারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা গান করে থাকেন']। মধুর বৃন্দাবনের কুঞ্জ-কাননে রাধাকৃষ্ণের প্রেম লীলার যে মাধুর্য-রস ক্ষরিত হয়েছিলো সেই অপ্রাকৃত ভাববৃন্দাবনের ভেতরে 'প্রবেশ চাতুরী সার' হলো শ্রীগৌরাঙ্গের রাধা-কৃষ্ণ প্রেম। অর্থাৎ গৌরচন্দ্রিকাগুলি হলো বৃন্দাবনের লীলারসলোকে প্রবেশের চাবিকাঠি [with this key they unlocked their heart (উদ্ধৃতিটিকে একটু পরিবর্তিত করে নিয়ে)]। সে কারণেই রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কীর্তনে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে এই গৌরচন্দ্রিকাগুলিকে গান করে নিতে হয়।

চৈতন্যদেব তাঁর সাধনা ও আচরণ-চেষ্টাদির মহামহিমতায় শ্রীরাধার সঙ্গে তত্ত্বদৃষ্টিতে একদেহীভূত হযে গেছেন,—'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণরূপ'। পরবর্তী যুগে চৈতন্য-প্রকটকালের শেষ অবস্থায় এবং তার পরেও চৈতন্যদেব যেন প্রেমোন্মাদিনী শ্রীরাধিকার প্রতিমূর্তি হযে গেলেন—'আমার গোরা ভাবের রাধারাণী'। এই ভাব বাঙলা সাহিত্যে একদিকে যেমন শ্রীরাধাকে চৈতন্যদেবের ভাবরূপে একটি নতুন মূর্তিতে উপস্থিত করলো, অন্যদিকে তেমনি চৈতন্যদেবও তাঁর সকল প্রেম-বিরহ-কৃষ্ণার্তি নিয়ে রাধার অনুরূপ ভাবেই চিত্রিত হতে লাগলেন। ফলে, গৌড়ীয় ভক্তগণের কাছে রাধার অপ্রাকৃত কৃষ্ণ প্রেমের ব্যাখ্যারূপ হিসেবে গণ্য হলো শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন। একথা ঠিকই যে সাধারণ মাপের মানুষের পক্ষে অলৌকিক রাধাপ্রেমের তত্ত্বচিন্তাকে বোঝা বা উপলব্ধি করা কঠিন; তাই মনে করা হলো যে মহাপ্রভুর জীবনাচরণের মধ্যে ঐ তত্ত্বচিন্তা প্রেমের-দার্শনিকতা বিষয়ীকৃত হয়েছে। ফলে, গৌরকে আশ্রয় করলেই বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত প্রেমকুঞ্জবনে প্রবেশের পথ পাওয়া যাবে। তাই চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিগণ মহাপ্রভুর রাধাভাবে ভাবিত প্রেমমূর্তিকে অবলম্বন করে বহু পদ রচনা করেছিলেন। এই পদগুলিই রাধাকৃষ্ণ কীর্তন আরম্ভের পূর্বে **গৌরচন্দ্রিকা** হিসেবে গান করা হয়। প্রসঙ্গত বলা যে, রাধাভাবে ভাবিত যেমন গৌরপদ আছে, তেমনি কৃষ্ণভাবে ভাবিত কিছু গৌরপদও আছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তগণের বিশ্বাস স্বরূপ দামোদর ব্যাখ্যা করে বলেছেন: 'শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, আমার যে মাধুর্য শ্রীরাধাকে মুগ্ধ করে, সেই মাধুর্য কিরূপ, আর সেই মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রীরাধা যে আনন্দ লাভ করেন, সেই আনন্দই বা কিরূপ,

এই তিন বাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।' রাধিকার এই শুভ্র ভাব-কান্তি বা দেহ গৌরচন্দ্র লাভ করেছিলেন বলেই, তিনি হলেন 'অন্তঃ কৃষ্ণ, বহিঃ গৌর।'

অতএব আমরা বুঝতে পারলাম যে বৃন্দাবনলীলার প্রতিরূপে যে সব গৌরবিষয়ক পদ পালাবদ্ধ রস-কীর্তনের প্রারম্ভে গীত হয় এবং যা শোনা মাত্রই ভক্ত-শ্রোতা বুঝতে পারেন যে আজ আসরে কোন পর্যায়ের পালা পরিবেষণ করা হবে, সেই পদই হচ্ছে গৌরচন্দ্রিকা। যেমন : 'আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপ চন্দ। / করতলে বয়ান করই অবলম্ব ॥ / পুন পুন গতাগতি করু ঘরপন্থ। / খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত ॥' —এই পদটি আসরে গাওয়া মাত্রই শ্রোতার মানস চক্ষুতে রাধার পূর্বরাগজনিত চিন্তা-ঔৎসুক্য ও উদ্বেগ জড়িত অবস্থাটি ফুটে ওঠে ; অর্থাৎ এখানে নবদ্বীপচন্দ্র গৌরাঙ্গদেব ও শ্রীরাধিকায় কোনো পার্থক্য নেই—এটিকে পূর্বরাগের গৌরচন্দ্রিকা বলা যায়। "গৌরাঙ্গের মধ্যে রাধার পূর্বরাগের ব্যঞ্জনাময়ী এই গৌরচন্দ্রিকার 'আখর' দিতে দিতে কীর্তনীয়াগণ অবলীলাক্রমে বৃন্দাবনলীলার পূর্বরাগের রস-পর্যায়ে প্রবেশ করেন : 'ঘরের বাহিরে / দণ্ডে শতবার / তিলে তিলে আসে যায়। / মন উচাটন / নিশ্বাস সঘন / কদম্ব-কাননে চায় ॥'

এখন আমরা বুঝতে পারলাম যে কেবল রাধা বা কৃষ্ণভাবে ভাবিত বা তদ্রূপ আচরণ-চিত্র সম্বলিত গৌরপদগুলিই গৌরচন্দ্রিকা নামে পরিচিত; শুধু গৌরচন্দ্রের বিষয় উল্লেখ থাকলেই তা গৌরচন্দ্রিকা হবে না ; তা 'গৌরাঙ্গবিষয়ক' পদ হিসাবে পরিচিত হবে।

৪৫. **'গৌরচরিত্রচিন্তামণি' :** গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সাধ্য ও সাধনার মধ্যে বসেও, এই ধর্মের আচারনিষ্ঠ যতি-জীবনের মধ্যে বসবাস করেও কিছু ভক্তের সহৃদয়-হৃদয় সংবাদী মনের সাধনা বাঙলা সাহিত্যের চিত্ত-ক্ষেত্রকে সুপরিপুষ্ট করেছিলো। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বাঙালী তথা ভারতবাসীর মুনিবৃত্তি ও দর্শন-চিন্তায় কি ঐশ্বর্য দান করেছিলো তার বিচার যদি নাও করি, তবে একটা লাভের অঙ্ককে ঘরে তুলতেই হয় ; তা হচ্ছে বাঙলা সাহিত্যের সর্বদৈহিক পরিপুষ্টি। উক্ত ধর্ম-বক্তব্যের অন্তরালে বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যের এই স্বাস্থ্য-বৃদ্ধি ঘটাতে যাঁরা ধর্ম-তপস্যার পাশে পাশে সাহিত্য-সাধনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কবি-ভক্ত নরহরি চক্রবর্তী [ঘনশ্যাম দাস] অন্যতম। 'ভক্তিরত্নাকর' নামক বিখ্যাত বৈষ্ণবকোষগ্রন্থের রচয়িতা নরহরি বা ঘনশ্যাম দাস 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি' নামক এই বৈষ্ণবপদসংকলনটি রচনা করেন। [১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে হরিদাস দাস-এর একটি সম্পাদিত ও মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেন]। এতে কবি নরহরি রচিত তিন-শ একাত্তরটি পদ সংগৃহীত হয়েছে। পদগুলির সবই চৈতন্য-প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত। এখানেও কবি তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। নানা রাগ রাগিণীর নির্দেশসহ সঙ্গীতের আকারে এগুলিকে উপস্থিত করা হয়েছে।

নরহরির এই পদগুলির বেশ কিছুতে চৈতন্যদেবের 'নদীয়া নাগরী' ভাবকে আঁকার

চেষ্টা আছে। এখানে আমরা ঐ সংকলন থেকে একটি পদ উদ্ধৃত করছি : 'গৌর গোকুলচন্দ্র চলু নিজ গেহে নিশি পরভাত। / বিরলে বল্লভ স্নেহে কহি কত, কহল লখিমীকি বাত ॥ / হেরি পথ যত নারী ধৈরজ, না ধরই, ঝরই নয়ান। / লখমী সহচরী জ্ঞানে লখিমীক নাথ, করব পয়ান ॥'

এই সব পদের স্বাভাবিকতা, আন্তরিকতা ও সরল সৌন্দর্যের অনুসরণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সবদিক থেকে বৈশিষ্ট্যের লক্ষণাক্রান্ত এই সংকলনটি কোন এক অজ্ঞাত কারণে তেমন প্রচার লাভ করে নি।

৪৬. **'শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী' :** এটি একটি বৈষ্ণবপদসংকলন গ্রন্থ। একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং আজীবন বঙ্গ সাহিত্যের সেবক জগদ্বন্ধু ভদ্র [১৮৪২—?] দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সংকলন কার্য সমাপ্ত করেন। এতে মোট একশ চৌদ্দজন বৈষ্ণব কবির মোট ১৫১৭টি পদ গৃহীত হয়েছে। এই বৃহৎ সংকলন গ্রন্থটি ফরিদপুর থেকে ১২ই জুন ১৯ ২ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ভদ্র মহাশয় এই পদতরঙ্গসমূহকে মোট ছয়টি তরঙ্গে বিভক্ত করেছেন। আবার প্রত্যেকটি তরঙ্গ একাধিক উচ্ছ্বাসে বিভক্ত।

এই গ্রন্থ প্রকাশের পিছনে কিছু ইতিহাস আছে। এই গ্রন্থ সংকলিত হবার পর উত্তরবঙ্গের জনৈক বৈষ্ণব-ভক্ত জমিদার সংকলনটি ছাপাবার জন্যে অর্থ সাহায্য করতে চান, কিন্তু সংকলনের পাণ্ডুলিপি যখন তাঁর হাতে পৌছালো তখন তিনি নানা অছিলায় আর ব্যয়ভার গ্রহণ করতে রাজী হলেন না, এবং মাত্র এক-পঞ্চমাংশ সাহায্য করতে চাইলেন। পরে নানা বিঘ্ন অতিক্রম করে টাকীর জমিদারের অর্থানুকূল্যে বইটি শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়। এই সংকলন সম্বন্ধে ভদ্র মহাশয় ভূমিকায় জানিয়েছেন : 'বর্তমান গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট মহাজনী পদাবলী ও পদকর্তৃদিগের বিবরণ ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য আমাদিগের বহু মুদ্রিত ও হস্তলিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।···শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলাত্মক প্রায় কিঞ্চিদূর্দ্ধ পঞ্চদশ শত প্রাচীন মহাজনী পদ, মহাপ্রভুর পরিকর ও পার্ষদ ভক্তদিগের পরিচয়, ৮০ জন পদকর্তৃগণের সংক্ষিপ্ত বা বিস্তীর্ণ জীবনী এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে এমন সকল প্রাচীন পদ আছে, যাহা হয় ত অনেক পাঠক এ পর্যন্ত দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই।' ১৩৪১ বঙ্গাব্দে মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে এই সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো।

৪৭. **মহাভারতের আদি অনুবাদকগণ :** চৈতন্যদেবের প্রেমভাববন্যার অন্যতম ফল অনুবাদ শাখায় আরো একটি পল্লবের জন্ম, সেটি মহাভারতের অনুবাদ। বাঙলায় মহাভারতের অনুবাদ কর্মের সূত্রপাত আলাউদ্দীন হুসেন শাহের রাজত্বকালের [১৪৯৩-১৫১৯] মধ্যে। মহাভারত একটি বৃহৎ মহাকাব্য ; সেই কারণে কাচর তাগিদে ও সময়ের অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার একটি বা কয়েকটি পর্বমাত্র অনূদিত হয়েছে। মহাভারতের কৃষ্ণ ভাগবতের থেকে স্বতন্ত্র। তবুও যতখানি সম্ভব তাঁর

বীর্যোদ্বুদ্ধ ভূমিকাকে ভক্তিরসে ভিজিয়ে নিয়ে মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এখানে সে সম্পর্কে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত তথ্য পরিবেশিত হবে।

ক. **কবীন্দ্র পরমেশ্বর :** এঁর প্রসঙ্গে আগেই আলোচনা হয়েছে [পৃ. ৬৩-৪ দ্রষ্টব্য]।

খ. **শ্রীকরনন্দী :** হুসেন শাহের রাজত্বকালের মধ্যেই [১৪৯৩-১৫১৯] পরাগল খান কবরস্থ হন এবং তাঁর পুত্র নসরৎ খান বা ছুটি খান পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ইনি পিতার মতো বীর ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন; দেশীয় কাব্য-সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ এবং আগ্রহ পোষণ করতেন। এবং তাঁর সভাতেও পণ্ডিত এবং বিদগ্ধজনের সমাবেশ ঘটেছিলো। তিনি তাঁর সভাকবি শ্রীকর নন্দীকে মহাভারতের অনুবাদ করতে নির্দেশ দেন। তিনি শ্রীকরকে কেবল অশ্বমেধপর্বটিকেই ভাষান্তরিত করতে বলেছিলেন। নন্দী কবি ব্যাসদেবের মূল মহাভারত ছেড়ে 'জৈমিনি ভারত' অবলম্বনে অশ্বমেধযজ্ঞ কাহিনীর অনুবাদ করেন। শ্রীকরের কাব্যে বারে বারে নানা প্রসঙ্গে হুসেন শাহের উল্লেখ থাকায় অনেকে মনে করেন যে এটি ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই রচিত হয়। তবে কোনো ক্রমেই ১৫৩২ খ্রীস্টাব্দের পরে নয়।

মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে বীরের প্রতিষ্ঠা লাভের কথা আছে, আছে রাজকীয় আড়ম্বর। স্বাভাবিক ভাবেই এই বিষয়-গৌরব বীর ছুটি-খানকে আকর্ষণ করে থাকবে। শ্রীকরের প্রতিভা ছিলো—তাই তাঁর অনুবাদ রসে-রসিকতায় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। কবি মূলের একেবারে পায়ে পায়ে না চললেও মূল কাহিনীর কাঠামোকে আঘাত করেন নি। সঙ্গে এনেছেন জৈমিনি ব্যবহৃত রঙ্গ-রসিকতাকেও। বাঁকা চোখের কৌতুক-রঙ্গ এবং রাজসভাসুলভ লঘু-চাপল্য শ্রীকরের কাব্যকে সাধারণ পাঠকের কাছে স্বাদু করে তুলেছে। একটি প্রমাণ উদ্ধার করি। কৃষ্ণ ভীমকে পেটমোটা, পেটুক বলায় ভীমের উত্তর : 'কৃষ্ণের বচনে ভীম রুষিয়া বলিল।/ মোকে মন্দ বল নিজ না দেখিল॥ / তোহ্মার উদরে কৃষ্ণ বৈসে ত্রিভুবন।/ আহ্মার উদরে কত ওদন ব্যঞ্জন॥ / তুমি স্থূলোদর নহে আমি স্থূলোদর। / বিমর্শিয়া চাহ কৃষ্ণ দেব দামোদর॥ / সংসার উপাড়িয়া সৃষ্টি খাইয়াছ তুহ্মি।/ তোহ্মা হোতে বহু ভক্ষ হইলঙ আহ্মি॥'

পরমেশ্বর ও শ্রীকর একই সভায় বসে একেবারে সমসময়ে একই বিষয়ে কাব্য রচনা করার ফলে দু-জনে দু-জনের ভনিতায় মাঝে মাঝে উলটে-পালটে বসে গেছেন।

গ. **সঞ্জয় :** সঞ্জয় নামে আর একজন মহাভারতকারের উল্লেখ করে কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন যে ইনিই বাংলা ভাষায় আদি মহাভারত-অনুবাদক। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় একথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে : "পূর্ববঙ্গের ভারত-পাঁচালী রচয়িতাদের কাব্য প্রবাহ মিলিত হয়ে তথাকথিত 'সঞ্জয়' মহাভারতের সৃষ্টি করেছে।" অনেকদিন ধরে একাধিক কবির রচনা-রসে পুষ্ট হয়ে এই বৃহৎ কাব্যপ্রবাহ 'সঞ্জয়' এই রূপক নামের আড়ালে চলে আসছে;—'সঞ্জয়' একটি যৌথ [Collective] নাম।

৪৮. **'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'** ঃ চৈতন্যপরিকর, বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম, সনাতনের অনুজ রূপগোস্বামী প্রণীত এই 'বৈষ্ণবনিবন্ধ' গ্রন্থখানি ১৫৪১ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়েছিলো বলে মনে করা হয়। সংস্কৃতে বৈষ্ণব ভক্তিরসশাস্ত্রের এই গ্রন্থ রূপের অনন্য প্রতিভার পরিচয় বহন করেছে। মোট চারটি ভাগে এবং প্রত্যেক ভাগ আবার অনেকগুলি উপ-পরিচ্ছেদ ['লহর']-এ বিভক্ত হয়ে গ্রন্থটি বিশাল আকার ধারণ করেছে। বিশেষ শ্রদ্ধা নিয়ে গ্রন্থখানি অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, 'রূপের মণীষা, ভূয়োদর্শন, মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রখর জ্ঞান, রসতত্ত্ব, ভক্তিশাস্ত্র ও কাব্যপ্রকরণে কি অসাধারণ অধিকার ছিলো।' তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করে ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব-ভাণ্ডারে এক উল্লেখযোগ্য সম্পদ সংযোজন করেছেন,—যা সেদিনের পক্ষে অনন্য মৌলিকতার পরিচয়বাহী। গ্রন্থটির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ইতিহাসকার বলেছেন : 'রূপ গোস্বামী এই বৃহদ্ গ্রন্থে বৈষ্ণব ভক্তির, বিশেষত ভক্তিকে রস বলে প্রমাণ করার জন্য যে দূরদর্শিতা, পাণ্ডিত্য, যুক্তির পরিচয় তুলে ধরেছেন তা মধ্যযুগের ভারতবর্ষের কোনও আলঙ্কারিকের মধ্যে সেই মানের প্রতিভার তুলনা মেলে না।…রসশাস্ত্র বা ভক্তিদর্শনকে নতুন করে গড়ে তুলতে গেলে এইরকম ভূয়োদর্শী সূক্ষ্ম বুদ্ধিরই প্রয়োজন হয়।… স্বভাবকে অতিক্রম না করলে শিল্পলোকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, মনোবৈজ্ঞানিকগণ এ কথাটা স্পষ্ট করে বুঝলে কাব্যে ও শিল্পে বর্ণিত রসতত্ত্বের স্বরূপ অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হতে পারে। একথা স্বীকার করতে হবে যে, রূপ গোস্বামী যদি অসাধারণ ধৈর্য ও পরিশ্রমের সঙ্গে এই বিশাল গ্রন্থটি রচনা না করতেন, তাহলে বৈষ্ণব সাহিত্যের আশ্চর্য বিকাশ ঘটতে পারতো কি না সন্দেহ।' রসময় দাস নামক জনৈক ব্যক্তি রূপের এই গ্রন্থটির কিয়দংশ বাঙলায় অনুবাদ করেছিলেন।

৪৯. **রূপগোস্বামী** ঃ চৈতন্যদেবের অন্যতম প্রিয় শিষ্যের গুরুদেব প্রদত্ত নাম। ইনি গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তখন এঁর নাম ছিলো সাকর মল্লিক ['রূপ সাকর মল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে'—চৈ চ.]। ইনি কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ ও ধনী ভূস্বামীর সন্তান। পিতার নাম কুমারদেব। রূপের অগ্রজ সনাতন ও অনুজ অনুপম [বল্লভ] ও ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে আপনাপন সাধন ও নিষ্ঠার কারণে অক্ষয়কীর্তি রেখে গিয়েছেন। চৈতন্য-সাধন-মহিমার আকর্ষণে ইনি অগ্রজসহ সমস্ত ঐশ্বর্য এবং খ্যাতি ত্যাগ করে, সন্ন্যাসী হয়ে প্রয়াগে মহাপ্রভুর শরণ নেন। 'এই স্থানে চৈতন্যদেব রূপকে দশদিন ধরিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্র শিক্ষা দিলেন এবং তাহাকে বৃন্দাবনে গিয়া ভক্তি শাস্ত্র লিখিতে আদেশ দিলেন।' তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও রসসৃষ্টিতে রূপগোস্বামী বৈষ্ণব জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন। ইনি উদ্ধব-সন্দেশ প্রভৃতি কাব্য, বিদগ্ধ-মাধব, ললিত-মাধব ইত্যাদি নাটক, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি ইত্যাদি নিবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। [এর সঙ্গে 'ষড়্‌গোস্বামী', 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-র প্রয়োজনীয় অংশ যোগ কর]।

৫০. **জগজ্জীবন ঘোষাল** ঃ অধুনা বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলার [পূর্বে

দিনাজপুর] অন্তর্গত কুচিয়ামোড় গ্রামে জগজ্জীবনের বাস ছিলো। যতদূর বোঝা যায় তাতে বলা যায় পারে যে তাঁর 'মনসামঙ্গল' কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত। উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত তাঁর পুঁথির সংখ্যা অধিক নয়। তাঁর জীবন পরিচয় তাই সুনির্দিষ্ট ভাবে সংগ্রহ করা যায় নি। কবির পিতার নাম রূপরাম চৌধুরী, মাতা রেবতী। কবির গ্রামের জমিদারের নাম প্রাণনারায়ণ।

কবি জগজ্জীবনের কাব্যের মুদ্রণ ও প্রকাশ সম্প্রতি হলেও গবেষক ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণের কাছে তাঁর পরিচয় একেবারে অজ্ঞাত ছিলো না। কবি কি দেব-চরিত্র শিব বা মনসা বা নর-চরিত্র লক্ষ্মীন্দরের রূপ অঙ্কনে এক ধরণের মানসিক বিকৃতির পরিচয় দিয়েছেন যা অনেক ক্ষেত্রে গ্রাম্য স্থূলতাকে প্রকট করেছে। কিন্তু এ-সত্ত্বেও কবি যে বিভিন্ন শাস্ত্র ও ধ্রুপদী সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন তার পরিচয় তাঁর রচনা থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। মঙ্গলকাব্যের সাধারণ ধারা অনুসরণে এতেও দেব ও বাণিয়া দুটি খণ্ড পাওয়া যায়। এই দুই খণ্ডে কবি অনেক নতুন নতুন বিষয়ের অবতারণা করেছেন। যেমন, মনসা ধর্মের স্ত্রী ও কন্যা, পরের জন্মে ধর্মপুত্র শিবের স্ত্রী নাম পরিবর্তন করে গৌরী এবং এই জন্মেই শিবের মনোবিকার থেকে বিষহরি মনসার জন্ম। নর খণ্ডে লক্ষ্মীন্দরের কামবিকারগ্রস্ত হয়ে মাতুলানীর আসঙ্গলিপ্সা কোন কোন ক্ষেত্রে রুচি ও শালীনতার মাত্রাকে অতিক্রম করে গিয়েছে। তবুও মধ্যযুগের মানসিকতার প্রেক্ষাপটে এগুলিকে ক্ষমা করে নিলে কবির ছন্দ-অলঙ্কার ও শব্দ প্রয়োগের প্রশংসা করতে অসুবিধা হয় না। অবশ্য উত্তরবঙ্গের বাক্ ও ভাষারীতির প্রভাব কবি একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি। কোন কোন সমালোচক কবিকে তন্ত্র-বিশ্বাসী বলে মনে করেন।

৫১. **শূন্যপুরাণ**ঃ মোটামুটি ভাবে তিনটি পুঁথির পাঠ সংগ্রহ করে 'বিশ্বকোষ' প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসু ১৩১৩ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে 'শূন্যপুরাণ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই নামকরণ সম্পাদকের নিজের,—কারণ কোন পুঁথিরই নাম-পৃষ্ঠাটি পাওয়া যায় নি। যেটুকু ভণিতা পাওয়া গেছে তাতে এই গ্রন্থ রামাই পণ্ডিতের রচিত বলে মনে করা হয়। পণ্ডিতগণ এর রচনাকাল সম্বন্ধে যে পরস্পর বিরোধী মতামত দিয়েছেন তাতে একে ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে যে কোন সময়ে রচিত বলে মনে হতে পারে।

'শূন্যপুরাণ' বিশেষভাবে ধর্মপূজাপদ্ধতি। গ্রন্থখানির ৫১টি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম পাঁচটি সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় এবং এই সকল সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাকি সব কয়টি অধ্যায়ই বিভিন্ন এবং বিচিত্র রকমের ধর্মপূজার পদ্ধতি বিশ্লেষণে পূর্ণ।" [বাকী অংশ 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'-র সাহায্যে লেখ]।

৫২. **সৈয়দ সুলতান**ঃ সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবিগণের মধ্যে যিনি বেশ কিছু উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব পদ রচনা করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সৈয়দ সুলতান অন্যতম। ইনি 'জ্ঞান চৈতিশা' ও হরিবংশের অনুকরণে 'নবী

বংশ' রচনা করেন। 'নবী বংশ' এঁর শ্রেষ্ঠ রচনা এবং রচনাকাল ১৬৫২ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। কবি শাহা হোসেনের শিষ্য ছিলেন এবং শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন শাহা মহম্মদকে ['গুরু শাহা হোছেন শিরেতে কত দিলা'/'... তবে শাহা মোহম্মদ সমুদ্রের তুল/একে একে মোঝে যত শিখাইলা আমূল ॥']।

কবি সৈয়দ হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিবকেও তিনি নবী বলে মেনেছেন। তাঁর সূফী মতবাদ ও যোগসাধনার সঙ্গে আধ্যাত্মিক আর্তি যুক্ত হয়ে তাঁকে যথার্থ কবিতে পরিণত করেছে। সহানুভূতি ও ভাবাবেগের যথার্থ স্ফূর্তি ঘটেছে তাঁর রচিত বৈষ্ণবপদাবলীতে :

'একবারে অনুপাম নিশি দিশি এক ঠাম
লক্ষিবারে লক্ষণ ন-যাএ।
কিবা রাত্র দিবা দিন নহে রূপ ভিন্নাভিন্ন
এ চান্দ-সুরুজ নহে তার '

৫৩. 'কবিরঞ্জন' বা 'ছোট বিদ্যাপতি' : বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড বা বৈদ্যখণ্ড-এ চৈতন্য ভাবাদর্শের যে বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিলো তার নায়ক ছিলেন মুকুন্দ-নরহরি ও রঘুনন্দন। এই রঘুনন্দনের শিষ্য রায়শেখর, যিনি 'কবিরঞ্জন' বা 'ছোট বিদ্যাপতি' রূপে পরিচিত। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদ রচনা করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। বাঙলাদেশে বাঙলায় বিদ্যাপতি ভণিতায় যে সব পদ পাওয়া গেছে তা এই রায়শেখর কবিরঞ্জনের। ইনি বিদ্যাপতির ভাব, রসনির্মিতি এমনভাবে অনুসরণ করেছিলেন যে এক-সময়ে মনে করা গিয়েছিলো 'মৈথিলী কোকিল' বিদ্যাপতি বুঝি বাঙলাতেও পদ রচনা করেছেন। এ-ছাড়া ব্রজবুলিতে ইনি বিদ্যাপতি ভণিতা দিয়ে কিছু পদ রচনা করেছিলেন, সেগুলিও মিথিলার বিদ্যাপতির ভণিতায় চালান হয়ে গিয়েছে। এই সব গণ্ডগোল দেখেই সাহিত্যের ইতিহাসকার স্বভাবতই মন্তব্য করেছেন : "সত্যকথা বলিতে কি, রায়শেখর, কবিশেখর, কবিরঞ্জন ও বিদ্যাপতির পদের গ্রন্থিমোচন খুব একটা সহজ ব্যাপার নহে এবং এ-বিষয়ে চূড়ান্ত 'রায়' দেওয়াও সম্ভব নয়। কারণ মিথিলার বিদ্যাপতি 'কবিরঞ্জন' ভণিতায় পদ লিখিতেন তাহা বৈষ্ণব সাহিত্যিক মহলে এক প্রকার স্থির হইয়াছে। আবার রঘুনন্দন-শিষ্য কবিরঞ্জনও বিদ্যাপতি নামে অভিহিত হইতেন এবং মিথিলার বিদ্যাপতির আদর্শে পদ লিখিতেন। সুতরাং বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে কবিশেখর রায়শেখর ও কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির পদেব গোলমাল হইয়া যাওয়াই সম্ভব।" এ সব দৃষ্টেই মনে করতে পারি যে এই কবিরঞ্জনের কাব্য-প্রতিভা বিশেষত্বের দাবী করতে পারে না বলেই ইনি বড় নামের খুঁটোতে কাল-পারের নাও বেঁধেছিলেন। যাই হোক, কবিরঞ্জনের ভণিতায় 'পদকল্পতরু'তে কিছু পদ সংকলিত হয়েছিলো।

৫৪. 'পদকল্পতরু' : অষ্টাদশ শতাব্দে পৌছে বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় ভাঁটার টান ধরলো। কিন্তু এই ভাব-দৈন্যের অন্ধকারে আশার সবচেয়ে তীব্র আলো পড়েছিলো

পদ-সংকলন গ্রন্থনের দিক থেকে। এই যুগেই অনেকগুলি বড় বড় 'পদসংগ্রহ' গ্রন্থে সংকলিত হয়ে অসংখ্য বৈষ্ণব-পদ ও পদকর্তার পরিচয় অবধারিত অবলোপের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। বৈষ্ণব মহাজনেরা অশক্ত প্রতিভা নিয়ে নতুন পদ সৃষ্টির অসম প্রতিযোগিতায় না অবতীর্ণ হয়ে পদ সংরক্ষণের যে কর্তব্য তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাতে তাঁদের দূরদৃষ্টির প্রশংসা না করে পারা যায় না। এবং এই কাজে এক উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন 'বৈষ্ণবদাস' উপাধিক গোকুলানন্দ সেন। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার টেঞা-বৈদ্যপুর গ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি স্বগ্রাম নিবাসী 'দ্বিজ হরিদাসে'র বংশধর জনৈক রাধামোহনের শিষ্য ছিলেন। এই সংকলনে ১৪০ জন কবির রচিত তিন হাজারেরও বেশি পদ সংগৃহীত হয়েছে। চারটি শাখা এবং প্রত্যেক শাখা আবার কয়েকটি পল্লব বা অধ্যায়ে বিভক্ত। কবি বৈষ্ণবীয় সংযম রক্ষা করে নিজের মাত্র গোটা বিশেক পদ এতে গ্রহণ করেছেন।

পদকল্পতরু বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন গ্রন্থ একথা বললে খুব বেশি ভুল হয় না। সংগ্রাহক নিজে একজন কুশলী কীর্তন গায়ক হয়েই বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন কিভাবে পদ সংকলন করা উচিত। তাই নিজস্ব টীকা-টিপ্পনী যোগ না করে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের প্রবেশক শ্লোকের যে ক্রম তৈরি করেছেন তাতে এ পরবর্তী কীর্তনীয়া ও সাহিত্য রসাস্বাদনকারীর কাছে বিশেষ উপাদেয় রূপে মান্য হয়েছে। অনেকে এটিকে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের একটি উজ্জ্বল উপক্রমণিকা হিসেবে গ্রহণ করে বলেছেন : 'This work can be said to be the most representative and exhustive' anthology of Vaisnava Lyrics,'

৫৫. **'অন্নদামঙ্গল'**: এই কাব্যের রচয়িতা মধ্যযুগের অন্তিম প্রহরের বড় কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়। নিশাবসানের লক্ষণ যেমন উজ্জ্বলতম শুকতারায় প্রকট, দিনশেষের দ্যুতি যেমন সন্ধ্যাতারকার মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি মধ্য-যুগের বাঙলা সাহিত্যের ভালোমন্দ শেষ হয়েছে ভারতচন্দ্রের কাব্য-জ্যোতিকে আশ্রয় করে। 'চৌরপঞ্চাশৎ' ভারতচন্দ্রের রচনা কিনা সেই বিতর্ককে প্রশ্রয় না দিলে তাঁর রচনার তালিকা হচ্ছে : ১। অন্নদামঙ্গল, ২। রসমঞ্জরী, ৩। সত্যপীরের ব্রতকথা : ২টি, ৪। চণ্ডীনাটক এবং ৫। নাগাষ্টক সহ নানা কবিতা। এর মধ্যে প্রধানত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যকে অবলম্বন করেই ভারতচন্দ্রের প্রতিভার শক্তিকে বিচার করা হয়ে থাকে। বহু আলোচিত ঐ 'অন্নদামঙ্গল' তিনটি খণ্ডে সম্পূর্ণ: ক। অন্নদামঙ্গল বা 'অন্নপূর্ণামঙ্গল'; খ। কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের কথা এবং গ। মানসিংহ পালা। এই তিনটি খণ্ড সবদিক থেকেই তিনটি পৃথক কাব্য হলেও কবি যেমন ভাবে মূল 'অন্নদামঙ্গল' বা 'অন্নপূর্ণামঙ্গলে'র কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যাসুন্দরের গল্পটিকে জড়িয়ে দিয়েছেন তেমনি আট দিনে বিভক্ত পালায় অন্নদা ও বিদ্যার কাহিনীর সঙ্গে মানসিংহের পালা ক্রমান্বয়ে একত্রে গীত হলেও বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি স্বতন্ত্র কাব্য। তথাপি ঐ তিন খণ্ডকে একত্র ধরেই ভারতচন্দ্রের প্রতিভার বিচার করা দরকার।

১৭১২ খ্রীস্টাব্দের ২ মাঘ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভূরসুট বা ভূরিশ্রেষ্ঠ পরগণার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো [বর্তমানে এই গ্রাম হাওড়া জেলায় অবস্থিত] গ্রামে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ। বর্দ্ধমান-রাজের সঙ্গে বিবাদের কারণে তাঁরা রাজ্য হারিয়ে হৃতদরিদ্র হয়ে পড়েন। ভারতচন্দ্রের জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। অর্থকরী ফার্সীর বদলে সংস্কৃত শিখে ও অল্প বয়সে বিবাহ করে অভিভাবকদের বিরাগভাজন হওয়া, কারাবাস, সন্ন্যাস-জীবন যাপন, ভালোভাবে ফার্সী শিক্ষা, জীবিকার সন্ধানে বহুবিধ উপায় অনুসন্ধান, শেষে কৃষ্ণচন্দ্র রাজার সভাকবি, মূলাজোড়ে রাজ-আশ্রয় প্রাপ্তি, সেখানেও শত্রুলাভ তাঁর জীবনের ঝুলিকে নানা অভিজ্ঞতায় পূর্ণ করেছে। জীবনের এই উত্থান-পতন কিন্তু তাঁর সাহিত্য-চর্চাকে ব্যহত করতে পারে নি। ১৭৩৭-৩৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সত্যপীরের দুটি ব্রতকথা দেবানন্দপুরে বাসকালে রচিত হয়। পরে ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি লেখা হয় কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায়। 'রসমঞ্জরী' এবং নানা কবিতারও ঐখানেই সৃষ্টি। 'নাগাষ্টক' ও অসমাপ্ত 'চণ্ডী' নাটক মূলাজোড়ে লিখেছিলেন। তাঁর তিনটি পুত্র। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

আগেই বলা হয়েছে ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণনগরের অধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় তাঁরই নির্দেশে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচিত হয়। এতে মোট ছয়টি কাহিনী আছে: ১। শিবপার্বতীর উপাখ্যান, ২। ব্যাস-বৃত্তান্ত। এই দুটির কাহিনীর উপাদান পুরাণ থেকে সংগৃহীত। ৩। হরিহোড়ের উপাখ্যান, ৪। ভবানন্দের উপাখ্যান—এ-দুটির কাহিনীতে মৌলিকতা আছে এবং এর দ্বিতীয়টির বিষয় হলো তাঁর আশ্রয়দাতার পূর্বপুরুষের অন্নদাকৃপাপ্রাপ্তি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারতচন্দ্র ছাড়া আর কোন 'মঙ্গল'-কবিই তাঁর সামনে উপস্থিত জীবন্ত মানুষকে দৈবীকৃপা লাভ ও অবতারত্বের সঙ্গে এভাবে যুক্ত করে দেন নি [মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভবানন্দের বংশধর আর ভবানন্দ স্বর্গের দেবতা নলকুবেরের অবতার, অতএব কৃষ্ণচন্দ্র হলেন দেব-অবতার বংশের মানুষ]। ৫। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী, যা সমগ্র কাব্যের একটি অসংলগ্ন অংশ; এ মূল কাহিনীর সঙ্গে খাপ খায় না, এমন কি এর দেবীও ভিন্ন—অন্নপূর্ণা নয় কালিকা। এরপর, ৬। মানসিংহ পালা। যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মোঘল সেনাপতি মানসিংহের যুদ্ধে ভবানন্দের মানসিংহকে সহায়তা দান ও দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে রাজ্য প্রাপ্তি ইত্যাদি ঐতিহাসিক-কাল্পনিক উপাদানে এই পালা রচিত। এই অংশ বিভাগ থেকে দেখা যাচ্ছে: 'ইহার প্রথম খণ্ডে দেবতা, দ্বিতীয় খণ্ডে মানুষ এবং তৃতীয় খণ্ডে অতীত ইতিহাস প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহার তৃতীয় খণ্ড বা মানসিংহ কাব্য রচনায় ভারতচন্দ্রের প্রতিভার একটা নতুন দিকের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়।' কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্নদামঙ্গল বলতে যে প্রথম খণ্ড বা অন্নপূর্ণামঙ্গলকে বোঝায় এখানে তার সাহিত্যমূল্য সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করা হবে।

অন্নদামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গলের অনুসরণেই রচিত হয়েছে, চণ্ডীর সঙ্গে অন্নদার সম্পর্ক দূরতর

নয়। এইভাবে মঙ্গলকাব্যের আধারেই তিনি 'নতুন মঙ্গল' রচনার চেষ্টা করেছেন—এ দিক থেকে আয়োজনের কোন ত্রুটি নেই। আসলে দৃষ্টিভঙ্গী এবং style-এর পার্থক্যই তাঁকে মঙ্গলকাব্য ধারায় এক পৃথক আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মাত্র আটচল্লিশ বছরের জীবনে তিনি যে হলাহল পান করেছিলেন তাকে তিনি গতানুগতিক রচনা-প্রক্রিয়ার আধারে ভরে সমাজকে ফিরিয়ে দিতে দ্বিধা করেন নি। 'ভারতচন্দ্রের মতো উচ্চশিক্ষিত, তত্ত্বজ্ঞ এবং বহুদর্শী পণ্ডিত ও প্রতিভাবান কবিকে [এবং কতকটা আত্মম্ভরী বলে নিজের গুণবিষয়ে সচেতন: 'পড়িয়াছি যেইমত লিখিবারে পারি, / কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥'] ধনাঢ্য ব্যক্তিদের আশ্রয় বারে বারে ভিক্ষা করে, অর্থানুকূল্য লাভ করে, কৃপার ভিখারী হয়ে খোসামুদে মোসাহেবের জীবন কাটাতে হয়েছে। এর যন্ত্রণাবোধ তাঁকে অন্তরে বিদ্ধ করেছে এবং তাঁর কাব্যকে তিক্ত ও বক্র করে তুলেছে।' 'অন্নদামঙ্গলে' এই তিক্ততা বিচিত্র ভঙ্গীতে, বিচিত্র ভাষায় এবং বিচিত্র উপকরণ ও উপলক্ষে নানাভাবে ঝরে পড়েছে।

৫৬ **জ্ঞানদাস:** কেবল ষোড়শ শতাব্দীতে নয়, সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে জ্ঞানদাস নামধেয় এক পদকর্তা মহত্তর প্রতিভার অধিকার নিয়ে বঙ্গ কাব্য-সংসার আলোকিত করে বাস করছেন। কিন্তু এই জ্ঞানদাসের পরিচয় প্রসঙ্গে যে অল্প কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তা হচ্ছে: বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার কাঁদড়া গ্রামে আনুমানিক ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দে এক ব্রাহ্মণ বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত এবং তৎপত্নী জাহ্নবাদেবীর শিষ্য। খেতুরীর উৎসবে এঁকে উপস্থিত দেখে মনে হয় ইনি গোবিন্দদাস-বলরামদাসের সমসাময়িক।

প্রায় সমস্ত সমালোচকই জ্ঞানদাসের কবিপ্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কেউ বলেছেন তিনি আত্মগত ভাবগীতোচ্ছ্বাসময় লিরিক [Lyric] কবি। কারোর মতে ইনি ছিলেন 'রোমান্টিক কবি'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বৈষ্ণব কবিতা'য় যে প্রশ্ন করেছিলেন ['হেরি কাহার নয়ান / রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে ?'...ইত্যাদি] তা ছিলো কবির প্রশ্ন—সমালোচকের নয়। অতএব জ্ঞানদাসের যে কবিত্ব, তা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ভক্ত-কবিরই ধর্মীয় বাতাবরণে রচিত। তার বাইরে, সেদিনের পটভূমিকায়, তিনি নিশ্চয়ই শূন্য-শুষ্ক, কবিত্বহীন। এবং তা যদি সত্যই না হতো, তবে আপন অন্তরের উদ্বেগ আবেগের বেদনাময় উচ্ছ্বাসে 'তরুণ গরুড়সম মহৎ' সৃষ্টির ক্ষুধায় তিনি বৈষ্ণব অথবা অন্য যে কোনো ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যবস্তু নিয়ে অভিনব কিছু সৃষ্টি করে ফেলতেন। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি—হওয়া সম্ভবও ছিলো না। তাই জ্ঞানদাস কবি ছিলেন এবং বৈষ্ণব কবি। তিনি বাংলা এবং ব্রজবুলি—এই দুটি ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন।

জ্ঞানদাস যথার্থ কবি হয়ে উঠেছেন তখনই, যখন একান্ত সহজ, অনতিমার্জিত বা রাখালী সুর যুক্ত বাংলায় পদ রচনা করছেন। এখানে তিনি শব্দের জাল ফেলে ফেলে তাঁর কবি-হৃদয়ের উপান্তকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে 'কেবল পালিয়ে বেড়ায়,

দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে'। কি এক সঙ্গীতের সুর যেন আকুল করে তোলে তাঁর হৃদয়কে,—পূর্ণিমায় ফুলে ওঠা সমুদ্রের মতো আথাল-পাথাল করতে থাকে তাঁর আবেগ, অ-দেখা মুরলী বাদকের দর্শন পেতে। ভাবের তন্ময়তায় ভাষা-ব্যবহারের বাঁধ ভেঙে যায়, বাংলা বা ব্রজবুলি কিছুই তাঁর বশে থাকে না। সব একাকার হয়ে যায়।

পূর্বরাগ এবং অনুরাগ—বিশেষত রূপানুরাগ ও আক্ষেপানুরাগের কবিতায় জ্ঞানদাস বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মনে হয় চৈতন্যলীলা মাধুরী উপভোগ করতে না পারা এবং দ্বাপর-বৃন্দাবনের রাধা-কৃষ্ণ প্রেম-যমুনায় অবগাহন করার অসম্ভাব্যতাকে কবি আবেগের কল্পলোকে উপভোগ করতে চেয়েছেন বা করেছেন,—ফলে তা তাঁর অমর পদগুলির বাণী হয়ে ঝরে পড়েছে। এখানে একটি ভাব-সম্মিলনের পদ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে: 'ওহে নাথ কি দিব তোমারে॥ ধ্রু॥ / কি দিব কি দিব করি মনে করি আমি। / যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥ / তুমি যে আমার নাথ আমি যে তোমার। / তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার॥ / যতেক বাসনা মোর তুমি তার নিধি। / তোমা হেন প্রাণনাথ মোরে দিল বিধি॥'···এর স্বাভাবিক সৌন্দর্য এবং আন্তরিক মাধুর্য সকলকেই আকর্ষণ করবে।

অনেকে জ্ঞানদাসকে কবি চণ্ডীদাসের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। যথার্থ বিচারে, রূপনির্মাণ বা ভাবের বিশিষ্টতার দিক থেকে উভয়ের মধ্যে মিল আছে। এজন্যে জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের শিষ্য বললে অন্যায় হবে না।

৫৭. লোচনদাস / 'চৈতন্যমঙ্গল': ক্রমানুসারে তৃতীয় হলেও বিষয়ের অভিনবত্বে ও মর্যাদায় লোচনদাস লিখিত 'চৈতন্যমঙ্গল' নামক চৈতন্যজীবনীখানি চৈতন্যচরিত সাহিত্যে একটি বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। পিতা কমলাকর দাস এবং মাতা সদানন্দীর একমাত্র সন্তান লোচনের বাসভূমি ছিলো বর্ধমান জেলার কোগ্রাম-এ। অভিজাত বৈদ্য বংশের সবেধন নীলমণি হওয়ায় মাতৃ ও পিতৃকুল উভয়তই প্রচুর আদর পেয়ে কবি প্রায় গোল্লায় গিয়েছিলেন। শেষে মাতামহ পুরুষোত্তম 'মারিয়া ধরিয়া' লোচনদাসকে অক্ষর-জ্ঞান দান করেন। চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট ভক্ত পরিকর শ্রীখণ্ড নিবাসী নরহরি সরকার ছিলেন কবির গুরু। তাঁরই নির্দেশে লোচন তাঁর কাব্য রচনা করেন।

লোচনের কাব্য ছিলো জনতাসেব্য। তাই তাঁর কাব্যে রয়েছে পাঁচালীর ঢঙ, গায়েনের সুবিধা মতো বহুল সুর-নির্দেশ ও মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য বিশিষ্টতা। এদিক থেকে জয়ানন্দের সঙ্গে তাঁর কিছুটা মিল থাকলেও তিনি কবিত্বশূন্য বা হীন-প্রতিভা ছিলেন না। এ ছাড়াও লোচন তাঁর কাব্যে কিছু কিছু নতুন তথ্য পরিবেষণের চেষ্টা করেছেন, এবং তা এসেছে মুরারি গুপ্তের কড়চাকে অনুসরণ করার ফলে। কিন্তু যে জীবনবোধ এবং নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির বলে তথ্যকে কবিতা-রসের সরোবরে হৃদয়লোভন কাব্য-সরসিজ করে ফোটানো যায়, লোচনের তা ছিলো না। লোচন

তাঁর গুরুদেব প্রবর্তিত 'গৌরনাগরী' ভাবের প্রচারকারী হিসেবে তাঁর কাব্যে যে রস ও ভাবের উদ্বোধন ঘটাতে চেয়েছেন, তাতে তিনি একান্তভাবে সার্থক হয়েছেন। এবং তা বৈষ্ণব তাত্ত্বিকদের মতের অনুকূল হওয়ায় প্রসারের যেমন সুযোগ পেয়েছে, তেমনি তাঁর গ্রন্থ একটি সুললিত জীবনী-কাব্য হিসেবে অসংখ্য ভক্তের আস্বাদন-সৌভাগ্যও লাভ করেছে।

লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গল' মোটামুটি ভাবে ১৫৬ থেকে ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচিত বলে ধরা হয়। এতে মোট চারটি খণ্ড। সূত্র-আদি-মধ্য ও অন্ত্য। এর মধ্যে সূত্র অংশে মঙ্গলকাব্যের মতো গণেশবন্দনা থেকে স্বর্গের কাহিনী এবং চৈতন্যদেবের অবতার গ্রহণের কারণ বর্ণিত হয়েছে। পরের আদি খণ্ডে চৈতন্যদেবের জন্ম থেকে গয়ায় পিতৃ-পিণ্ড দান করে ঘরে ফেরা পর্যন্ত; পরে মধ্য খণ্ডে চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ ও নীলাচল লীলা বর্ণিত হয়েছে। সবশেষে অন্ত্যলীলায় দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ থেকে আরম্ভ করে চৈতন্যদেবের অলৌকিক ভাবে [জগন্নাথ দেহের সঙ্গে মিলন] তিরোধানের মধ্যে দিয়ে গ্রন্থ শেষ হয়েছে।

লোচনের কাব্য সম্পর্কে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া ভক্ত ও সমালোচকদের মধ্যে দেখা যায়। কেউ বা তাঁকে বিশিষ্ট ও সহজ কবিত্ব প্রতিভার অধিকারী মনে করেন; আবার কেউ বা তাঁকে 'গৌরনাগরী' ভাব ব্যাখ্যাতা রূপে অসংযত আদিরসের পরিবেষক হিসেবে নিন্দে করেন। এই উভয় মন্তব্যেই কিছু সত্য আছে। আসলে, যেখানে কবি তাঁর গুরুদেবের [নরহরি সরকার] 'গৌরনাগরী' ভাব চৈতন্যদেবের জীবনের ওপর আরোপ করেছেন সেখানেই কবিকে পাঠকদের পাতে চটুল ও নির্লজ্জ আদিরস বেটে দিতে হয়েছে। আর যেখানে তিনি নিজস্ব ভাব-কল্পনার রাজ্যে আপন খেয়ালে বিচরণ করেছেন সেখানেই স্বভাব কবির মতই হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছেন। কবি করুণরসের বর্ণনাতেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এখানে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ উদ্ধৃত হলো: দু'নয়নে বহে নীর / ভিজিয়া হিয়ার চীর / বক্ষ বহিয়া পড়ে ধার। / চেতন পাইয়া চিতে / উঠে প্রভু আচম্বিতে / বিষ্ণুপ্রিয়া পুছে বারবার॥ ·· / কি কহিব মুই ছার / আমি তোমার সংসার / সন্ন্যাস করিবে মোর তরে। / তোমার নিছনি লৈয়া / মরি যাব বিষ খাইয়া / সুখে তুমি বঞ্চ এই ঘরে॥

৫৮. **'চৈতন্যভাগবত'**: বাংলায় চৈতন্যদেবের মহান চরিত্র অবলম্বনে চরিতকাব্য রচনার সূত্রপাত করেন যিনি তাঁর নাম বৃন্দাবন দাস। এই বৃন্দাবন দাস বৈষ্ণব-ভক্ত সমাজে 'ব্যাসদেবের' মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রকৃত জীবন কাহিনী আমরা আজও জানি না। তিনি নিজেও তাঁর গ্রন্থে আত্মকাহিনী বর্ণনা করেননি। এই মৌনতা তাঁর জীবন সম্বন্ধে বহু অলৌকিক গাল গল্পের সৃষ্টি করেছে। তবে সব বাদ দিয়ে এইটুকু নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে চৈতন্যদেবের প্রিয় শিষ্য শ্রীবাসের ভাই-ঝি 'বৃন্দাবনদাস নারায়ণীর নন্দন' এবং বলরামের অবতার নিতাই বা নিত্যানন্দের শিষ্য! ইনি আপন গ্রন্থের মধ্যে অত্যন্ত দুঃখ করে বলেছেন যে তিনি চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ-

লীলা স্বচক্ষে দেখতে পান নি ; নানাপ্রকার তথ্য প্রমাণের দ্বারা এই বিষয়ে স্থির হয়েছে যে, ১৫৪ · খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বৃন্দাবন তাঁর গ্রন্থ 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেছিলেন। অতএব ১৫২০ খ্রীস্টাব্দের ২।৪ বছর এধার ওধারে বৃন্দাবনের জন্ম হয়।

আগেই বলা হয়েছে, বৃন্দাবনদাসের কাব্য চৈতন্যদেবের তিরোধানের অল্প কিছু পরেই রচিত হয়েছিলো। অধিকন্তু যে নিত্যানন্দ ছিলেন চৈতন্যের সবচেয়ে নিকট সঙ্গী তিনিই বৃন্দাবনের শ্রদ্ধাভাজন গুরু। তাই প্রায় প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে বৃন্দাবন তাঁর কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করতে পারায় তাঁর কাব্য বিশেষ তথ্যনিষ্ঠ চৈতন্য জীবন-পরিচয়ের আকর গ্রন্থ হয়ে উঠতে পেরেছে। স্বাভাবিক বৈষ্ণব-ভক্তি, একান্ত তথ্য-নিষ্ঠা, যুগপ্রভাব ও বয়সের তারুণ্য চৈতন্য ভাগবতকে সুপাঠ্য কাব্যগ্রন্থ ও অসংখ্য সংবাদের উৎসক্ষেত্রে পরিণত করেছে। অধিকন্তু নিকট-দর্শনের ফলে চৈতন্যদেবের মানবগুণ, পাঞ্চভৌতিক স্বভাবগুলিও তিনি বেশ মোটা রেখায় আঁকতে পেরেছেন— যাতে আমরা চৈতন্যকে অবতার বলে স্বীকার করে নিয়েও মর্ত্য-মাটির দোষে-গুণে গড়া মানুষ হিসেবে পেয়েছি। এরই সঙ্গে বৃন্দাবন আরও একটি মূল্যবান কাজ করেছেন তা হলো, চৈতন্য-জীবনের আগে পাছের যে নবদ্বীপের সমাজ-সংসারের ইতিহাস ও বাঙালীর স্বভাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা প্রদান। এই জন্যেই আমাদের আজকের যুক্তিনিষ্ঠ চেতনা তাঁর কাছ থেকে প্রচুর সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছে। এইখানেই 'চৈতন্য ভাগবতে'র সাফল্য। অর্থাৎ একদিকে নিষ্ঠাবান ভক্ত-বৈষ্ণব যেমন তাঁর কাব্য থেকে চৈতন্যচরিতামৃত পান করে পরিতৃপ্ত হতে পারে, ঠিক তেমনি যুক্তিবাদী ঐতিহাসিক তাঁর ঋণ অস্বীকার করতে পারে না।

বৈষ্ণবধর্ম ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সেদিন যাঁরা ছিলেন, বৃন্দাবন তাঁদের অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় আক্রমণ করেছেন, তাঁর গ্রন্থে। অনেকে একে অবৈষ্ণবসুলভ যৌবনের দম্ভ বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় যুবক বলেই বৃন্দাবন নিজ ধর্মসংস্কারের প্রেরণায় চৈতন্যদেবকে অবতার বলে স্বীকার করেও বয়সোচিত যুক্তিজ্ঞানকে নষ্ট করতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, সেদিন যে বিরুদ্ধতার মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে আপন প্রতিষ্ঠাভূমি খুঁজে নিতে হয়েছিলো তার বিরুদ্ধে যথার্থ পৌরুষের বিশেষ প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু, একান্ত দুঃখের বিষয়, চৈতন্যদেব কাজীদলন ইত্যাদিতে সেই পৌরুষ দেখালেও পরবর্তীকালে তা বৈষ্ণবীয় বিনয় ও ভক্তির যুক্তিহীন রসতারল্যে ভেসে গেছে। একমাত্র বৃন্দাবনেই কঠোর মন্তব্যসহ সেই পৌরুষ-শক্তিকে কিছুটা প্রকাশিত হতে দেখি। তৃতীয়ত, বৃন্দাবনের জন্মকথা নিয়ে যে কৌতুক ও কটুকাটব্য সেদিনের সমাজে প্রচলিত ছিলো, তার অভিঘাতে সৃষ্ট এক স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক রূঢ়তার চিহ্ন বৃন্দাবনের কাব্যে ফুটে উঠেছে। যাই হোক, সমস্ত গুণ ও ত্রুটিকে গ্রহণ-বর্জন করে আমরা নিঃসংশয়ে বাংলা চরিত-সাহিত্যে আদি এবং উল্লেখযোগ্য রচনা হিসাবে তাঁর কাব্যকে সমাদর করতে পারি।

বৃন্দাবন, মা নারায়ণী ও গুরু নিত্যানন্দের আশীর্বাদ, নির্দেশ, অনুপ্রেরণা এবং

সহযোগিতায় তাঁর কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যের প্রাথমিক নাম ছিলো 'চৈতন্যমঙ্গল'। চৈতন্যভাগবত তিন খণ্ড : আদি, মধ্য, অন্ত্য-এ বিভক্ত। প্রথমে, জন্ম থেকে গয়া গমন, দ্বিতীয়ে, সন্ন্যাস গ্রহণ এবং তৃতীয়ে, নীলাচল গমন ও সেখানকার কিছু কিছু ঘটনা বর্ণনার পর যেন আকস্মিকভাবে গ্রন্থ শেষ হয়ে গেছে। বৃন্দাবনের কাব্য সরল-সহজ, সুললিত ও পাঁচালীর ঢঙে লেখা। ফলে, এই কাব্য ভক্ত-সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিলো। গভীর বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের ভার এতে নেই, তথ্য ও জীবনের সহজ বর্ণনায় তরতর করে কবির কাব্য এগিয়ে গেছে। এখানে আমরা তার কিছু পান করি; সে-দিনের সমাজের অবস্থা : 'এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়। / ভক্তিযোগ শূন্য লোক দেখি দুঃখ পায়॥ / সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে। / কৃষ্ণ পূজা কৃষ্ণ ভক্তি কেহো নাহি বাসে॥ / নিরবধি নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহল। / না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥ ·· / ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়ে / এই সবে রত আর কিছু না জানয়ে॥'

৫৯ **বিজয় গুপ্ত** : আদি মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য শাখায় বিজয় গুপ্ত অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাম। অনেকে মনে করেন যে : 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে সুস্পষ্ট সন-তারিখযুক্ত মনসামঙ্গল কাব্যের কবিদিগের মধ্যে বিজয় গুপ্ত-ই' প্রথম। গুপ্ত কবি তাঁর কাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে বাংলার বিখ্যাত সুলতান হুসেন সাহের শাসনকালে আনুমানিক ১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচিত হয়েছে।

গুপ্ত কবির পূর্ববর্তী হরি দত্তের কাব্য দেবী মনসার মনঃপূত না হওয়ায়, অধিকন্তু তা লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় তিনি মনসার স্বপ্নাদেশে এই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আধুনিক বরিশাল জেলার গৈলা-ফুল্লশ্রী গ্রামে কবির জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম সনাতন এবং মাতার নাম রুক্মিণী। আজও গৈলা গ্রামে বিজয় গুপ্ত পূজিত মনসাদেবী বর্তমান রয়েছে বলে প্রচার আছে।

একথা স্বীকার করায় কোনো সংকোচ নেই যে প্রথম শ্রেণীর কবি-প্রতিভার অধিকারী বিজয় গুপ্ত নন। তবে যে লোক-রুচি কবিকে জনপ্রিয় করে, কাব্যকে প্রচার মূল্য ও সর্বজনীনতা দেয়, বিজয় গুপ্তের মধ্যে তা প্রচুর পরিমাণে ছিলো। যেমন : দেবী মনসার প্রতি অকুণ্ঠ ভক্তি, মনসা ধারণার মূলে যে অনু-আর্য দেবতা তাকে অলৌকিক দেবী-মহিমার প্রতিষ্ঠা দান, কবির নিজের ব্যক্তিগত মনসা-সাধনা [অনেকটা রামপ্রসাদের মতো একাধারে সাধক ও কবি] ও সরল জনতাসেব্য তরল হাস্যরস-রসিকতা [যা অনেক সময় স্থূল ভাঁড়ামিতে পর্যবসিত হয়েছে] বিজয় গুপ্তের কবি-খ্যাতিকে এক সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রসারিত করেছে। এর সঙ্গে ছিলো সহজ ভাষা, অত্যন্ত পরিচিত ও জীবন-ঘেঁষা উপমালঙ্কারের প্রয়োগ এবং মানুষের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি।

আধুনিককালে সার্থক সাহিত্য-কীর্তির লক্ষণ নিরূপণ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব-ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও গভীর সহানুভূতির উল্লেখ করেছেন—সেই দুটিই বিজয় গুপ্তের

মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছিলো। ফলে, মনসার ক্রূর এবং অকারণ সন্ত্রাস-সৃষ্টি, 'সর্বনাশ বর্ষণে দ্বিধাহীন' স্বভাবের পেছনে ব্যর্থ নারীত্ব, বিফল প্রেম, অসার্থক মাতৃত্ব, দেব-সমাজের ধিক্কার-এর মনস্তাত্ত্বিক কারণটিকে তিনি যেন বুঝতে পেরেছিলেন। এমন সার্থক ও ক্রমবিকশিত মনসা-চরিত্র বাংলা মনসা-কাব্যে দ্বিতীয় রহিত।

প্রথমে মনসার দুঃখময় জীবন-চিত্র রচনায় গুপ্ত কবি : মাতা নাই, ভ্রাতা নাই-একমাত্র বাপ। /তোমার চণ্ডীর শরীরে কিঞ্চিৎ নাই তাপ॥···/মা নাই, ভাই নাই—মনে বড় তাপ। { তোমার ক্রোধ দেখিয়া লুকাইয়া থুইল বাপ। / সৎ মায়ের নিদারুণ রোষে ও হিংসায় জীবনের প্রথম লগ্নেই মনসার জীবন বিষময় হয়ে উঠলো। এর পর তাঁর বিয়ে হয়েছে শুষ্ক যৌবন, অপগত পৌরুষ এক ঋষির সঙ্গে। বিয়ের রাতেই এই মুনিও তাঁকে ছেড়ে গেলেন : 'করিয়া অনেক আশ / বিয়া দিল তোমার পাস / ত্রিদিব ঈশ্বর মোর বাপ / পূর্বজন্মে করিলাম পাপ / তে কারণে এত তাপ / প্রভু মোরে ছাড়িয়া যাও বনে।

এই বঞ্চনাই মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মে মনসার বিষপূর্ণিত দুনয়ন'কে উদ্যত করেছে, যা, সমগ্র মনসামঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত মাতার স্নেহ, পিতার আলিঙ্গন, পত্নীর প্রেমাকুতিকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চেয়েছে। অপর পক্ষে শিব অত্যন্ত হাস্যকর ও কামাতুর চরিত্র। এইখানে কবিও গ্রাম্যতা দোষ দুষ্ট।

কবি হিসেবে বিজয় গুপ্ত পূর্বসূরী হরি দত্তের যে নিন্দা করেছেন তার মধ্যে কাব্যাঙ্গিক সম্বন্ধে কটাক্ষ অন্যতম। ফলে, বিজয় গুপ্তে সুষ্ঠু কাব্যদেহ নির্মাণ আমরা স্বাভাবিক ভাবেই আশা করবো, কবি এবিষয়ে আমাদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন। বিশেষ করে উপমা ব্যবহারে তিনি এমন সাবলীল ও জীবনধর্মী বিষয় নির্বাচন করেছেন যা সে যুগে প্রায় দুর্লভ ছিলো / যেমন : জনম দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।{ যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল॥ / শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।/ পাষাণ আগুন হয় মোর কর্মফলে॥' /

অবশ্য এই কাব্য সুষমার কথা তেমন বড গলায় বলার মতো কিছু নয় ; এবং তখন সে সময়ও আসেনি, তবুও বিজয় গুপ্ত পয়ার ও লাচাড়ী ছন্দের বাইরে স্বরবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দ নিয়েও কিছু পরীক্ষা চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। কাব্য-দেহের প্রসাধন কার্যে এই সমস্ত সচেতন প্রয়াস সেদিনের পক্ষে এবং মঙ্গলকাব্যের জগতে এক বৈপ্লবিক ঘটনা তাতে সন্দেহ কি ?

৬০. **'চৈতন্যমঙ্গল' [জয়ানন্দ] :** বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে'র পরে জয়ানন্দ নামে এক বৈষ্ণব ভক্ত কর্তৃক একটি চৈতন্য-জীবনীকাব্য রচিত হতে দেখা যাচ্ছে। এই গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল'। এই কবি এবং কাব্য সত্তর-আশি বছর আগে বৈষ্ণব সমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। এর আগে কোনো সূত্র থেকেই এঁর সম্বন্ধে কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি। পরে যে সংবাদ আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে জানা যাচ্ছে যে, কবির পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র এবং নাম রোদিনী দেবী। অনেক

মরা হাজার পর জয়ানন্দের জন্ম হয়েছিল বলে তাঁর নাম রাখা হয় 'গুইয়া'। পরে তাঁদের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণকারী চৈতন্যদেব এই নাম পরিবর্তিত করে রাখেন জয়ানন্দ। বর্ধমান জেলার সাতগেছে থানার অন্তর্গত আমাইপুর গ্রামে কবির নিবাস ছিলো। কবিরা ছিলেন বন্দ্য-ঘটী ব্রাহ্মণ। কবি বৈষ্ণব ও চৈতন্যভক্ত হলেও সমগ্র পরিবারের মধ্যে বৈষ্ণবনিষ্ঠা, ভক্তি-তন্ময়তা ছিলো বলে মনে হয় না।

জয়ানন্দকে খুব বড় কবি বলা যায় না। তবে সেদিনের বৃহত্তর জনরুচি যে তারল্য ও লৌকিক বিশ্বাসের দহে আটকে পড়েছিলো কবি তাকে অতিক্রম করতে পারেন নি। কারণ, জনতার দাবী মেনে নিয়ে তিনি তাঁর কাব্যে এমন সব বিষয় ও ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যা যে কোনো নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবকেই আঘাত করে। যেমন, তিনি তাঁর কাব্যে শাক্তদেবী আদ্যাশক্তির বন্দনা করেছেন। চৈতন্যদেবের মৃত্যুরও একটা লৌকিক কারণ [রথের সামনে নৃত্যকালে ইষ্টকখণ্ডের আঘাত বিষিয়ে যাওয়ার ফলে মৃত্যু] দেখিয়েছেন। কবি তাঁর কাব্যে এমন সব ঘটনার বা বক্তব্যের উপস্থাপনা করেছেন যার মধ্যে চমক থাকলেও, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সম্প্রদার্শ বা ইতিহাসের সঙ্গে তা মেলে না। ফলে, এই গ্রন্থ কোনো দিনই বৈষ্ণব সমাজের কাছ থেকে সমাদর বা আনুকূল্য লাভ করে নি। আসলে মনসা চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাপক জনসমাদর লক্ষ্য করে কবি মঙ্গলকাব্যের ধাঁচে চৈতন্যজীবনকে নয়টি পালায় [বা খণ্ডে] বিভক্ত করে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও গ্রন্থের প্রারম্ভে বন্দনা খণ্ড, মাঝে-মধ্যে বারমাস্যা ইত্যাদির ব্যবহারে তাঁর রচনায় মঙ্গলকাব্যের অনুসরণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আসলে জয়ানন্দের মধ্যে একটা সহজাত আবেগ ছিলো, পরিবারের মধ্যে তাঁর পিতার অনুসরণে চৈতন্যভক্তি ও বৈষ্ণবীয়ানার একটা স্পর্শও লেগেছিলো। তাঁর যুগও একদিকে লৌকিক বিশ্বাসজাত দেবদেবীর প্রতিষ্ঠার এবং অন্যদিকে চৈতন্যভাবের প্রবল প্লাবনের কাল। এই উভয় স্রোতের টানে জয়ানন্দের উক্ত আবেগ স্বল্প কবিত্ব-শক্তিকে অবলম্বন করে প্রকাশ পেতে চেয়েছে; ফলে 'ইতিহাসের তথ্যভ্রান্তি, ক্রমভঙ্গ দোষ এবং সর্ব-পরিচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের' অপহ্নবকে অঙ্গে নিয়ে 'চৈতন্যমঙ্গল' যুগ ও রুচির দাবী মিটিয়ে স্বাভাবিক পথেই অপসৃত হয়েছিলো।

যে সব পারিপার্শ্বিক তথ্য মোটামুটিভাবে সংগৃহীত হয়েছে তাতে বলা যায় যে বৃন্দাবনদাসের পরে এবং ১৫৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে জয়ানন্দের কাব্য রচিত হয়েছিল, তখন কবির বয়স প্রায় পঞ্চাশ, নিত্যানন্দের পরিকর অভিরাম অথবা গদাধর, ঠিক কে যে কবির গুরু ছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা শক্ত।

কবির কবিত্ব-শক্তি সম্বন্ধে বড় গলায় বলার মতো কিছু নেই। কাব্যদেহে প্রসাধনের চিহ্নও বেশ স্বল্প। তবুও সরল বর্ণনার আয়োজনহীন স্বাভাবিকতার প্রশংসা করতেই হয়: 'দেখি মিশ্র পুরন্দর আনমনে চাঞি। / খাইতে শুইতে ভাবে বাপুরে নিমাঞি॥ / ঘনকরে করতালি হাসি হাসি নাচে। / কাকুর চুম্বন লইয়া মা বাপেরে

যাচে ॥ / খনে গড়ি দিয়া কন্দে ধূলায় ধূসর। / দেখিঞা আনন্দে শচী মিশ্র পুরন্দর ॥' নিমাইয়ের বাল্যক্রীড়ার এই বর্ণনা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সরল।

৬১. **কৃষ্ণদাস কবিরাজ**ঃ কৃষ্ণদাস বাংলা সাহিত্যের একজন অতুল-কীর্তি কবি। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা সদ্যজাত বাংলা ভাষার কৈশোরকালে এই রকম একজন শক্তিমান কবিকে লাভ করেছিলাম। কবি কৃষ্ণদাস ছিলেন যথার্থ ভক্ত ও বিনয়ী বৈষ্ণব, তাই তাঁর কাব্যের মধ্যে আত্মপরিচয়ের অংশ অত্যন্ত কম। যা আছে তা হচ্ছে : বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামে কবির জন্ম হয়। সময়টা আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। অবিবাহিত কবি যৌবনে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ পেয়ে বৃন্দাবনে গমন করলেও চৈতন্যদেবের জীবনী-রচনা কালে কবি 'অতিবৃদ্ধ জরাতুর'।

পূর্ববর্তী কবি বৃন্দাবনদাস কর্তৃক আকস্মিকভাবে সমাপ্ত চৈতন্য-জীবনের শেষভাগকে বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে এবং তারই পটভূমিকায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব-দার্শনিকতা, সাধ্য ও সীমাকে ব্যাখ্যা করার ইচ্ছায় কৃষ্ণদাস তাঁর পরিপূর্ণ বয়স, অতলান্ত প্রজ্ঞা এবং অমৃতরচয়িত্রী প্রতিভা নিয়ে এক দুরূহ কর্মনিষ্পন্নের ব্রত গ্রহণ করেন। দুরন্ত ইচ্ছা-শক্তির সঙ্গে নিত্যানন্দের আশীর্বাদ তাঁকে বঙ্গবাণীর অমর বীণাখানির অধিকারী করে ধন্য করেছে। কথিত আছে, কৃষ্ণদাসের এই অমূল্য কাব্যের পুঁথিখানি বাংলা দেশে প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণের পথে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ কর্তৃক অপহৃত হওয়ার সংবাদে বৃদ্ধ কবির শোকাভিঘাতে মৃত্যু হয়।

প্রায় সমস্ত সমালোচকই কৃষ্ণদাস কবিরাজকে মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। সকলেই,—যার যেমন অভিরুচি, তাঁর গ্রন্থ থেকে কাব্যরস, ইতিহাস, দর্শন অথবা বৈষ্ণব তত্ত্বকে বুঝে পেয়েছেন,—এই অর্থে রত্নাকর সমুদ্রের সঙ্গে তাঁর গ্রন্থ তুলনীয়। সর্বাশ্রয়ী এই বিরল প্রতিভাকে তাই শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতেই হয়।

কৃষ্ণদাসের কবি প্রতিভার **প্রথম** বৈশিষ্ট্য তাঁর বিষয় নির্বাচনে। কারণ, **এক** তিনি জানতেন যে, 'অতিবৃদ্ধ জরাতুর' তিনি! তাঁর সামনে অতি অল্পই জীবনের আলো অবশিষ্ট আছে, তাই চৈতন্যচন্দ্রের অনন্ত, অপার লীলাকীর্তন করে ওঠা এই অল্প আলোকে সম্ভব নয়। **দুই**. চৈতন্য-জীবন-মাহাত্ম্য বর্ণনায় যে গতানুগতিকতার ক্লান্তি জাগছে তাকেও অতিক্রম করতে হবে। **তিন**. তিনি নিজের চর্মচক্ষে চৈতন্যদেবের লীলামাধুরী দেখতে পান নি। তাই চৈতন্য-জীবনের এমন দিককে গ্রহণ করতে হবে যার মধ্যে মিথ্যাচার থাকবে না ; যা আগামী বৈষ্ণবদের সত্য এবং ভক্তিমিশ্রিত অনুকরণীয় পথ দেখাবে। **চার**. এই বিবেচনায় তিনি এমন স্থান থেকে তাঁর গ্রন্থ আরম্ভ করলেন, যার বিষয়ে তাঁর পূর্বজনেরা তেমন বিস্তারিত করে কিছুই লেখেন নি। অর্থাৎ তিনি চৈতন্যদেবের নীলাচল-লীলার বর্ণনাতেই বেশী জোর দিলেন।

কৃষ্ণদাস-প্রতিভার **দ্বিতীয়** বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঐ বহুলাংশে নতুন বিষয়বস্তুর সঙ্গে বৈষ্ণবীয় তত্ত্বকে মিশিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ বৃন্দাবনের পণ্ডিত সাধক ও দার্শনিক ভক্তদের দ্বারা প্রথা-নির্দিষ্ট কঠিন বৈষ্ণবীয় তত্ত্বকে কবি কৃষ্ণদাস সরস কাব্যভাষার দ্বারা ব্যাখ্যা করে দিলেন। বাঙালী চৈতন্য-ভক্তেরা কৃষ্ণদাস রচিত চৈতন্য-জীবনী পাঠ করতে করতেই বেশ সহজ ভাষায় ও সরল উপমা-উপমানের মধ্যে দিয়ে বৈষ্ণব তত্ত্বকে বুঝে বা জেনে নিতে পারলো। তিনি তাঁর অসীম প্রতিভায় পয়ারের আশ্চর্য শোষণ-শক্তিকে নির্ভর করে বৈষ্ণব দর্শনের সিদ্ধান্তগুলিকে আপামর বাঙালীর ভক্তিরসাপ্লুত পাতে স্বাদু ও সুপাচ্য করে পরিবেষণ করলেন। তিনি খাঁটি প্রাবন্ধিকের মতো যুক্তির ক্রম, উদাহরণ ও প্রমাণ দিয়ে চৈতন্য জীবনের শেষ লীলা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব, গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের কারণ, বৈষ্ণব রসতত্ত্বের স্বরূপ, রাগানুগা ভক্তি এবং সাধ্যসাধন তত্ত্বের ব্যাখ্যা, রাধাতত্ত্ব কি, প্রেমতত্ত্ব কিরূপ, অবতার তত্ত্ব, গোপীতত্ত্ব ইত্যাদির পরিচয় দিয়ে দিলেন। বাঙালীকে একই পাত্রে আহার ও ঔষধ পরিবেষণের এমন উপায় সেকালে তিনি ছাড়া আর কেউই উদ্ভাবন করতে পারেন নি। এখানে কৃষ্ণদাস সত্যই 'কবিরাজ'। তিনি কামের সঙ্গে তুলনায় প্রেমের স্বরূপ বোঝাতে লিখছেন: 'গোপীগণের প্রেম রূঢ় মহাভাব নাম। / বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম কভু নহে কাম॥ / কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। / লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ-বিলক্ষণ॥ / আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। / কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥ / কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল। /কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য প্রেম হয় মহাবল॥...' সেদিন এর চেয়ে যুক্তিপূর্ণ, প্রবন্ধগুণান্বিত, উপমায় সহজ কবিতা আর কে রচনা করতে পেরেছেন?

কৃষ্ণদাসের প্রতিভার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর ইতিহাসবোধ ও তথ্যনিষ্ঠা। আমাদের জানা আছে, কৃষ্ণদাস চৈতন্যদেবের লীলা চাক্ষুষ করেন নি। তিনি এই লীলা বর্ণনা করতে গিয়ে মুরারি গুপ্তের কড়চা, কবি কর্ণপূরের গ্রন্থদ্বয়, স্বরূপ দামোদরের কড়চা, বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' প্রভৃতি বই থেকে সাহায্য নিয়েছেন। এছাড়াও চৈতন্যদেবের শেষ জীবনের অনেক সংবাদ পেয়েছেন বৃন্দাবনের শ্রীরূপ-সনাতন, গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব, লোকনাথ গোস্বামী প্রমুখের কাছ থেকে। কৃষ্ণদাস আপন প্রতিভা এবং বুদ্ধির সাহায্যে চৈতন্য জীবন-কাহিনীতে যেমন অনেক নতুন তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, তেমনি কোথাও বা পূর্বপোষিত ভুলগুলি ভেঙে আগের ফাঁকগুলিকে ভরিয়ে দিয়েছেন। এই সব কিছুকেই করেছেন প্রাপ্ততথ্যকে পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণের কষ্টিপাথরে এবং সম্ভাব্যতার যুক্তিতে যাচাই করেই। বৃন্দাবনদাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও তিনি চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-পূর্বের স্বতন্ত্র জীবন-কথা বর্ণনা করেছেন। নীলাচল-লীলায় চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ আচরণের সঙ্গে তার কারণ ও তত্ত্বকে মিশিয়ে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, চৈতন্যদেব যা হয়েছিলেন তার চেয়ে যা হওয়া উচিত ছিলো তা-ই যেন আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

এই ভাবে তথ্য ও তত্ত্বের সুদৃঢ় কাঠামোকে আশ্রয় করে কৃষ্ণদাসের অমর প্রতিভা চৈতন্যদেবের প্রেমভাববিগলিত রূপের রসবিহ্বল মূর্তি রচনা করেছে। 'এ-একটি বিশেষ ধর্মমতের আরাধ্য হলেও সব ধর্মমতের লোকের অনুধাবনযোগ্য ব্যাখ্যা ও উক্তির মধ্যে সুদূরের বাণীর আভাষ নিয়ে এসেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' একটি বৃহৎ গ্রন্থ। কবি ১৬শ শতাব্দীর একেবারে শেষ দশকে এই কাব্যটি রচনা করেন। এই গ্রন্থটিতে তিনি চৈতন্যদেবের পূর্ণ সাতচল্লিশ বছরের জীবন-কাহিনীটিকে আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিনটি অধ্যায় বা লীলায় বিভক্ত করে নিয়ে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে আদিতে ১৭টি, মধ্যে ২৫টি এবং অন্ত্যে ২০টি পরিচ্ছেদ আছে। চৈতন্যদেবের মৃত্যু নিয়ে যে অলৌকিক কাহিনী সেদিনও প্রচলিত ছিলো, তাদের কোনো মূল্য না দিয়ে সত্যসন্ধ কৃষ্ণদাস নীরব থেকেছেন।

কবির ভাষাজ্ঞান, ছন্দ-বোধ, উপমা-অলঙ্কারের সাহায্যে বক্তব্যকে মর্মগ্রাহ্য করে তোলার ক্ষমতা সশ্রদ্ধ প্রশংসার দাবী করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো কবির স্বধর্ম-ভক্তি ও সবিনয় নিষ্ঠা। 'সস্তা বাহবা পাবার জন্যে তা বিনয়ের ভেক ধারণ নয়'—সমগ্র কাব্যের মধ্যেই কবির 'সদা সন্নত বিভ্রান্ত' চিৎকমলটিকে প্রস্ফুট দেখতে পাওয়া যায়।

৬২. **'অনাদ্যের পুঁথি'**ঃ বাঙলার পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় ধর্মদেবতা ও পূজাকে অবলম্বন-করে সাহিত্য-পূজাবিধান পদ্ধতি ইত্যাদির যে-সব পুঁথি পাওয়া যায় তার মধ্যে অর্বাচীন 'অনাদ্যের পুঁথি' অন্যতম। এই পুঁথিটি 'বিশ্বভারতী'র পুঁথিশালার প্রধান ও বিশিষ্ট পুঁথি গবেষক ড. পঞ্চানন মণ্ডল কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে 'বিশ্বভারতী' গ্রন্থন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে [দ্রষ্টব্য : 'সাহিত্য প্রকাশিকা : তৃতীয় খণ্ড]। আমরা জানি যে ধর্মপূজা সংক্রান্ত সব ধরণের ছড়া-পাঁচালী-কাব্য-পুঁথি ইত্যাদিতে জনৈক রামাই পণ্ডিতের কথা,—তাঁর সম্বন্ধে নানা কেচ্ছা-কাহিনী ও অলৌকিক ক্রিয়া-কাণ্ডের উল্লেখ দেখা যায়। এবং এই সব মিলিয়ে তাঁকে একজন অবতার-মহাপুরুষ বলে মনে হলেও তাঁর ঐতিহাসিক উপস্থিত বিষয়ে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। রামাই পণ্ডিত সম্পর্কে এইরকম গাল-গল্পের খোলস ছাড়িয়ে মানুষ হিসেবে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করা খুবই কঠিন।

সে-যাই হোক এই 'অনাদ্যের পুঁথি'তে আমরা রামাই এবং তাঁর উপাস্য ধর্ম-নিরঞ্জনের নানা অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের পরিচয় পাই। সেগুলি সূত্রাকারে সাজালে এই রকম দাঁড়ায় : ক) ধর্মের একজন শূদ্র-উপাসক অনেক কঠিন সাধনার পর এবং বেদ পাঠ করে গৌড়ের মুসলমান রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। খ) এই রাজা, রামাই—যিনি ধর্ম নিরঞ্জনের শ্রেষ্ঠ উপাসক, তাঁকে, তাঁর পুত্রকে [যাঁর নাম শ্রীধর] ও রামাই-এর আরো সঙ্গীসাথীকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করেন। গ) রামাই ধর্মের আরাধনা করে ঐ সব মৃতব্যক্তিদের জীবিত করেন এবং ঘ) পরিশেষে ধর্ম রাজাকে কুষ্ঠব্যাধির সাহায্যে শাস্তি দেবেন এমন প্রতিশ্রুতি দেন।

পুঁথির শেষ অংশ খণ্ডিত। ফলে আমরা এই পুঁথির লেখক এবং গ্রন্থের নাম জানতে পারিনি। মূল পুঁথি না পাওয়া গেলেও যে পুঁথিটি আবিষ্কার করা গেছে তার বৈশিষ্ট্য হলো : ১. এটি বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ার সীমান্ত অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। ২. এর লেখক মধ্য-রাঢ় অঞ্চলের মানুষ, কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে ঐ অঞ্চলের উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। ৩. এটিকে কাব্য না বলে রামাই-পণ্ডিতের ধর্মপুজার ছড়া বলাই উচিত। ৪ হিন্দু-সমাজের নিচের থাকের মানুষ, ডোম সমাজের ধর্ম-সংস্কৃতির কথা এতে থাকলেও ধর্মনিরঞ্জনের নিরাকারত্বের প্রসঙ্গও এতে আছে। ৫. গৌড়ের রাজার রামাই এর পুত্র হত্যা এবং অপরাপর গুরুভ্রাতাদের প্রতি অত্যাচারের বর্ণনার মধ্যে সেদিনের ধর্ম-সংঘর্ষের কিছু চিত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। ৬. পুঁথিটি ছোট এবং কাব্যগুণ বিবর্জিত হলেও একে তুচ্ছ করা ঠিক হবে না। বর্ণনার মধ্যে অশিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত সমাজের সরল অকৃত্রিমতা, ধর্মের সঙ্গে ভক্তদের মানসিক সম্পর্ক, ধর্মের প্রতি রামাই-এর মাঝে মাঝে সংশয় প্রকাশ ইত্যাদি অংশগুলি 'কোন যথার্থ কবিপ্রতিভাধারী ব্যক্তির হাতে পড়িলে এই বিভিন্ন উপাদান ধর্ম-সাহিত্যের একটি অধ্যায়কে পূর্ণ করিতে পারিত।'

৬৩. **অদ্বৈত আচার্য :** চৈতন্যদেব আপন জীবন-চেষ্টাদির দ্বারা যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন করেন সেই ভক্তি মন্দিরের দুই মূল স্তম্ভ হলেন নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য। এই জন্যেই ব্রজমোহন দাসের 'চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপে' বলা হয়েছে : 'আপনেই মহাপ্রভু হৈলা আদিস্কন্ধ। / দুই দিকে দুই স্কন্ধ অদ্বৈত-নিত্যানন্দ ॥' অতএব অদ্বৈতের পরিচয় সাহিত্যকার হিসাবে গৌণ হলেও যে গৌর মহিমা বাঙলা সাহিত্যকে ষোড়শ শতাব্দীতে গৌরব দান করেছিলো তার পটভূমিকা রচনায় এঁর অন্যতম প্রধান ভূমিকা ছিলো বলেই সাহিত্যের ইতিহাসে এঁর প্রসঙ্গ সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। এ-ছাড়াও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে জীবিত মানুষকে নিয়ে যে চরিতশাখার সূচনা হয় তা অবতার-মহাপুরুষ চৈতন্য-ব্যতিরিক্ত আর যাঁদের নিয়ে রচিত হয়েছিলো তার মধ্যে অদ্বৈতাচার্য অন্যতম। তাঁকে নিয়ে রচিত কাব্যগুলির প্রামাণিকতা ও তাদের পরিবেষিত তথ্য সম্বন্ধে নানা সংশয় থাকলেও সংখ্যায় তারা চার : ১ লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের সংস্কৃতে লেখা গ্রন্থের নাম 'বাল্যলীলা সূত্র'; ২. ঈশান-নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ'; ৩. হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল' এবং ৪. নরহরি দাসের 'অদ্বৈতবিলাস'। সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাসকারেরা এই গ্রন্থগুলির সার্বিক অকৃত্রিমতায় সন্দেহ পোষণ করে থাকে।

বলা হয়েছে অদ্বৈতাচার্য চৈতন্য-পরিকর এবং চৈতন্যধর্ম প্রচারের অন্যতর স্তম্ভ; এ-সত্ত্বেও তিনি চৈতন্যদেব থেকে বয়সে অন্তত পঞ্চাশ বছরের বড় ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও অন্তত ষোল / সতের বছর বেঁচে ছিলেন [১৪৩৫ ? - ১৫৫০ ?]। অদ্বৈতের পিতা কুবের আচার্য শ্রীহট্টের লাউড়ের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইনি কিছুদিনের জন্য যখন শান্তিপুরে বাস করেছিলেন সেই সময় অদ্বৈতের জন্ম হয়। এঁর

আসল নাম কমলাক্ষ। ইনি শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তাঁর জন্মস্থান শান্তিপুরে আসেন এবং সেখানেই থেকে যান। তাঁর পিতা-মাতাও শ্রীহট্টের বাস তুলে দিয়ে শান্তিপুরে স্থায়ী বাসা বাঁধেন। অদ্বৈত ছিলেন পরম পণ্ডিত। তাঁর বিদ্যাবত্তায় সন্তুষ্ট হয়ে গুরু তাঁকে উপাধি দেন 'বেদপঞ্চানন'। পিতার মৃত্যুর পর ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে সমগ্র ভারতের তীর্থগুলি পরিভ্রমণ করেন এবং শেষে নিরাকারবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞানী শ্যামদাসকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করলে তিনি জনতা কর্তৃক 'অদ্বৈত আচার্য' নামে সম্বর্ধিত হন। এঁর দুই বিবাহ সীতা এবং শ্রী। প্রথমার সন্তান অচ্যুতানন্দ বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষ সম্মান লাভ করেছিলেন।

অদ্বৈত আচার্য বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ, গৃহী বৈষ্ণব এবং টুলো পণ্ডিত। ইনি চৈতন্যদেবের অনেক আগেই মাধবেন্দ্রপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন শান্তিপুর গোষ্ঠীর অগ্রগণনীয় ব্যক্তিত্ব। ইনি প্রথমে ছিলেন জ্ঞান ও শঙ্করমার্গের বৈদান্তিক পণ্ডিত, পরে চৈতন্যদেবের চরিত্র প্রভাবে ভক্তিমার্গের বিশিষ্ট সাধকে পরিণত হন। কিন্তু চৈতন্য যখন নীলাচলে তখন ইনি নিত্যানন্দের সহযোগে গৌড়ে চৈতন্যভাব ও ভক্তি প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু অদ্বৈতের মধ্যে যে জ্ঞান ও মুক্তিমার্গের মূল থেকে গিয়েছিলো তা আবার সতেজে আত্মপ্রকাশ করে ['মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান'—চৈ. চৈ. আদি। ১২]। দূরে বসে চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ মারফৎ এই সংবাদ পেয়ে ভাবিত হয়ে পড়েন ও এক পত্রে তাঁকে অভিযুক্ত করে দণ্ডদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। যাই হোক শেষ পর্যন্ত তিনি চৈতন্যানুবক্তিতে স্থিত হন এবং তিনি ও তার স্ত্রী সীতাদেবী নদীয়া-শান্তিপুরে আমরণ চৈতন্যভাবান্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন।

৬৪. **'অদ্বৈতমঙ্গল'** ঃ চৈতন্যদেবের দিব্যজীবনকে অবলম্বন করে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে জীবনীকাব্য রচনার যে ধারার সূত্রপাত হয়েছিলো সেই ধারা আরো অগ্রসর হয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ বা বিশিষ্ট শিষ্যের জীবনী রচনাতে নিয়োজিত হয়। ফলে, আমরা শান্তিপুরের অগ্রগণ্য বৈষ্ণব অদ্বৈত আচার্য, তাঁর স্ত্রী সীতাদেবী, নরোত্তম শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ, নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবীদেবী প্রমুখের জীবন-কথা অবলম্বন করে বেশ কয়েকখানি জীবনীকাব্য পেয়ে যাই। এর মধ্যে অদ্বৈত প্রভুর জীবন-প্রসঙ্গ অবলম্বনে লেখা কাব্যের সংখ্যাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক। যেমন ঃ ১. ঈশান-নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ', ২. নরহরি দাসের 'অদ্বৈতবিলাস' ৩ সংস্কৃতে লেখা লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের 'বাল্যলীলাসূত্র' এবং ৪. হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল'। আমরা এখানে শেষোক্ত গ্রন্থটির সম্বন্ধেই আলোচনা করবো।

১৭৯১-৯২ খ্রীস্টাব্দে জনৈক রসিকচন্দ্র বসুর লিপিকৃত হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল' নামক গ্রন্থের একটি খণ্ডিত পুঁথি ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে ব্রজমোহন সান্যাল সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এই পুঁথিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রাখা আছে। এই কবি যে ভাবে তাঁর কাব্যে আচার্য পুত্র অচ্যুতানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তাতে মনে হয় যে তিনি তাঁর শিষ্য ছিলেন। অদ্বৈতপ্রভুর স্ত্রী সীতাদেবীর নামও

শ্রদ্ধার সঙ্গে এতে উল্লেখ করা হয়েছে। সুপরিচিত অদ্বৈত-চরিত গ্রন্থ 'অদ্বৈতপ্রকাশে'র ঘটনা-বর্ণনার সঙ্গে এর নানা জায়গায় মিল থাকলেও এর থেকে কিছু নতুন সংবাদ পেতেও অসুবিধা হয় না। কবি তাঁর গ্রন্থকে মোট তেইশটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন যেগুলি আবার পাঁচটি উপবিভাগে বিভক্ত।

কাব্যহিসাবে এখানে কবির কোন দক্ষতাই প্রকাশ পায়নি। অলঙ্করণহীন ও প্রতিভাশূন্য এই গ্রন্থ রচয়িতাকে আমরা কবি না বলে পদ্যকার বলতে পারি। তবে মাঝে মাঝে দেশ-কালের এমন কিছু বর্ণনা আছে যেগুলি সমসাময়িক ইতিহাসের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দলিল হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। অবশ্য এই পদ্যকার কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচরিতামৃতকাব্যম্' কিংবা 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' পড়েছিলেন তাই এঁকে সংস্কৃতে পণ্ডিত বলতে দ্বিধা করি না; কিন্তু ইনি কেন যে মুরারি গুপ্ত বা জয়ানন্দ বা বৃন্দাবন দাসের অনেকানেক তথ্যকে অনুসরণ করেন নি তা আমরা বুঝতে পারি না। সব শেষে আমাদের বক্তব্য যে, চৈতন্যশিষ্য ও পরিকরদের এইরকম অনেক জীবনীগ্রন্থকে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ জাল বিবেচনা করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ড. বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ের মতে: 'আমি সীতা ও অদ্বৈতচরিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে পাঁচখানির [অদ্বৈত প্রকাশ ও অদ্বৈতমঙ্গল সহ] পরিচয় দিলাম। আমার বিচারে পাঁচখানি গ্রন্থই জাল বিবেচিত হইল। জাল শব্দের অর্থ যে গ্রন্থগুলি যে যে ব্যক্তির দ্বারা লিখিত বলিয়া প্রকাশ, তাঁহারা উহা লেখেন নাই।…ইঁহারা যদি সত্য সত্যই গ্রন্থগুলির রচয়িতা হইতেন, তাহা হইলে ইঁহাদের বর্ণনার সহিত মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুর ও বৃন্দাবন দাসের বর্ণনার গুরুতর বিরোধ দেখা যাইত না।… তাই এই সমস্ত গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতারা মুরারি গুপ্ত প্রমুখ প্রামাণিক লেখকের উক্তির বিরুদ্ধে কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। উক্ত পাঁচখানি গ্রন্থের মধ্যে পরস্পরবিরোধী উক্তি আছে যথেষ্ট।'

৬৫. **বীর হাম্বীর**ঃ বীর হাম্বীর ঐতিহাসিক চরিত্র। ইনি বর্তমান বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা ছিলেন [১৫৯৬-১৬২২ খ্রীঃ]। এঁরা ছিলেন মাল বা মল্লবংশোদ্ভূত আদিবাসী। ইনি রাজা হিসাবে বিচক্ষণ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী। তিনি নিজে যেমন বীর যোদ্ধা ছিলেন তেমনি সামরিক বুদ্ধিতেও অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন দেশে পাঠান মোঘলের অধিকার প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ চলছিলো সেই সময় তিনি মোঘলের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং বার্ষিক ১লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার কর দিয়ে তাঁদের সঙ্গে সন্ধি করেন।

একজন বলবান, যুদ্ধনিপুণ, সুশাসক প্রসঙ্গে আলোচনার যোগ্য স্থান হলো ইতিহাস। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, এই রাজবংশ ছিলেন প্রথমাবধি শাক্ত ও শৈব ধর্মের অনুরাগী। এক্তেশ্বর, ডিহর, বাহুলাড়ার মত প্রাচীন ও বিস্ময়কর মন্দির, মৃণ্ময়ী দেবীর মন্দির নির্মাণ ও পূজা তাঁদের শাক্ত ও শৈব ধর্মের প্রতি অনুরাগের পরিচয় দেয়। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর

সূচনায় [১৬০০ খ্রীস্টাব্দে ?] বীর হাম্বীরের সপরিবারে ও স-বান্ধবে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ এঁদের জীবনাচরণে ও সাংস্কৃতিক চর্যায় আমূল পরিবর্তন ঘটায়। যা এই সময়ের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করে। দ্বিতীয়ত, শ্রীনিবাসের রাজ-শিষ্য বীর হাম্বীর বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করায় সমগ্র বিষ্ণুপুর রাজ্যে, এমন কি সমস্ত দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গেই বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও প্রসার লাভ করে। সারা বাঙলায় এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটে নি। তৃতীয়ত, বীর হাম্বীর বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ না করলে কেবল তাঁর রাজত্ব সীমার মধ্যেই নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেই বৈষ্ণবধর্মের বিশাল ব্যাপ্তি লাভ, উক্ত অঞ্চলসমূহ ও তার চার পাশের দূরতম প্রদেশেও বৈষ্ণবধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য, নৃত্যগীত ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অভিযান সাফল্য লাভ করতো কি না সন্দেহ। বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আন্দোলনে এ-ঘটনা তাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। চতুর্থত, তিনি বৈষ্ণব হয়ে কেবল শাক্ত দম্ভ ও কদাচার ত্যাগ করলেন তাই নয়, ভক্ত সাধক হলেন—এমনকি বৈষ্ণব পদকর্তারূপেও আত্মপ্রকাশ করলেন। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরে' বীর হাম্বীরের ভনিতায় দুটি পদ সংগৃহীত আছে। এখানে একটি পদের কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত হলো : 'প্রভু মোর শ্রীনিবাস / পুরাইলে মনের আশ / তোয়া বিনু গতি নাই আর। / আছিনু বিষয় কীট / বড়ই লাগিত মিট / ঘুচাইলে রাজ অহঙ্কার ॥ /···যমুনার কূলে যাই / তীরে সখি ধাওয়া ধাই / রাধাকানু বিলসয়ে সুখে / এ বীর হাম্বীর হিয়া / ব্রজপুরে সদা ধীয়া / যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে ॥'

অতএব বীর হাম্বীর তাঁর অনুরাগ নিয়ে রাজপৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষণ করেছিলেন তাই তাঁকে বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও একটি সম্মাননীয় আসন দান করেছে।

৬৬. **হুসেন শাহ :** আলাউদ্দীন হুসেন [হোসেন] শাহ বাঙলার সিংহাসনে যে একাদশতম মুসলমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন ইতিহাসে তা 'হুসেন শাহী বংশ' নামে সুখ্যাত। স্বাভাবিকভাবে উক্ত সুলতান, তাঁর রাজত্ব-কর্ম এবং ঐ রাজবংশের খ্যাতি-দুর্নাম ও কর্মধারা ইতিহাসের পর্যালোচনার বিষয়। সাহিত্যের ইতিহাসে ঐ সুলতান ও তাঁর রাজত্বকালের প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করার অনেকগুলি কারণের মধ্যে প্রধান হচ্ছে : ১. হুসেন শাহ ছিলেন মধ্যযুগের বঙ্গ-মনীষার পুনর্জাগরণের অগ্রপথিক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক। তাই চৈতন্যদেব প্রসঙ্গে রচিত প্রায় সব ধরণের সাহিত্যেই উক্ত সুলতানের নাম নানাভাবে এসেছে। ২. হুসেন শাহের বাঙলার সিংহাসন অধিকারের তারিখ ১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর থেকে ১৪৯৪-এর জুলাই মাসের মধ্যে। ইনি প্রায় ছাব্বিশ বছর চরম কৃতিত্বের ও পরম গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করে ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন। এঁরই রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্যদেব চব্বিশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার মুখে ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ৩. মধ্যযুগের বাঙলার ইতিহাসে হুসেন শাহের রাজত্বকাল সর্বাপেক্ষা গৌরবের [সংস্কৃতিক-সামাজিক-অর্থ নৈতিক] এবং সামাজিক সুস্থিতির কাল। এই

কারণেই এই সময়েই বঙ্গসাহিত্য সর্বাধিক সমুন্নতির ক্ষেত্রে পৌঁছাতে পারে। এই কারণেই হুসেন শাহ বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসে বহুমান্যতার সঙ্গে আলোচিত হয়েছেন।

কিন্তু হুসেন শাহকে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির সঙ্গে জড়িয়ে যে গৌরবজনক ইতিহাস রচিত হয় সাম্প্রতিক গবেষণায় তা এইভাবে খর্ব করা হয়েছে : "অনেকের ধারণা, হোসেন শাহ বিদ্যা ও সাহিত্যের—বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু এই ধারণার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। যশোরাজ খান, দামোদর, কবিরঞ্জন প্রভৃতি কয়েকজন বাঙালী কবি হোসেন শাহের কর্মচারী ছিলেন; কিন্তু ইঁহাদের কাব্যসৃষ্টির মূলে যে হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষণা বা অনুপ্রেরণা ছিল, সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বিপ্রদাস পিপলাই, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি সমসাময়িক কবিরা তাঁহাদের কাব্যে হোসেন শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু হোসেন শাহের সহিত তাঁহাদের কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না।··· আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে,—হোসেন শাহ কোন কবি বা পণ্ডিতকে কোন উপাধি দেন নাই [যেমন রুকনুদ্দীন বারবক শাহ দিয়াছিলেন],···সুতরাং হোসেন শাহ বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে।··· বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি পর্বকে অনেকে 'হোসেন শাহী আমল' নামে চিহ্নিত করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ করার কোন সার্থকতা নাই। কারণ হোসেন শাহের রাজত্বকালে মাত্র কয়েকটি বাংলা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থগুলির রচনার মূলে যেমন হোসেন শাহের প্রত্যক্ষ প্রভাব কিছু ছিল না, তেমনি এই সমস্ত গ্রন্থ রচিত হওয়ার ফলে যে বাংলা সাহিত্যের বিরাট সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, তাহাও নহে। কেহ কেহ ভুল করিয়া বলিয়াছেন যে, হোসেন শাহের আমলে বাংলার পদাবলী-সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পদাবলী-সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে হোসেন শাহের রাজত্ব অবসানের কয়েক দশক বাদে,—জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিদের আবির্ভাবের পর। অতএব বাংলা সাহিত্যের একটি অধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে হোসেন শাহের নাম যুক্ত করার কোন সার্থকতা নাই" ['বাংলাদেশের ইতিহাস' : ২য় খণ্ড : রমেশচন্দ্র মজুমদার : পৃ. ৮৯-৯০]। আমরা অবশ্য এই ব্যাখ্যাকে একদেশদর্শী বলে মনে করি।

৬৭. **বিপ্রদাস পিপলাই :** পশ্চিমবঙ্গের এক সর্বপ্রাচীন কবি বিপ্রদাস পিপলাই বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি তাঁর কাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে সুলতান হুসেনের রাজত্বকালে ১৪৯৫-৯৬ খ্রীস্টাব্দে কবি তাঁর 'মনসা বিজয়' কাব্য রচনা করেন। তিনি ছিলেন পিপলাই উপাধিক বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁর পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। ইনি বৈশাখ মাসে শুক্লা দশমী তিথিতে দেবী মনসার স্বপ্নাদেশে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন।

বিপ্রদাস খুবই সাদা-মাঠা ধরণের কবি। ভাষার চারুতা বা বর্ণনার সৌন্দর্য তাতে প্রায় নেই বললেই হয়। চরিত্র চিত্রণও বিশেষত্ব বর্জিত। কবি পুরাণ এবং লোক-বিশ্বাস উভয়ের ওপর নির্ভর করে স্বর্গ খণ্ডের পরিকল্পনা করেছেন। কবি তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং নাথ পন্থের উল্লেখ করে কাব্যদেহকে স্ফীত করেছেন। যাই হোক, কবির মধ্যে প্রশংসার মতো মহৎ কিছু না থাকলেও একেবারে নিন্দার বানে তাঁকে ভাসিয়েও দেওয়া যায় না। এবং দুর্বল হলেও বিপ্রদাসকে কবি হিসেবে গ্রহণ করতেও কোনো বাধা নেই—বিশেষ করে হাসান-হোসেন পালা যেভাবে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এত সহজে বিপ্রদাসের আবির্ভাব কাল ও অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে ইতিহাসগত বিচার ও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চান না আধুনিক গবেষকগণ। তাঁরা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ভাবেই বিপ্রদাস প্রসঙ্গে কয়েকটি সমস্যার উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে সূত্রাকারে সমস্যাগুলির উল্লেখ করে আমাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছাবো। মনসামঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রে বিপ্রদাসের প্রাচীনতা নিয়ে এক কূট তর্ক আছে। যে সমস্ত যুক্তিতে এই কাব্যের প্রাচীনতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে তাকে বিশেষ প্রতিরোধও করা যায় নি। তাই মনে হয়, যে দুটি শ্লোকদ্বারা বিপ্রদাসকে একেবারে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেটি জোর করে তার কাব্য মধ্যে ঢুকেছে। অধিকন্তু তাঁরা আরও বলেন যে, যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে খুব প্রাচীন মনসামঙ্গলের কবি নেই তাই এই ধরণের কাজ করা হয়েছে। নীচে আমরা কবির অর্বাচীনতা সম্পর্কে সংক্ষেপে মত ও যুক্তিগুলি উদ্ধার করে দিচ্ছি :

১. দু-খানি খণ্ডিত পুঁথি এবং সম্প্রতি একটি সম্পূর্ণ পুঁথি মাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এর কোনোটাই শতখানেক বছর আগে অনুলিখিত হয়েছিলো বলে মনে হয় না।

২. এই পুঁথিগুলির ভাব-ভাষা অত্যন্ত আধুনিক। অথচ এই কবির কাব্য ব্যাপকভাবে যে প্রচারিত ছিলো তেমন মনে হয় না। সমসাময়িক [যদি সত্যই ঐ গ্রামে কবির জন্ম হয়ে থাকে] প্রাচীন কোনো মনসামঙ্গলের পদ-সংকলনেও বিপ্রদাসের পদ স্থান পায় নি। অর্থাৎ কোনভাবে প্রচার হলো না [যত বেশী প্রচারিত হবে পুঁথির সংখ্যা তত বেশী হবে] অথচ কাব্যের কায়া এমন আধুনিক হয়ে গেলো কি করে ?

৩. প্রাপ্ত পুঁথিগুলির সব কয়টিরই অনুলিপি কালও একই সময়ে. এখানেও সন্দেহ।

৪. কবির প্রাচীনতা-প্রতিষ্ঠাবাদীরা বলেন যে এই কবির কাব্য-দেহে বহু বাইরের বিষয় প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। বেশ, তাই যদি হয় তবে পুঁথির আদ্যোপান্ত ভাষাগত কোনো অনৈক্য নেই কেন ? তাই, কি ভাবে প্রমাণ করা যাবে যে এর কোনটা আসল আর কোনটা প্রক্ষিপ্ত। উত্তরে যদি বলা যায় যে ব্যাপক জনপরিচিতির জন্যে [যেমন কবি কৃত্তিবাসের ক্ষেত্রে হয়েছে] এমনটি হয়েছে ; তবে তাতে একথা কি জিজ্ঞাসা করা যায় না যে বিপ্রদাসের 'গ্রেট পপুলারিটির' সাক্ষ্য কোথায় ?

৫. কবি সূচনায় বলেছেন যে আমি সাত পালায় কাব্য রচনা করবো। কিন্তু নয় পালা পর্যন্ত কাব্য রচিত হয়েও খণ্ডিত হলো কেন? অথচ মঙ্গলকাব্যের সংস্কারানুযায়ী সাধারণত আট পালার কম কাব্য রচিত হয় না। অতএব এখানেও কথা, কাজ ও সংস্কারের সঙ্গে ঘোরতর অমিল।

৬. মনসামঙ্গলের আসল উপাখ্যান বেহুলা লখীন্দর কাহিনী আরম্ভ হওয়ার আগেই পুঁথি খণ্ডিত হয়েছে। এবং চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রায় কুমারহাট, হুগলী, কোলকাতা, বেতড, চিৎপুর প্রভৃতি অতি-আধুনিক স্থানের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

ইত্যাদি আরও অসংখ্য যুক্তির দ্বারা এই কাব্য ও কাব্যের আধুনিকত্বে বিশ্বাস জোরদার হয় এবং প্রাচীনত্বের ভেজালটা পোক্ত হয়ে ওঠে। যাই হোক, একেবারে পাথুরে প্রমাণ না থাকায় বিপ্রদাসকে এই পঞ্চদশ শতাব্দীতে রেখে তাঁর কাব্য-কৃতিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা হলো।

৬৮. সংস্কৃতে রচিত চৈতন্যজীবনী: শ্রীচৈতন্যদেব নিজের জীবন, ধর্মভাব ও রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার আস্বাদনকে যেভাবে দেশের সামনে উপস্থিত করেছিলেন তাতে সেদিনের বাঙলার ধর্মভীরু, দৈবনির্ভর বৃহত্তম জনগোষ্ঠী তাঁকে অবতার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে দেবত্বে উন্নীত করতে দ্বিধা করে নি। ফলে, তাঁর সঙ্গ-সুখ লাভ ঈশ্বর-সান্নিধ্যের মতো পরমাকাঙ্ক্ষিত, তাঁর জীবন-পর্যালোচনা ও কীর্তন করা ভগবানের আরাধনার মতো পবিত্র কর্ম বলে বিবেচিত হয়েছিলো। তাই চৈতন্যদেবের জীবন-কাহিনী নিয়ে তাঁর জীবনকালেই জীবনী-সাহিত্য সৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রথম চৈতন্য জীবনী-সাহিত্য যা লেখা হয়েছিলো তা কিন্তু বাঙলায় নয়, সংস্কৃতে। সংস্কৃতে রচিত চৈতন্য-জীবন-প্রসঙ্গ গ্রন্থগুলির পরিচয় এই রকম:

ক. প্রথমে রঘুনাথ দাস ও রূপ গোস্বামী সংস্কৃত ভাষায় কিছু স্তব ও স্তোত্র রচনা করেন, যাতে রাধাকৃষ্ণ-লীলার সঙ্গে চৈতন্যদেবের কথা পাওয়া যায়।

খ. এরপর চৈতন্যজীবন অবলম্বনে সংস্কৃতে যে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয় তা-হলো চৈতন্যদেবের বাল্য সহপাঠী **মুরারি গুপ্তের** লেখা **শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্** সংক্ষেপে **মুরারি গুপ্তের কড়চা**। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে বইটি মুদ্রিত রূপ পায় এবং সেই ছাপা বইটিতে ৭৮টি সর্গ, ১৯০৬টি শ্লোক এবং ৪টি প্রক্রম রয়েছে। এত বড় মহাকাব্য ধরণের গ্রন্থটির অনেকখানিকেই আধুনিক গবেষকগণ ভেজাল বা অন্য কেউ রচনা করে এর মধ্যে প্রক্ষেপ করে দিয়েছেন বলে মনে করেন। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ, 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যের লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থমধ্যে [১. ৩.] পরিষ্কার ভাবে বলেছেন: 'আদি লীলা মধ্য যত প্রভুর চরিত/সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিল গ্রন্থিত।/মধ্য শেষ প্রভুলীলা স্বরূপ দামোদর/সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর।'—অতএব মুরারি চৈতন্য-জীবনের আদি ও মধ্য লীলা অর্থাৎ গয়ায় কৃষ্ণপদচিহ্ন দেখে বাড়ী ফেরা পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। অনেকে মনে করেন বাকী অংশ স্বরূপ দামোদরের লেখা।

মুরারি চৈতন্যের থেকে বয়সে কিছু বড়, সতীর্থ এবং ভক্তবন্ধু ছিলেন। তিনি চৈতন্যকে রাম বা কৃষ্ণ সদৃশ মনে করতেন। গ্রন্থটি ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে লেখা হয়েছিলো বলে অনেকে মনে করেন। রচনাভঙ্গী সরল এবং বর্ণনীয় বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি নিজে চৈতন্যজীবনের অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। মুরারির পরবর্তী প্রায় সব চৈতন্য-জীবনী লেখকই এই কড়চাকে কোন না কোন ভাবে ব্যবহার করেছেন।

গ এরপর চৈতন্যজীবনী নিয়ে সংস্কৃতে দুটি নাটক লেখা হয়; প্রথমটি তাঁর জীবিত থাকা অবস্থায়, অন্যটি প্রয়াণের অল্প কিছু পরেই। **প্রথম** নাটকটির কোন পরিচয়ই প্রায় পাওয়া যায় না কেবল এইটুকুমাত্র জানা যায় যে কোন এক 'বঙ্গদেশীয় বিপ্র' এর লেখক,—লেখক তাঁর নাটক নিয়ে পুরীতে চৈতন্যদেবকে শোনাতে যাওয়া সত্ত্বেও ঐটি তাঁকে শোনানো হয়নি ['বঙ্গদেশের এক বিপ্র প্রভুর চরিতে। / নাটক করি লৈঞা আইলা শুনাইতে']; কিন্তু অন্য সকলে খুশি হলেও স্বরূপ-দামোদর এতে তত্ত্বগত ত্রুটি লক্ষ্য করে নাটকটিকে চৈতন্যের অশ্রবণযোগ্য হিসাবে বাতিল করে দেন [দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন॥/ আরে মূর্খ আপনার কৈলে সর্বনাশ।/ ·· উপদেশ কৈলা তারে যৈছে হিত হয়॥/ যাহ ভাগবত পঢ় বৈষ্ণবের স্থানে।/ একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে॥']—এবং এতেই বোধ হয় নাটকটি লুপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় চৈতন্য-জীবন-কাহিনীর রচনাকার হলেন 'কবিকর্ণপুর' উপাধিক পরমানন্দ সেন। সংস্কৃতে লেখা অনেকগুলি গ্রন্থ পরমানন্দের নামে চললেও প্রধানত 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যম্' নামক কাব্য, 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাট্যম্' নামক নাটক ও 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' নামে চৈতন্যশিষ্য ও অন্তরঙ্গদের বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থ তিনটিই বিশেষভাবে পরিচিত।

পরমানন্দের পিতা ছিলেন পরম চৈতন্যভক্ত শিবানন্দ সেন। ইনি চৈতন্যদেবের নির্দেশেই নিজ কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখেন পরমানন্দ পুরীদাস ['এবার তোমার যেই হইবে কুমার/পুরীদাস বলি নাম ধরিহ তাহার'।] ইনি এঁর কাব্যকৃতিত্বের জন্য 'কবিকর্ণপুর' উপাধি পান। দশ অঙ্কের নাটকটি পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রের অনুরোধে পরমানন্দ রচনা আরম্ভ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর [১৫৪০ খ্রীঃ] পর কিছুদিন রচনাকার্য স্থগিত থাকে ও পরে ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রচনা শেষ হয়। পূর্ববর্তী 'শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যম্' গ্রন্থটি অপরিণত বয়সে [১৬-থেকে ২০-র মধ্যে] রচিত হওয়ার ফলে, মুরারির কড়চার ব্যাপক অনুকৃতি এতে লক্ষ্য করা গেলেও এই নাটকে তাঁর প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত। চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের ও গম্ভীরালীলা কাল পর্যন্ত সময়ের প্রামাণ্য ইতিহাস এতে পাওয়া যায়।

পরমানন্দের মহাকাব্যটিতে মুরারি গুপ্তের কড়চার ১১শ সর্গ পর্যন্ত অনুসরণ আছে এবং সেই অনুসরণের কৃতজ্ঞচিত্ত স্বীকৃতিও গ্রন্থমধ্যে দেখা যায়। কর্ণপুরের লেখা 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' খুবই ক্ষুদ্র গ্রন্থ। এটি আনুমানিক ১৫৬৭ খ্রীস্টাব্দে রচিত। আগেই বলা হয়েছে যে এটিতে চৈতন্য পরিকরবৃন্দের পরিচয় আছে। এদিক থেকে

বইটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার্য। ওর মধ্যে তাঁর লেখা অন্য দুটি গ্রন্থ, নাটক ও মহাকাব্যের উদ্ধৃতিও রয়েছে—রয়েছে মুরারি গুপ্তের কড়চারও প্রসঙ্গে।

৬৯ **'কবিকর্ণপুর' [পরমানন্দ সেন]** ঃ এই টীকাটির উত্তরের জন্য ৬৮ নং টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

৭০ **শ্রীনিবাস আচার্য** ঃ চৈতন্য-তিরোধান পরবর্তীকালে বাংলার বৈষ্ণব-আন্দোলন সাধ্য সাধন ক্রিয়া ও সাহিত্যচর্চা যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বহমান ছিলো শ্রীনিবাস আচার্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। এঁর প্রগাঢ় জ্ঞান, অসাধারণ সংঘ-শক্তি, তন্নিষ্ঠ চৈতন্যভক্তি, চৈতন্য-অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের অপ্রকটের পরে বাঙলার বৈষ্ণব সমাজে নতুন প্রাণাবেগ সঞ্চারিত করে। প্রসঙ্গত, শ্রীনিবাসের সঙ্গে অপর দুই আচার্য, নরোত্তম এবং শ্যামানন্দের কথাও উল্লেখ করতে হয়। 'এই তিনজন আচার্য তিন স্থানে আবির্ভূত হইলেও ইহাদের শিক্ষাদীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছিল বৃন্দাবনে গোস্বামীদের সাক্ষাৎ প্রভাবে। উপরন্তু পরবর্তী কালে তাঁহাদের মধ্যে একটা নিবিড় প্রীতি ঘন বন্ধুত্বও গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাদের প্রভাবে বাংলার হীনবল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল—তাঁহারাই পরবর্তীকালে নূতন বৈষ্ণব কেন্দ্রের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।'

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার চাখন্দী গ্রামে পরম চৈতন্যভক্ত গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের পুত্র ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে শ্রীনিবাসের জন্ম হয় ['শ্রীনিবাসের জন্মের সময় খুব সম্ভব চৈতন্য-নিত্যানন্দ অদ্বৈত কেহই জীবিত ছিলেন না']। ইনি শিশু কাল থেকেই মেধার পরিচয় দেন এবং তরুণ বয়সেই বৈষ্ণব স্মৃতি-দর্শন-সাহিত্যে যথোপযুক্ত বিদ্যা অর্জনের জন্য নরহরি সরকারের পরামর্শে বৃন্দাবনে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি পৌঁছবার পূর্বেই রূপ-সনাতন প্রয়াত হন—তথাপি গোপাল ভট্ট, জীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ বৃন্দাবনের আচার্য, যাঁরা তখনও জীবিত ছিলেন তাঁরা এই তরুণ শিক্ষার্থীর বুদ্ধিদীপ্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে এঁকে সর্ববিদ্যায় কুশলতা প্রদান করলেন। এখানেই নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে তিনি সতীর্থরূপে লাভ করেন। এখানে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হলে দুই সতীর্থসহ শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ রচিত গ্রন্থাদি একটি কাঠের সিন্দুকে ভরে নিয়ে গৌড়ের পথে রওনা দেন। পথে বিষ্ণুপুরের কাছে মল্লরাজ বীর হাম্বীর কর্তৃক তা লুণ্ঠিত হয়। ভগ্নহৃদয় শ্রীনিবাস নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে স্বদেশে পাঠিয়ে দিয়ে পুঁথি উদ্ধারের আশায় বিষ্ণুপুরে থেকে যান। পরে শ্রীনিবাসের চরিত্রগুণে, বিচক্ষণতায় ও গৌরাঙ্গভক্তির শক্তিতে সমগ্র বিষ্ণুপুর ও পরে সমস্ত পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গ বৈষ্ণবধর্মের প্রেমবন্যায় প্লাবিত হয়ে যায়। শ্রীনিবাস না থাকলে এবং মল্লরাজের প্রতি তাঁর প্রভাব বিস্তৃত না হলে 'পশ্চিমবঙ্গে চৈতন্যধর্ম যে বিশাল ব্যাপ্তি লাভ করেছিলো এবং তাঁর প্রভাবে বিষ্ণুপুর ও তার পাশের বৃহত্তম অঞ্চল বৈষ্ণবধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা ও সঙ্গীত বাদ্যাদির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো, তা সম্ভব হতো না। বৈষ্ণবধর্ম অভিজাত সমাজে প্রবেশাধিকার না পেলে এত দ্রুত-

বেগে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়তে পারতো না। ··চৈতন্যোত্তরযুগে, বিশেষ করে শেষ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্যান্যদের সঙ্গে বঙ্গের ভূস্বামী ও ধনি-সম্প্রদায়কে বৈষ্ণবমতের অনুরাগী করে শ্রীনিবাস বাঙলা সমাজ ও সংস্কৃতিকে যে নবীনতর সম্ভাবনায় উদ্দীপিত করেছিলেন তা দেশের সামগ্রিক ইতিহাসের পটভূমিকায় বিচার্য।'

শ্রীনিবাস পূতচরিত্র ও সাধক হওয়া সত্ত্বেও গুরুগণের নির্দেশে দুটি বিবাহ করেন। প্রথমা স্ত্রীর নাম দ্রৌপদী পরে ঈশ্বরী এবং দ্বিতীয়ার নাম পদ্মাবতী পরে গৌরাঙ্গপ্রিয়া। বিবাহ করে এবং রাজপরিবারের সংস্পর্শে থেকে তাঁর আচার-আচরণে আড়ম্বর প্রকাশ পেলেও তাঁর আন্তরিক সাধনায় কোন খাদ ছিলো না। হীরা বসানো সোনার অলঙ্কার পূতিগন্ধময় আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত হলেও যেমন তার মূল্য হ্রাস হয় না, বা সাময়িক ঔজ্জ্বল্য আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেও নির্মল জলে ধোয়া মাত্রই যেমন তার সমস্ত গুণ প্রকাশিত হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি শ্রীনিবাসও আন্তরিক নিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধাভক্তির শক্তিতে সমস্ত রাজসিকতা ও তামসিকতার মালিন্যকে ছাপিয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

শ্রীনিবাস কেবল সাধক বা ধর্মপ্রচারকই ছিলেন না, তাঁর রচিত দু-একটি বাঙলা পদেরও সন্ধান পাওয়া যায়।

৭১. **'সত্যপীরের পাঁচালী'**: 'সত্যপীর' এক মিশ্র ধর্মবোধের ফল। বাঙলা দেশের মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মসংস্কৃতির সমন্বয়বোধের ফলে এই দেবতার জন্ম। এ কারণে ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বেশ কিছু কবি সত্যপীরের—সত্যনারায়ণের পাঁচালী / ব্রতকথা রচনা করেন। এখানে আমরা জনা তিনেক কবির সত্যপীর [নারায়ণের,] পাঁচালী সম্পর্কে কিছু বলবো।

'পীর' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, মুসলমান সিদ্ধ সাধুপুরুষ। এটি ফারসী শব্দ। বৃদ্ধ [জ্ঞান] বা প্রাচীন ও আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে এঁরা মুসলমান সমাজে গৃহীত। এঁরা ছিলেন দেশে দেশে অ-মুসলমানদের মধ্যে ইসলামধর্মের প্রচারক। ইসলাম ধর্মের প্রকৃত পথপ্রদর্শক হিসাবে মান্য। অনেকটা সদ্‌গুরুর মতো। "কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে 'পীর' মুসলমান সাধুপুরুষ, যিনি নানা অলৌকিক শক্তির প্রভাবে উপস্থিত বিপদ-আপদ, আদি-ব্যাধি দূর করতে এবং বহুবিধ কামনা পূর্ণ করতে পারেন।" এ-ছাড়াও পীরদের সঙ্গে ধর্মসূত্রে সেদিনের শাসকদের ঘনিষ্ঠতা থাকায় তাঁরা বেশ প্রভাব প্রতিপত্তিশালীও হয়েছিলেন। এঁরা সন্তুষ্ট হলে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে অনেকের উপকার করতেন ও শ্রদ্ধা এবং ভক্তি আদায় করতেন।

এরই অনুষঙ্গে 'সত্য' কথাটির সম্বন্ধে তথ্য এইরকম "অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মসাধনায় ও ধর্মানুসন্ধানে যেখানে হিন্দু-মুসলমান মত নিরপেক্ষ উদার সমন্বয়ের প্রকাশ হয়েছে সেখানেই 'সত্য' কথাটি একটি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। সূফী সাধকেরা আল্লাহ্‌কে যখন পার্সন্যাল ঈশ্বর বলে ভাবতেন তখন তাঁর নাম দিতেন 'হক', সত্য। এই 'হক' এরই প্রতিধ্বনি পাই সত্যপীর-সত্যনারায়ণে আর সত্য-মহাপ্রভুতে।"

এই 'সত্য' ও 'পীর' "খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রদেবতা রূপে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের উপাসনা বা শিরণি-বণ্টনে স্থিত হন, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনার ধুম পড়িয়া যায়। এই মিশ্রদেবতা পরিকল্পনায় হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ধর্মবিশ্বাস একসূত্রে মিলিত হইয়াছে। মুসলমান শাসনের চণ্ডযুগে হিন্দুগণ ভয়ে-ভক্তিতে মুসলমান পীর-ফকির-মুর্শিদের দরগায় যাতায়াত করিত।[১] উপরন্তু সূফী মতবাদ বাঙালী হিন্দুর কাছে নিতান্ত বিধর্ম বলিয়া মনে হয় নাই। পীর-ফকিরের 'কেরামতে'র প্রতি অশিক্ষিত হিন্দু জনসাধারণের বিস্ময়মুগ্ধ আকর্ষণ ছিল। ফলে ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ নামে এক মিশ্রদেবতার পরিকল্পনা রাঢ়ভূমিতে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। সাধারণত হিন্দুর বাড়ীতে ইনি সত্যনারায়ণ নামেই পূজা পাইয়া থাকেন—কোথাও বা ইহার নাম সত্যপীর।"

মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার চেতুয়া-বরদার কাছে যদুপুর গ্রামের রামেশ্বর ভট্টাচার্য [চক্রবর্তী জন্ম ১৬৭৭ খ্রীঃ] 'সত্যপীরের ব্রতকথা' ['সত্যপীরের পাঁচালী' ?] রচনা করেছিলেন। এটি তাঁর প্রথম সাহিত্য-প্রয়াস বলে মনে হয়। তাই শিল্পকর্মে জড়তা লক্ষ্য করা যায়। কবি যে সংস্কৃত ও উর্দু-ফারসী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কোন সমালোচক রামেশ্বরের সত্যপীর কাব্যের প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেছেন: 'এই কবি অসামান্য ভাষা ও শব্দকুশলী। সংস্কৃত জানিতেন, তাহার উপর ফারসী ও উর্দু ভাষায় অসীম ক্ষমতা।...আগাগোড়া ভাষা চোস্ত, জমাট, ধারালো, ফেনাইবার ফাঁপাইবার চেষ্টা কোথাও নাই' [নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত]। এই মন্তব্য সর্বাংশে মেনে নেওয়া যায় না।

শেখ [মীর] ফয়জুল্লাহ নামে আরও একজন সত্যনারায়ণের পাঁচালীকারকে [১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দ—ড. আহম্মদ শরীফ] পাওয়া যাচ্ছে। ইনি পশ্চিমবঙ্গের লোক, বাড়ী পাচনায়। এঁর কাব্যপ্রতিভা সাধারণ মানের হলেও সেই কাব্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তা হলো এই যে তিনি তাঁর কাব্যে আল্লা, মোহম্মদ, পীর, রসুল এবং স্থানীয় পীর-পীরানীদের সঙ্গে খানাকুলের গোপীনাথ, বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব বা গোরাচাঁদ, শচীমাতা প্রমুখের বন্দনা করেছেন। এতে কবির ধর্মনিরপেক্ষ উদার মনোভাবের পরিচয় পাই।

অন্ত্যমধ্যযুগের সবচেয়ে শক্তিমান কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় [১৭১২-১৭৬০] সত্যপীরেয় বিষয় নিয়ে কিছু সময়ের ব্যবধানে পরপর দুটি পাচালী রচনা করেন।

১। কেবলই কি ভয়ে? ঐ সকল ফকির-পীরদের সদাচারে, সেবাপরায়ণতায়, উদার মানবিকতায় এবং সমাজের নিচের থাকের মানুষদের সুখ-দুঃখের কাছে কাছে থেকে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করেছিলেন তার কথা এখানে উল্লেখিত হওয়া উচিত ছিলো। সাহিত্যের ইতিহাসকার তাঁর গ্রন্থের কোন খণ্ডেই ঐতিহাসিকের অসাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেননি।

প্রথমটি হুগলীর দেবানন্দপুরের হীরারাম রায়ের নির্দেশে রচিত, এবং দ্বিতীয়টি ঐ একই স্থানের অধিবাসী মুনসী রামচন্দ্রের নির্দেশে লেখা হয়েছিলো। দ্বিতীয়টি লেখার সময় কবি পারসী শিক্ষা করছিলেন। কারণ, এতে সদ্য পারসী শিক্ষার রঙ লেগেছে। এই দুটি পালার মধ্যে প্রথমটি ত্রিপদীতে এবং দ্বিতীয়টি চৌপদীতে লেখা।

এখানে কবির কবিত্বশক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, তবে এই ভারতচন্দ্রই যে অচিরে উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষণা ও আনুকূল্যে হয়ে উঠবেন রাজকণ্ঠের মণিমালার মত,—যার ঔজ্জ্বল্য ও কারুকার্যে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী আলোকিত হয়ে উঠবে তার অতিদূরাগত আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। ভারতচন্দ্র কৃত সত্যপীরের পাঁচালীর প্রথমটির কোন পুঁথি পাওয়া যায়নি।

সত্যপীর 'জোড়াতালি [composite] দেবতা' হলেও তাঁর বিষয়ে ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত অসংখ্য পাঁচালী রচিত হয়েছে। ['অষ্টাদশ হইতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যে অন্তত পঞ্চাশ জন কবি সত্যনারায়ণের পাঁচালী লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রের কাব্য ধোপে টিকিয়া গিয়াছে।']

৭২. **সহজযান** : অনেকের ধারণা বৌদ্ধধর্মে মন্ত্রের এবং তান্ত্রিকতার প্রবেশ ঘটেছিলো বুদ্ধের জীবিতাবস্থাতেই এবং দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকেই বৌদ্ধতন্ত্রগুলির রচনা-কর্মের সূচনা হয়। ফলে ক্রমে বৌদ্ধ উপাসনায় মন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে, ঐ পদ্ধতির নাম হয় মন্ত্রযান। এর সঙ্গে কালক্রমে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের যোগাচার ও প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব মিশিয়ে একটি দার্শনিক প্রত্যয় নির্মিত হলে বাঙলার পালরাজত্ব কালে মহাযান বৌদ্ধমতে **তিনটি** ধারা গড়ে ওঠে। সেগুলি হলো : ১. বজ্রযান ২. কালচক্রযান এবং ৩. সহজযান।

সহজযান বজ্রযানের অন্তিম অধ্যায়। এ দেবদেবী, পূজা-আচার-মন্ত্র ইত্যাদি সব রকমের বাহ্যিক অনুষ্ঠান ও ধর্মকর্মের বিরোধী। তবুও বজ্রযানের সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল রয়েছে—দুয়ের সাধনপদ্ধতি অভিন্ন। এমনকি বজ্রধর বা বজ্রসত্ত্বকে তারা মানে। সহজযানের প্রচারক্ষেত্র নেপাল ও তিব্বত। তাই এর শাস্ত্রগুলো তিব্বতী ভাষায় অনূদিত ও রক্ষিত। আমাদের দোহাকোষ ও চর্যাপদগুলো সহজযানী সিদ্ধাদের লেখা। চর্যাপদে বামাচার ও প্রকৃতি বর্জিত সাধনার মিশ্রণ আছে। সহজযান মতেও প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলনজনিত সামরস্য থেকেই মহাসুখরূপ সহজের উদ্ভব। এটিই বোধিচিত্ত। বৌদ্ধ চৌরাশীসিদ্ধার সবাই সহজিয়া ছিলেন না। তার প্রমাণ গোরক্ষ-মীননাথ কাহিনী—এঁরা প্রকৃতিবর্জিত পরম যোগী। আবার কেউ কেউ ছিলেন সহজিয়া। অনেকে মনে করেন চর্যাপদ রচয়িতা সিদ্ধাচার্যগণের দ্বারাই সহজযান গড়ে উঠেছে।

এমন মনে করার কারণ এই যে, চর্যাপদগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় "'সহজ' এমন একটি অবস্থা যা পেলে সাধকের মায়িক জগতের জ্ঞান সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। তখন আর আত্মপর ভেদজ্ঞান থাকে না, সংস্কার বিনষ্ট হয়, ভবমোহ বিলুপ্ত হয় এবং

শূন্যতা-স্থান লাভ হয়। সে-অবস্থা যে সুখে পর্যবসিত হয় তা হচ্ছে সহজ সুখ। সাধক তখন সেই সুখে তন্ময় হয়ে উন্মত্তবৎ অবস্থান করেন, বহির্জগতের কিছুই তাঁকে সেই সুখ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। সে অবস্থা না লাভ করতে পারলে সাধকের মুক্তি লাভ হয় না।" চর্যাপদগুলো থেকে এমনও বোঝা যায় যে ঐ সময় সহজযানীদের মধ্যে দ্বিবিধ সাধনপদ্ধতির প্রচলন ছিলো; একটি মৈথুনাত্মক তান্ত্রিক পদ্ধতি, অপরটি প্রকৃতিবর্জিত—বিশুদ্ধ যোগ-প্রণালী, হঠযোগের [চন্দ্র-সূর্য] মাধ্যমে দেহ বা কায়াসাধনই ছিলো এদের লক্ষ্য।

ব্রহ্মজ্ঞান যেমন তুরীয় অবস্থা সহজজ্ঞানও সেইরূপ চতুর্থ এবং চরম আনন্দ। চার প্রকারের আনন্দ হচ্ছে: প্রথমানন্দ, পরমানন্দ, বিরমানন্দ, ও সহজানন্দ। সাধকের অনুভূতির চারটি স্তর আছে। প্রত্যেক স্তরেই বিশেষ আনন্দ অনুভূত হয়। চতুর্থ স্তরই চরম, এবং সেই স্তরের আনন্দই হচ্ছে সহজানন্দ। বিন্দু ধারণ ও ঊর্ধ্বে সঞ্চালন করে সহস্রার মধ্যে নিয়ে সচ্চিদানন্দ রূপ 'মহাসুখ' ও 'সহজানন্দ'-এর অবস্থা সৃষ্টি করাই এর লক্ষ্য। এটিই নির্বাণানন্দ তথা শূন্যতা।"

৭৩ **সৈয়দ মুর্তজা:** সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে [১৬৬৪?] সৈয়দ [গাজী, আলি] মূর্তজা নামক একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব পদকর্তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যিনি ধর্মে মুসলমান। 'পদকল্পতরুতে' এঁর মাত্র একটি পদ সংগৃহীত হয়েছে অথচ চট্টগ্রাম থেকে ঐ একই নামে আরো অনেকগুলি পদ সংগৃহীত হয়। একারণে সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেউ কেউ দু-জন মূর্তজার অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে আমল দিতে চান। 'পদকল্পতরু'র পদটি পশ্চিমবঙ্গ থেকে সংগৃহীত, ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয়ের 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' [৩য় খণ্ড] গ্রন্থে ২২টি পদ ধৃত আছে।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ্ নিখিলনাথ রায় তাঁর সম্বন্ধে যে তত্ত্ব সংগ্রহ করেছেন তা এই রকম: "এঁর পিতৃভূমি উত্তরপ্রদেশের বেরিলি। পিতা সৈয়দ হাসানই মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরের অন্তর্গত বালিয়াঘাটাতে বসবাস করতে থাকেন। আনন্দময়ী নামে এক ভৈরবী সাধিকা মূর্তজার সঙ্গিনী ছিলেন। মুর্তজার পীরের নাম সৈয়দ আবদুল রাজ্জাক শাহ। মূর্তজা একজন উদাসীন সাধক ছিলেন। কেউ কেউ এঁকে গজল গায়ক বলে উল্লেখ করেছেন। এ-কারণেই তাঁর নামের সঙ্গে 'আনন্দ' যুক্ত হয়েছে।"

'পদকল্পতরু'র পদটি এবং চট্টগ্রামের পদগুলি বিচার করলে উভয়ের ভাব সাদৃশ্যে, তন্ময়তার পরাকাষ্ঠায় এবং সার্থক গীতি কবিতার মতো আত্মগত গীতোচ্ছ্বাসের উল্লাসে মূর্তজা নামে একজন কবিকেই স্বীকার করে নিতে হয়। যথোচিত শব্দ চয়ন, আবেগের নিঁখুত প্রকাশে এবং সর্বোপরি বৈষ্ণবীয় বিনয়ের সৌন্দর্যে তাঁর পদগুলি অপূর্ব শ্রীলাভ করেছে। 'মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে মর্তুজাই সর্বশ্রেষ্ঠ'—এই মন্তব্যকে স-শ্রদ্ধায় গ্রহণ করতেই হয়।

৭৪ **'সুভাষিতরত্নকোষ' / কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়:** প্রথমে একটি খণ্ডিত পুঁথিকে প্রয়াত F. W. Thomas সম্পাদনা করে প্রকাশ করার সময় নাম দেন 'কবীন্দ্রবচন-

সমুচ্চয়', পরে যখন সম্পূর্ণ পুঁথিটি পাওয়া গেল তখন দেখা গেল যে এর পূর্ণ নাম হচ্ছে 'সুভাষিতরত্নকোষ' ;—অর্থাৎ সমগ্র সংকলন গ্রন্থের নাম 'সুভাষিতরত্নকোষ', আর তার খণ্ডিত সম্পাদিত অংশের নাম 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়'। মোটামুটি ভাবে ধারণা করা গেছে যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে এই কবিতাগুলি রচিত ও সংকলিত হয়েছিলো। এগুলি ছোটছোট কবিতার সমষ্টি। এর মধ্যে দিয়ে বুদ্ধবন্দনা, প্রকৃতি বর্ণনা, আদিরস, বাস্তব-জীবন সবকিছুকেই লিরিক প্রতিভায় ধরবার চেষ্টা আছে। বাঙালী জাতি-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে লিরিক উপাদান বহু প্রাচীন কাল থেকেই সক্রিয় ছিলো তা এই প্রকীর্ণ বা চুটকি কবিতাগুলি পাঠ করলেই বোঝা যাবে।

এদের ভাষা সংস্কৃত, কবির সংখ্যা প্রায় শতাধিক। তার মধ্যে কালিদাস-ভবভূতিসহ মধুশীল, বীর্য মিত্র, শ্রীধর নন্দী, শ্রীপাশ বর্মা, অপরাজিত রক্ষিত প্রমুখ অসংখ্য বাঙালী কবি রয়েছেন। এই কবিতা সংকলনের পুঁথিটি নেপাল থেকে সংগ্রহের সময়েও কে যে এর সংকলক তা জানা যায়নি। প্রসঙ্গত বলা ভালো যে, এই সংকলনের অনেক কয়জন কবিই ছিলেন বৌদ্ধ। সম্প্রতি ড. সুকুমার সেন মহাশয় বলেছেন যে, 'পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ যে পুঁথিটি পাওয়া গেছে [যার নাম 'সুভাষিতরত্নকোষ'] সেখানে সংকলকের নাম পাওয়া গেছে—বিদ্যাকর ইনি সৌগত [অর্থাৎ বুদ্ধোপাসক]। এই সংগ্রহ হইতেই তৎকালীন বাঙালীর সাহিত্যের রুচি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যাইতেছে। বাঙালী একদিকে যেমন টুক্‌রা কবিতায় বাস্তব চিত্রণে কুশলতা অর্জন করিয়াছিল, তেমনি আদিরসাত্মক কবিতার প্রতিও তাহার আসক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। …'কবীন্দ্রবচনে' ['সুভাষিতরত্নকোষে'] রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা-বিষয়ক অনেকগুলি শ্লোক সংযোজিত হইয়াছে, বাঙলাদেশের পরবর্তী সংস্কৃতির সহিত এইখানে ইহার আত্মীয়তার যোগ রহিয়াছে। লক্ষ্মণসেনের রাজসভাকে কেন্দ্র করিয়া যে আদি রসাত্মক ভক্তিবাদের ধারা প্রবাহিত হয়, তাহার উৎস এই 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে'র ['সুভাষিতরত্নকোষ'] রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক শ্লোকের মধ্যেই নিহিত।"

৭৫. অনর্ঘরাঘব / মুরারি মিশ্র : খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষে অথবা নবম শতাব্দীর সূচনায় কবি মুরারি মিশ্র তাঁর 'অনর্ঘরাঘব' নাটকটি রচনা করেন। কবির জীবন পরিচয় সম্বন্ধে বিশেগ কিছু জানা না গেলেও এটুকু খবর আছে যে কবির পিতার নাম শ্রীবর্ধমানক ও মাতার নাম তন্তুমতী দেবী। অনেকে নাট্যকারকে বাঙালী বলতে চান, কিন্তু এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার মতো কোনো তথ্য বা যুক্তি আমাদের হাতে নেই। আমরা মুরারির যে কাল নির্ণয় করেছি যে সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বলছেন যে, ভবভূতি এবং কাশ্মীরের কবি রত্নাকরের মধ্যবর্তী সময়ে মুরারি আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর আমরা জানি যে কবি রত্নাকর কাশ্মীর রাজ অবন্তি বর্মণের [খ্রী. ৮৫০-৮৮৪] সমসাময়িক।

ভবভূতির 'মহাবীরচরিত' নাটকের প্রতিস্পর্ধী হিসাবে মুরারির অনর্ঘরাঘবকে

রচনা করা হয়েছিলো। এই প্রতিস্পর্ধা নিজেকে 'বালবাল্মীকি' হিসাবে ঘোষণার মধ্যে দিয়েও নাট্যকার প্রকাশ করেছেন।

কোন কোন সমালোচকের মতে যেহেতু সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির যুগে অনর্ঘরাঘব লেখা হয়েছিলো, সে কারণে এতে ভাষা-অলঙ্কারের আড়ম্বরই কেবল প্রকাশ পেয়েছে—সাহিত্যগুণ সে-পরিমাণে ন্যূন। আবার কারো মতে, সাত অঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকটি একদিকে যেমন কাব্যগুণযুক্ত অন্যদিকে তেমনি নাট্যকারের পাণ্ডিত্যেরও প্রকাশক। তিনি উপমা-রূপক ইত্যাদি অলঙ্কার ব্যবহারে যেমন অভিনবত্ব দেখিয়েছেন, তেমনি রসপ্রাশনেও নাট্য-পাঠককে অপরিতৃপ্ত রাখেননি। অবশ্য নাট্যকার পৌনপুনিকতার মুদ্রাদোষকেও একেবারে অতিক্রম করে যেতে পারেননি। মুরারি প্রসঙ্গে আরও একটি শ্লাঘার কথা উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন আলঙ্কারিক কাব্য-ব্যাকরণগত বিচার প্রসঙ্গে মুরারিকে standard হিসাবে নানা ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছেন। এবং সর্বোপরি নাগোজী ভট্ট [Nagoj ibhatta] তাঁর সিদ্ধান্ত কৌমুদী গ্রন্থে বিভিন্ন প্রসঙ্গে মুরারিকে বারে বারে উদ্ধৃত করেছেন। ভারতীয় ঐতিহ্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় বিষয় রামকথা মুরারির নাট্যপ্রসঙ্গ হওয়ার ফলে রামকথানির্ভর অপরাপর কাব্যনাটকের মধ্যে অনর্ঘরাঘবের বহু অংশই মিশে গেছে। এ-কারণেও কোন কোন সাহিত্য সমালোচক মুরারির পাওনা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাম দিতে চাননি।

৭৬. **ভবানন্দের 'হরিবংশ'** : পূর্ববঙ্গের কয়েকটি অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত কিছু পুঁথি অবলম্বনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩২ সালে সতীশচন্দ্র রায় 'হরিবংশ' নামে একটি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য সম্পাদনা করেন। এই কাব্যের কবি নিজেকে অনেক শিবানন্দের পুত্র এবং 'দীন' ভবানন্দ বলে উল্লেখ করেছেন। এ-ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

কবি কোন্ সময়ের, কোন্ স্থানের মানুষ ছিলেন তারও কিছুই জানা যায় না। তবে তাঁর কাব্যের আভ্যন্তর ও অপরাপর পারিপার্শ্বিক তথ্য-বিচারে বলা যায় যে তিনি সম্ভবত সিলেট বা কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের লোক ছিলেন এবং আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশে আবির্ভূত হন। এবং কবির দাবি যে কবি দীন ভবানন্দ 'সত্যবতী'পুত্র ব্যাসদেবের সংস্কৃত হরিবংশকে 'লোক বুঝাইবা'র জন্য সরল বাঙলায় সংক্ষেপে রচেছেন। কিন্তু এই বক্তব্য সত্য নয়—তিনি 'হরি'র কৃষ্ণ অবতার ও ঐ অবতারের সঙ্গিনী রাধাকে নিয়ে কামলীলা রচনা করেছেন। সেদিনের অধিকাংশ নিরক্ষর মানুষের স্থূল রুচিকে—কবি হিসাবে যে সামাজিক দায়িত্ব থেকে, পরিমার্জিত করা উচিত ছিলো তা না করে তাদের রুচিকে কামচর্চার সুলভ আসরে বসিয়ে দিয়েছিলেন। কবি ভবানন্দের কলমের জোর ছিলো, প্রতিভাও ন্যূন ছিলো না, পূর্ববর্তী বৈষ্ণব কাব্যধারার সঙ্গে রীতিমতো যোগও ছিলো, বাৎসায়ন থেকে আরম্ভ করে ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য পর্যন্ত তাঁর অধিগম্যতাকে মর্যাদাও দিতে হয়, কিন্তু এক বালতি দুধে এক ফোঁটা অম্লরসের মতো ভবানন্দের স্থূল কামকেলী বিস্তারের ইচ্ছা তাঁর সমস্ত অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট

করে দিয়েছে। ভবানন্দের কাব্যের আধুনিককালের সম্পাদক দীর্ঘ ভূমিকার সাহায্যে এই 'দীন' কবিকে পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছেন, কিন্তু ঐ বিশেষণের একটি শব্দও তাঁর প্রাপ্য নয়। একটু পাশ কাটিয়ে বলা যেতে পারে যে ভবানন্দের আলঙ্কারিক কৌশল, স্বচ্ছন্দ ছন্দ ব্যবহার এবং তার প্রবহমাণতা, বিশেষভাবে রাধার চরিত্র সৃষ্টি বিষয়ে তিনি কিছু কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। তাঁর কাব্যের প্রাচীনতম পুঁথির লিপিকাল অনুমান করা গেছে ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দ।

৭৭ **'শিবসংকীর্তন'**: মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত চেতুয়া বরদায় [তৎকালের নাম কর্ণগড়] রামেশ্বর চক্রবর্তী [ভট্টাচার্য] মোটামুটিভাবে ১৭১২ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁর 'শিব পাঁচালী' কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের প্রকৃত নাম 'শিবসংকীর্তন'। কবি রামেশ্বর তাঁর পুঁথির মধ্যে কোথাও এই কাব্যটিকে 'শিবায়ন' বা 'শিবমঙ্গল' বলে আখ্যাত করেননি। মনে হয় রামায়ণের অনুষঙ্গে এর নাম 'শিবায়ন' হয়েছে।

কবির পিতার নাম লক্ষ্মণ এবং মাতার নাম রূপবতী। কবির দুই বিবাহ—সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী। কবিরা দুই ভাই ও তিন ভগিনী। কবি যে আত্মপরিচয় রেখে গেছেন তা থেকে জানা যায় যে কবি ছিলেন অপুত্রক। কবির পৈত্রিক বাসভূমি ছিলো উক্ত জেলার ঘাটালের কাছে যদুপুর গ্রামে। তিনি বর্ধমানের প্রভাবশালী জমিদার শোভাসিংহের ছোট ভাই হেমন্ত বা হেমৎ সিং কর্তৃক কোন কারণে তাঁর পৈত্রিক বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হন এবং ঐ জেলারই কর্ণগড়-এর রাজা রামসিংহের আশ্রয়ে চলে আসেন। পরে ঐ স্থানেরই পরবর্তী বিদ্যোৎসাহী রাজা যশোবন্ত সিংহের অনুপ্রেরণায় কবি তাঁর 'শিব-সংকীর্তন' কাব্য রচনা করেন। কবি একখানি 'সত্যপীরের পাঁচালী'ও রচনা করেছিলেন। কবির এই 'শিব-সংকীর্তন' কাব্য বটতলা থেকে আশু মুদ্রণ-সৌভাগ্য লাভ করে বহুল প্রচারিত হয়।

কবি তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছিলেন 'শিব সংকীর্তন'—সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। তথাপি এ মঙ্গলকাব্য। কারণ, ১. অপরাপর মঙ্গলকাব্যের মতোই এও প্রত্যেক দিন দু পালা করে আটদিনে ষোল পালায় ভাগ করে আলাদা আলাদা ভাবে গান হতো। ২ এ-ছাড়াও শিবের সংসার, মদনভস্ম, শিবের বিবাহ, সাধভক্ষণ, জাগরণ-পালা, স্থাপনা পালা ইত্যাদি মন অনেক লক্ষণ আছে যাতে একে মঙ্গলকাব্য হিসাবেই গ্রহণ করা যায়। ৩. ফলে কবি 'শিব-সংকীর্তন' নাম দেওয়া সত্ত্বেও অপরাপর মঙ্গলকাব্যের দৃষ্টান্তে একে 'শিবমঙ্গল' কাব্যে নামে অভিহিত করা অসঙ্গত হয় নি। এই কাব্য মেদিনীপুর অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত এবং সেখানে এ 'শিবায়ন' নামেই প্রসিদ্ধ।

কবি রামেশ্বরের সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অধিকার ছিলো। তার ফলে বহু অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের সাহায্যে এমন সব অনুপ্রাসযুক্ত বাক্য রচনা করেছেন যেখানে কবিত্ব অপেক্ষা কষ্টসৃষ্ট পদ গঠনের ব্যায়ামই কানকে ক্লান্ত করে ফেলে। যেমন: 'ভাত নাই

ভবনে ভবানী বাণী বাণ। / চমৎকার চন্দ্রচূড় চণ্ডীপানে চান ॥/ পদ্মাবতী পার্বতীকে প্রবোধিয়া আনে।/ প্রাণনাথে কি প্রকারে ভেটিব সেইখানে ॥'—ইত্যাদি। পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনার অনেক জায়গাতেই কবি সংস্কৃত পুরাণ, এমনকি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' ইত্যাদি কাব্যের বাঙলা অনুবাদ করে দিয়েছেন। এতে কাব্যের পৌরাণিক অংশ আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে; কিন্তু শিবের লৌকিক জীবন-বর্ণনার অংশ কবির মৌলিক প্রতিভার শক্তিতে স্পষ্ট বলে তাঁর সরস শিল্পীচিত্তটিই সেখানে অত্যন্ত সার্থকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই অংশের ছবিগুলিতে যেভাবে গ্রাম্যতার রঙ ধরানো হয়েছে তাতে এ রূপক শিবেরই গান হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। "সেইজন্যই বলিতেছিলাম, তাঁহার রচনা যেমন মধুক্ষরাও নহে, তেমনি আবার 'ভদ্রকাব্য' বলিয়াও দাবী করিতে পারে না। তবে পৌরাণিক কাহিনীর অংশ চরিত্র-সৃষ্টি ও রচনার দিক দিয়া বৈশিষ্ট্য-বর্জিত হইলেও লৌকিক কাহিনীর অংশ এই সকল বিষয়ে কতকটা উল্লেখযোগ্য।...পার্বতীর গৃহস্থালী বর্ণনার চিত্রের মধ্যে কবিচিত্তের একটি সহজ আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবের সঙ্গে এই সকল চিত্রের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; সুদূর আদর্শলোক অপেক্ষা প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বাস্তব লোকই কবির উপজীব্য; সেই কারণে বাঙালী পাঠকের হৃদয়কে ইহা অতি সহজেই স্পর্শ করিয়াছে।"

৭৮. **মুসলমান বৈষ্ণবপদ রচয়িতা**ঃ 'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' উপদেশকে মান্য করতে গিয়ে পদাবলীর যোগান আবশ্যিক হয়ে ওঠে। অবশ্য এই পদ বা পদাবলী [বহুবচনে : যার অর্থ 'গেয় কবিতার সমষ্টি'] বাঙালীর কাছে নতুন কিছু নয়। বেশি দূরে না গিয়ে অন্তত জয়দেবের 'মধুরকোমলকান্ত' পদাবলীর উদাহরণ বাঙালীর কাছে বেশ উজ্জ্বল এবং বহু পরিচিত অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। সেখানে বা তার কিছু আগে থেকেই দেখতে পাচ্ছি যে গানের জন্যে তৈরি এবং সুর ও তাল সহযোগে গেয় ছোট ছোট স্তবক সমূহ-ই 'পদাবলী' নামে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই জনপ্রিয়তার অংশভাক হয়েছিলেন সে দিনের বাঙলার হিন্দু এবং মুসলমান সবভাবেই। জনৈক ব্রজসুন্দর সান্যাল 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' নামে চারখণ্ডে মোট তেতাল্লিশ জন কবির বৈষ্ণব পদ সংকলন করেছেন। এ-ছাড়াও রমণীমোহন মল্লিক সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' এবং অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' গ্রন্থে অনেকজন মুসলমান কবির পদের উদ্ধৃতি ও আলোচনা আছে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে বেশ কিছু মুসলমান কবি ও ভক্ত হিন্দু-বৈষ্ণব কবিদের মতোই যথেষ্ট পারদর্শিতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন। এঁদের অবদান বাঙলা সাহিত্যে যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়, তেমনি তাঁদের কবি-প্রতিভার বৈচিত্র্য ও বিস্ময়করতাও বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। উক্ত বৈষ্ণব ভাবাপন্ন অথচ ধর্মে মুসলমান কবিগণ বাইরে থেকে নিজস্ব ধর্মাচরণ করলেও অন্তরে প্রেমের সত্যকে উপলব্ধি করে লিখেছেন : 'পুরুষ

দিশা হরিকো বাসা পশ্চিম অলহ মুকামা।/ দিলমেঁ খোজি দিলহিমে খোজো ইহৈ করীমা রামা' ॥ [অর্থাৎ পূর্বদিকে হরির বাস, পশ্চিমে আল্লার মোতাম। হৃদয়ে খুঁজিয়া হৃদয়ের মধ্যেই খোঁজ, সেইখানেই করীম ও রাম]। এই ধরণের অসাম্প্রদায়িকতা ও উদার মানবতার "বশবর্তী হয়ে অনেক বাঙালী মুসলমান কবি বৈষ্ণবভাবের পদ লিখে বিচিত্র-বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। এঁরা পদকার হিসেবে এমন আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন যে, প্রাচীন বৈষ্ণব পদসঙ্কলন গ্রন্থ—যেমন, 'পদকল্পতরু' ইত্যাদিতে তাঁদের দু-একটি পদ গৃহীত হয়েছে।"

'বাঙলা দেশের মুসলমান সমাজ কীভাবে সাহিত্য, সংস্কৃতিসাধনায় বাঙালী হিন্দুর ধারা অনুসরণ করিয়াছিলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের সমন্বয় পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস বিস্ময়কর। এই মুসলমান কবিগণ ইসলাম ধর্মাবলম্বী হইলেও হিন্দুর ধর্মদর্শন ও হিন্দুর দেবদেবীকে হিন্দুর মতোই শ্রদ্ধা করিয়াছেন, সাহিত্যে—[এখানে বৈষ্ণবপদসাহিত্যে] তাহার স্বীকৃতি রাখিয়া গিয়াছেন।··· ···আধুনিক যুগে ঐসব বৈষ্ণবপদগুলির প্রতি কাব্যরসিকের দৃষ্টি যখন আকৃষ্ট হইল, তখন অনেকে এই পদের অভিধা লইয়া কিঞ্চিৎ গোলে পড়িলেন। পদগুলি তো বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের রচনা, উহার রচনারীতি ও অন্তর্নিহিত ভক্তি তাহাই নির্দেশ করিতেছে। অথচ কবিগণ মুসলমান—ভণিতাই তাহার প্রমাণ। তাঁহারা রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গের জয়গান করিলেও কেহ আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হন নাই।'

এই জটিল প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান আমাদের লক্ষ্য নয়। আমরা দেখছি বিশিষ্ট সাহিত্য-গবেষক আহমদ শরীফ তাঁর সাম্প্রতিক সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য'-এ প্রায় ১৯ জন বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবির নাম ও পরিচয় প্রদান করেছেন। এঁদের মধ্যে আকবর আলী, আফজল আলী, আলী রাজা, গেয়াস খান, চাঁদ কাজী, নাসির মুহম্মদ, সৈয়দ নাসিরউদ্দীন, সৈয়দ মুর্তজা, মীর্জা কাঙালী, সৈয়দ সুলতান প্রমুখ প্রধান। এখানে আমরা ২১ জন কবির দু-একটি চরণ উদ্ধৃত করে বৈষ্ণব-মুসলমান কবির পদ-রসাস্বাদনের তৃষ্ণা দূর করার চেষ্টা করবো। আলী রাজা লিখছেন: 'হীন আলীরাজা ভণে/এই শ্রদ্ধা কায়মনে/ ঐ রাঙা চরণে হই বেণু।'

"কবি গয়াজের একটি বিরহের পদ উল্লেখ করি। বিরহিণী রাধার শীর্ণ মূর্তি ও মনের অভিমান বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি লিখছেন: 'কনক অঙ্গুরি ছিল/ সে পুণি বলয়া ভেল/সে বলয়া হৈয়া গেল তাড়।/প্রভুরে কি দিমু গালি/যদি না আইসে আজি কালি/ পরাধীনী জীবন অসার॥' রাধা কৃষ্ণবিরহে ধীরে ধীরে শীর্ণ হইয়া পড়িতেছেন, যে অঙ্গুরি আঙুলে শোভা পাইত, রাধার বাহু এত শীর্ণ হইয়া গেল যে, সেই অঙ্গুরি বাহুর বলয় হইয়া পড়িল। ক্রমে আরো শীর্ণ হইয়া পড়িলেন, বাহুর বলয় আরও উপরে উঠিয়া তাড় [তাগা] হইয়া পড়িল। এই বর্ণনাটির চমৎকারিত্ব বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।"

৭৯. নেপালে প্রাপ্ত বাঙলা নাটক : নেপালের রাজদরবারে নাট্যচর্চা বেশ পুরাতন। প্রথমদিকে অভিনীত নাটকগুলির সবই ছিলো সংস্কৃতে রচিত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দেশী ভাষা আপন অধিকার বিস্তার করে। এই নাটকগুলি সবই ছিলো গীতিনাটক। এবং ঐ নাট্যান্তর্গত গানগুলি প্রায় সবই বাঙলায় লেখা। এমনকি 'প্রায় গোটাগুটি বাঙলায় অথবা মৈথিলে লেখা নাটপালাও মিলছে।' এই নাটকগুলি সম্পর্কে আমরা ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নেপালে বাঙ্গালা নাটক' [১৩২৪] গ্রন্থটি থেকে সুবিস্তারিতভাবে অনেক কিছু জানতে পারি। আমরা এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো।

প্রথমত, ললিতাপুরের [নেপালের অন্তর্গত তিনটি রাজ্যপাটের অন্যতমের রাজধানী] রাজা সিদ্ধিনরসিংহ-মল্লের রাজত্বকালে ১৬৫১ খ্রীস্টাব্দে লেখা রামভদ্রের 'হরিশ্চন্দ্র নৃত্য'। 'এই নাট্যপালায় প্রচুর সংস্কৃত শ্লোক আছে। ভাষায় [মৈথিল-ব্রজবুলি-বাঙলা] পদ এবং ব্যাখ্যা-ব্যাখ্যান ও সংলাপ আছে।'

দ্বিতীয়ত, ঐ একই রাজার রাজত্বকালে আরও একটি নাটক পাওয়া গেছে ; নাম 'গোপীচন্দ্র নাটক'। 'এ-নাটকটি আকারে বড়, প্রকারে সংহত। অঙ্কে বিভক্ত, অঙ্ক আবার দৃশ্যে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কে এগারটি দৃশ্য। আরম্ভে কয়েকটি ছাড়া সংস্কৃত শ্লোক পরে প্রায় নেই। ভাষা বাঙলা বেশির ভাগ পদ্য ও সংলাপ। গান আছে, অধিকাংশই ধুয়া অথবা ভণিতাহীন ছোট পদ। প্রথম অঙ্কে বিদ্যাপতি ভণিতায় ও কৃষ্ণদাস ভণিতায় একটি করে পদ আছে।

তৃতীয়ত, ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে 'হরিশ্চন্দ্র নৃত্য' নাটকের রচয়িতা রামভদ্রের লেখা আরো একটি বড় নাটক পাওয়া যাচ্ছে ; নাম 'ললিত কুবলয়াশ্ব মদালসাহরণোপাখ্যান শিবমহিমা নাটক'। এটিও আকারে গোপীচন্দ্র নাটকেরই মতো বৃহৎ।

চতুর্থত, নেপালের অন্যতম শরিক ভাতগাঁও-এর জয়জগজ্জ্যোতির্মল্লও নাটক রচনায় ও প্রয়োগে ললিতাপুরের পূর্ববর্তী এবং অধিক আগ্রহী ছিলেন। এঁর লেখা [হয়তো সভাকবিরা লিখে এঁর নামে চালিয়েছেন] ১৬২৮ ও ১৬২৯ পর পর দু-বছরের লেখা দুটি নাটক পাচ্ছি। প্রথমটির নাম 'মুদিতকুবলয়াশ্বনাটক' এবং দ্বিতীয়টির নাম 'হরগৌরী-বিবাহ নাটক'। জয়জগজ্জ্যোতির্মল্লের নামে আরও একটি নাটক পাওয়া যাচ্ছে—নাম 'কুঞ্জবিহারী নাটক।'

এইগুলি ছাড়া নেপালে প্রাপ্ত বাঙলা নাটকগুলির মধ্যে আরও নাটকের উল্লেখ করে থাকেন—সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ। এ-প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন আমাদের জানাচ্ছেন : "শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক গুরু মীননাথের উদ্ধার বিষয়ে সবচেয়ে পুরানো প্রাপ্ত গ্রন্থ হইল বিদ্যাপতির 'গোরক্ষবিজয়' নাটক। একটি মাত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে নেপালে। পুঁথিটি মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প খণ্ডিত। এমনিও অনেক ছাড়বাদ আছে বলিয়া মনে হয়।...ক্ষুদ্র রচনাটি চার ভাষায় লেখা—সংস্কৃত, প্রাকৃত, মৈথিল [অবহট্ঠ

ও বাঙলা। কাঠামো সংস্কৃত নাটকের মতো, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ব্যবহারও তদনুযায়ী। কেবল গানগুলি মৈথিল-ব্রজবুলিতে ও বাঙলায়।"

৮০. **মৈমনসিংহ গীতিকা / পূর্ববঙ্গ গীতিকা :** 'বাঙলাদেশ [অধুনা 'বাঙলাদেশ' রাষ্ট্র নয়—সমগ্র বঙ্গভূমি] থেকে এ-পর্যন্ত যে-সমস্ত গীতিকা সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১ নাথ-গীতিকা। ২ মৈমনসিংহ গীতিকা। ৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে যে চার খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে. তাদের দুই-তৃতীয়াংশ গীতিকাই মৈমনসিংহ জেলা থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে, অতএব এদের এই দুই-তৃতীয়াংশ গীতিকাও মৈমনসিংহ-গীতিকারই অন্তর্ভুক্ত।'

গীতিকা হলেও নাথগীতিকাগুলির সঙ্গে পূর্ববঙ্গ বা মৈমনসিংহ গীতিকার বিষয়বস্তুগত, উদ্দেশ্যগত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রসগত বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। তা-ছাড়া আমাদের আলোচ্য ভিন্নতর বিষয় বলে, আমরা নাথ-গীতিকা সম্পর্কে এখানে কিছু বলা থেকে বিরত থাকলাম।

মৈমনসিংহ জেলার অধিবাসী কেদারনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় 'সৌরভ' নামে যে মাসিকপত্র প্রকাশিত হতো তার ১৯১৩ সালের এপ্রিল সংখ্যায় জনৈক চন্দ্রকুমার দে 'মালীর জোগান' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এর দু এক বছর আগেও উক্ত চন্দ্রকুমার ঐ 'সৌরভ' পত্রিকায় দু চারটি পালা ও তার পরিচয় প্রকাশ করেন। সেই সূত্র ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রধান ড. দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় চন্দ্রকুমারকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে মৈমনসিংহ থেকে পালা সংগ্রহের জন্য বেতনভুক কর্মী হিসাবে নিয়োগ করেন। ফলে, অচিরকাল মধ্যেই 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'জয়চন্দ্র-চন্দ্রাবতীর পালা', 'দেওয়ান ভাবনা', ইত্যাদি প্রায় বাইশটি পালা সংগৃহীত হয়। এরপর পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল (মূলত মৈমনসিংহ) থেকে পালা সংগ্রহের জোয়ার বয়ে যায়। "বিহারীলাল সরকার, আশুতোষ চৌধুরী, নগেন্দ্রচন্দ্র দে, মনোরঞ্জন চৌধুরী ; কবি জসিমুদ্দিন, প্রমুখ সংগ্রাহকের দ্বারা দীনেশচন্দ্র আরও অনেক পালা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ক্রমে ১৯২৩ হইতে ১৯৩২ সালের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দীনেশচন্দ্রের সম্পাদনায় বিস্তারিত ভূমিকাসহ 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' প্রকাশিত হয়। অবশ্য প্রথমে প্রতিখণ্ডের ইংরাজী অনুবাদ ও ভূমিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তারপর বাংলা পালাগান ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়।

'চারিখণ্ডে প্রকাশিত এই পালাসংগ্রহের প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগ ইংরাজীতে *Eastern Bengal Ballad—Mymensingh* [*Vol. I. Part I*, 1923] এই নামে প্রকাশিত হয়। ইহার বাংলা সংস্করণ 'ময়মনসিংহ গীতিকা', প্রথমখণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা নামে মুদ্রিত হয় [১৯২৩]।" ইংরাজী সংস্করণে ছিলো ভূমিকা আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' [৩ সংস্করণ ১৯৫৮] নামের

বইতে যে দশটি পালা ছাপা রয়েছে তারই গদ্যানুবাদ। বাংলা বই-এর ভূমিকা ইংরাজী সংস্করণেরই অনুরূপ।

এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে চার খণ্ডে মৈমনসিংহ গীতিকা বা পালা প্রকাশিত হয়েছিলো তার প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যার নামই কেবল রাখা হয়েছে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' [*Eastern Bengal Ballads—Mynensingh* : Vol. I, Part 1]। এবং বাকী তিনটির নাম হয়েছে যথাক্রমে : 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা', ২ খণ্ড, ২ সংখ্যা : পালা সংখ্যা চৌদ্দ [*Eastern Bengal Ballads*, Vol. II, Part I]; 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা', ৩ খণ্ড ২ সংখ্যা : পালা সংখ্যা এগার [*Eastern Bengal Ballads*, Vol III, Part I] এবং 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা', ৪ খণ্ড, ২ সংখ্যা উনিশ [*Eastern Bengal Ballads* Vol. IV, Part I]।

বাঙলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাসে দু-একটি ছাড়া সমস্ত নারী-চরিত্রই পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, কিন্তু মৈমনসিংহের এই গীতিকাগুলিতে নারীর স্বাধীন প্রেমের জয় ঘোষণা করা হয়েছে। লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকার কারণে এইসব গীতিকাগুলির ভাষা, ছন্দ, গঠন ইত্যাদিতে আধুনিক শহরের শিক্ষিত মানুষের কলমের পালিশ পড়েছে। ফলে, এদের প্রকৃত চেহারা কোন কোন ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য রকমের পরিবর্তিত হলেও, সমস্ত কাব্য-উপকরণগুলির আস্বর-সৌরভকে খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না। এইগুলি আবিষ্কার এবং সুষ্ঠুভাবে বাঙলা ও ইংরাজী অনুবাদের মাধ্যমে প্রকাশ করায় দেশ-বিদেশের রসিক সমাজের সামনে বঙ্গ-সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক উদ্ঘাটিত হতে পেরেছে। তাই গীতিকাগুলির প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্রের এই দান আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

৮১. **মুকুন্দরামের গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ** : বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগের একটি বিশিষ্ট ও বহুপল্লবিত কাব্যশাখা হলো মঙ্গলকাব্য। দেব-প্রশস্তিমূলক এবং সুনির্দিষ্ট কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ সমন্বিত এই ধরনের কাব্য বোধহয় আর কোন ভাষায় প্রচলিত নেই। তা ছাড়া দেব-সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণী। নাগরিক লৌকিক দেব-দেবীদের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের লড়াই-এর কথা বলতে গিয়ে সেদিনের সমাজের অনেক সত্যচিত্রও কাব্যদেহে লগ্ন হয়ে গিয়েছে। এই ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্যও মঙ্গলকাব্যগুলি বিশেষ সমাজ-ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রণীত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের অন্তর্গত গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণটিকে বিচার করতে হবে।

মঙ্গলকাব্যের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি এই রকম : ১. গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা। ২. গ্রন্থোৎপত্তির কারণ। ৩. দেবখণ্ড বা সৃষ্টিরহস্য এবং শিবের সংসারের কাহিনী বর্ণনা। ৪. নরখণ্ড বা যে দেবতার পূজা প্রচারিত হবে সেই প্রচার-কার্য চালাবার জন্য স্বর্গের কোন দেবতার শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যে আগমন।

৫. অষ্টমঙ্গলা ও নায়ক-নায়িকার স্বর্গারোহণ। অতএব দেখা যাচ্ছে যে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ মঙ্গলকাব্য রচনার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির একটি প্রধান উপায়। কারণ, এই অংশে কবি শুধু শুধু বা অনাবশ্যকভাবে উদ্দিষ্ট দেবতার বন্দনা গান করেছেন না—ঐ দেবতা স্বপ্নে তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন বলেই তিনি এই কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন। স্বপ্ন-লব্ধ মাদুলির মতই, এই কাব্যও প্রত্যক্ষ শক্তিধর ও শুভদায়ক।

মুকুন্দরামের দেওয়া গ্রন্থোৎপত্তির কারণে এই মাত্রা যুক্ত থাকলেও অতিরিক্ত আর একটি তাৎপর্য এই যে, এর মাধ্যমে 'বাস্তবতা, মানবধর্ম ও সাহিত্যরস উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে, তাঁর সমগ্র কাব্যেও ব্যক্তিগত মনের ঐ ভাব-ভাবনা কিঞ্চিৎ ছড়িয়ে পড়েছে—এটি বিস্ময়ের ব্যাপার সন্দেহ নেই। কেউ কেউ অবশ্য বলেন যে, কবির ব্যক্তিগত কথা কাব্যে প্রতিফলিত হওয়ার জন্য কাব্যের objectivity বা বস্তুগত বর্ণনা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এ-কথা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। কবির ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনা তাঁকে মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল করেছে, জীবনের প্রতি প্রসন্নতা সঞ্চার করেছে—গতানুগতিক সামান্য আখ্যান শিল্পরূপ লাভ করেছে।' এখানেই মঙ্গলকাব্যের অপরাপর কবির থেকে তাঁর মৌলিক পার্থক্য।

গণেশ বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা, লক্ষ্মী বন্দনা, চৈতন্য বন্দনা, শ্রীরামবন্দনা ও চণ্ডী বন্দনার পরেই কবি 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' বর্ণনা করেছেন। স্থানীয় ডিহিদার মামুদ সরিপের অবিচার ও অত্যাচারে কবি বর্ধমানের রত্নানদী তীরবর্তী দামুন্যা গ্রামের সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে সামান্য একটু আশ্রয় ও জীবনধারণের উপযোগী স্বল্প বিত্ত প্রাপ্তির আশায় মেদিনীপুরের 'আড়রা গ্রামে' উপস্থিত হয়েছেন। এই পলায়ন, পথের ক্লান্তি ও দুর্ভোগ, এবং স্বপ্নে চণ্ডীদেবী কর্তৃক তাঁর প্রশস্তিকাব্য-রচনার নির্দেশ দান এখানে ফটোগ্রাফিক প্রত্যক্ষতায় বর্ণিত হয়েছে ['আশ্রয়ি পুকুরআড়া/নৈবেদ্য শালুকনাড়া/পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে / ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে / নিদ্রা গেনু সেইখানে/ চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥/করিয়া পরম দয়া/দিয়া চরণের ছায়া/আজ্ঞা দিল করিতে সঙ্গীত।/করে লয়ে পত্র মসী আপনি কমলে বসি/নানা ছন্দে লিখিলা কবিত্ব ॥']। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মুকুন্দরামে বস্তুস্তূপ হয়ে থাকেনি,—যথার্থ শিল্পী কারিগরের মতো সহৃদয় পরিকল্পনার সাহায্যে তাকে কাব্যসৌধ হিসাবে গড়ে তুলতে পেরেছেন। কবি মুকুন্দরাম জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন, যার কিছু কথা 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণে' লিপিবদ্ধ রয়েছে,—সেই ব্যক্তি-দুঃখ তাঁর কাব্যের পাত্রপাত্রীর মধ্যে দিয়ে অনেকবার উচ্চারিত হয়েছে। এর জন্য কেউ কেউ তাঁকে দুঃখ বর্ণনার কবি বলেছেন। কিন্তু কথাটি যথার্থ নয়; কারণ, কেবল নীরস দুঃখের পুঞ্জীকরণের দ্বারা বড় কবি হওয়া যায় না,—যদি না তা অনুভবের স্তরে পৌছে সহানুভূতির জারক রসে জারিত হয়ে দুঃখের গান হয়ে ওঠে। সেই গানের 'স্থায়ী' হলো তাঁর এই **গ্রন্থোৎপত্তির কারণ** অংশটি। এই গান থেকেই কবিকঙ্কণের বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতার বহুবর্ণময় ও কবিত্বপূর্ণ ভাষার রস-মিছিল শুরু হয়েছে। এবং সেই মিছিল যত অগ্রসর হয়েছে ততই যোগ হয়েছে

যথার্থ শব্দ সংগ্রহ ও তাদের নিপুণ সংযোজনা, অলঙ্কারের কুশলী পরিবেষণা এবং অকপট ও সরল বর্ণনা। আসলে মঙ্গলকাব্যের সুনির্দিষ্ট ও প্রথাবদ্ধতার শৃঙ্খল মুকুন্দরামের অপূর্ব নির্মাণক্ষম প্রতিভার শক্তিতে তাঁর কাব্য-বনিতার চরণে চরণে নূপুর হয়ে বেজেছে। এবং সে নৃত্যের নাড়া বাঁধা হয়েছিলো আমাদের আলোচ্য 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশে।

☐ সমস্যা ☐

৮২. **বিদ্যাপতি সমস্যা / বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল:** কবি বিদ্যাপতি 'ঠক্কুর' [বাঙলায় 'ঠাকুর'] বাঙালী নন। কিন্তু তিনি বাঙালীর কবি। ইনি পাঁচ-শ বছরের বেশি সময় ধরে সৌন্দর্যোপভোগ এবং আদর্শের অনন্ত সত্যরূপজাত অমৃত বাঙালীকে পান করিয়ে এই জাতির হৃদয়াসনে সশ্রদ্ধ ও সম্প্রীতির আসন লাভ করেছেন। এমন যে জনপ্রিয়, সুরসিক ও পণ্ডিত কবি, তাঁকে নিয়ে অন্তত দুটি বড় সমস্যা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঘোর হয়ে আছে। বিষয় দুটি সম্পর্কে এখানে কিছু আলোচনা করা হলো। সমস্যা দুটি এই রকম: ক. 'আবির্ভাবকাল' নিয়ে, এবং খ. তাঁর রচিত পদাবলী কোন্‌গুলি বা তাদের বিশুদ্ধতা নিয়ে।

ক. 'বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল': বিদ্যাপতির নিশ্চিত বা প্রামাণ্য কোন জীবন-বৃত্তান্ত জানা যায় না। বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন কালের অধিকাংশ কবিদের মতো বিদ্যাপতির পক্ষেও এই সমস্যাটি অত্যন্ত উৎকট। তবুও ঐতিহাসিকেরা ভেতরের এবং বাইরের নানা সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বা ১৩৮০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার, বর্তমানে মধুবনী মহকুমার অন্তর্গত বিসফি গ্রামের এক বিদ্বান ব্রাহ্মণ বংশে বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গণপতি। বিদ্যাপতি আপন প্রতিভা ও বংশকৌলীন্যের জোরে মিথিলার একাধিক রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। কবির রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে কীর্তিসিংহ, দেবসিংহ, শিবসিংহ প্রমুখ অন্তত সাতজন রাজার—কোনটিতে তাঁদের মহিষীদেরও নাম, বদান্য ও পৃষ্ঠপোষণার কথা উল্লেখিত হয়েছে। এ-ছাড়াও তাঁর মৈথিলী ভাষায় লেখা বৈষ্ণবপদেও ঐ-সব রাজন্যবর্গের প্রসঙ্গ আছে—এর মধ্যে সবচেয়ে বেশিবার নাম পাওয়া গেছে, রাজা শিবসিংহ এবং তাঁর স্ত্রী লছীমা বাঈ-এর। এর থেকে তাঁর আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা তৈরি করা যায়। কিন্তু বিভিন্ন গবেষক ঐ-সব তথ্য সম্বন্ধে কিছু বিরোধ বা ভুল লক্ষ্য করা মাত্রই বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল সম্পর্কে আর কিছুতেই আনুমানিক বা কাছাকাছি সময়ের একটি তারিখে পৌছাতে চান না। ফলে, অতি প্রাচীন কালের বিষয়, এবং সুনির্দিষ্ট কোন সময় নির্ণয় কবি বা তাঁর সমসাময়িক কেউ যেখানে করেননি, সেখানে সাম্প্রতিক কালের পণ্ডিতেরা একটি নির্দিষ্ট 'বিদ্যাপতির আবির্ভাব কাল' নির্ধারণের জন্য হাস্যকর

ভাবে পাণ্ডিত্যের ব্যায়াম ও কসরৎ দেখিয়ে সাময়িকপত্রের পাতা ভরিয়েছেন। সেই গলদঘর্ম প্রয়াসকে পাশ কাটিয়ে এসে আমাদের মতো সাধারণ বুদ্ধির মানুষেরা দেখতে পাচ্ছে যে, প্রথমত, বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী ছিলেন, দ্বিতীয়ত, তিনি মিথিলার একাধিক রাজবংশের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন এবং মিথিলায় স্মার্ত সংস্কৃতির প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 'ভাষায়' অনন্য মাধুর্যরসযুক্ত পদ রচনা করেছিলেন। এবং 'মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ঠকুর চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে [আনুমানিক ১৩৮০ খ্রীস্টাব্দ] পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেরও কিছু পরে [আনুমানিক ১৪৬০ খ্রীটাব্দ] জীবিত ছিলেন; তাঁহার বয়স অনুমান আশী বৎসর হইয়াছিল—ইহার কিছু অধিক হওয়াও অসম্ভব নহে।'

খ. বিদ্যাপতি সমস্যা: বিদ্যাপতিকে নিয়ে যে সমস্যা তা হচ্ছে বিদ্যাপতির পদের বিশুদ্ধতা প্রসঙ্গে। অর্থাৎ বিদ্যাপতি ভণিতায় যতগুলি পদ পাওয়া গেছে সবগুলিই কি যথার্থ বিদ্যাপতির রচনা? বিদ্যাপতির 'বিরুদ' বা উপাধি কোন্‌গুলি সঠিক? মোটামুটিভাবে ঠিক হয়েছে যে 'কবিকণ্ঠহার,' 'সরসকবিকণ্ঠহার', 'নব-জয়দেব' এবং 'অভিনব জয়দেব' এই কয়েকটি উপাধি ও কেবল 'বিদ্যাপতি' নামে যে পদগুলি পাওয়া যায় সেইগুলিই মিথিলার বিসফি গ্রামের বিদ্যাপতির রচনা।

বিদ্যাপতির ভণিতায় বাঙলা ভাষায় অনেকগুলি পদ পাওয়া যায়। এ-গুলি ভেজাল-মেশানো যার অনেক / বা / সবগুলিই কবিরঞ্জন উপাধিক 'ছোটবিদ্যাপতির' রচনা। এ-বিষয়ে সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা প্রণিধানযোগ্য। এ-ছাড়াও উড়িষ্যার রাজামাত্য জনৈক 'কবিচম্পতি বিদ্যাপতি'ও কিছু জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। কারণ তিনিও বিদ্যাপতির অনুকরণে কবিতা লিখতেন। এ-গুলিকেও বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে বাতিল করে দিতে হবে। অধিকন্তু, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-মিলন সংক্রান্ত যে-সমস্ত পদ পাওয়া গেছে সেগুলিকে তথ্যনিষ্ঠ সমালোচকরা প্রমাণসাপেক্ষ এবং ভেজাল বলে বর্জন করতে চান। এইভাবে অনেক ঝাড়াই বাছাই করে, নানা বিরুদ্ধ ও পক্ষীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে, বিদ্যাপতি সম্পর্কিত পদগুলির বিশুদ্ধতা বিষয়ক সমস্যা অতিক্রম করে 'আমরা বিদ্যাপতির পদগুলির আকরসমূহ বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া ৭৯৯টি পদকে অকৃত্রিম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি। এই পদগুলি নেপালের পুথি, রামভদ্রপুরের পুথি, রাগতরঙ্গিণী, তরৌণির পুথি, গ্রিয়ারসনের সংগ্রহ, পদামৃতসমুদ্র, ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, পদকল্পতরু, সংকীর্তনামৃত, কীর্তনানন্দ প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত' [ড. বিমানবিহারী মজুমদার]।

'বিদ্যাপতি-সমস্যা' সমাধানের শেষে "বিদ্যাপতির সহিত বাঙালীর চারিশত বৎসরের সম্পর্ক; 'আমরা মৈথিলি-বিদ্যাপতির কুর্তা পাগড়ী খুলিয়া ধুতী চাদর পরাইয়াছি' [দীনেশচন্দ্র], বিদ্যাপতিকে নতুন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। ঐতিহাসিক ও গবেষক মৈথিলি-নেপালী উপকরণকেই অধিকতর প্রাধান্য দিবেন এবং বাংলা দেশের পদসঙ্কলনে ধৃত ব্রজবুলিতে লিখিত বিদ্যাপতির পদ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিবেন।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মৈথিলী বিদ্যাপতির আলোচনায় বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। যে বিদ্যাপতি বাঙালীর সহিত বাঙালী হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার সহিত বাংলা সাহিত্যের নিবিড় সম্পর্ক। সুতরাং ঐতিহাসিক যাহাই বলুন না কেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাপতির স্থান নির্ণয় করিতে হইলে বাংলা দেশে প্রচলিত পদেরই সাহায্য লইতে হইবে। বিশুদ্ধ মৈথিলি পদের দ্বারা প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহল মিটিতে পারে মাত্র, তাহার সহিত বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী-মানসের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই।" [ড.অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]।

৮৩ কৃত্তিবাসের কাল বা 'কৃত্তিবাস সমস্যা' : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অপরাপর বহু সমস্যার মতো কবি কৃত্তিবাসের আত্মজীবনী এবং তাঁর জীবনের প্রধান কয়েকটি তথ্য সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ আজও কিছু সংশয় পোষণ করে থাকেন। এই সংশয়গুলিকে কেউ কেউ 'কৃত্তিবাস সমস্যা' বলে উল্লেখ করতে চেয়েছেন। বিষয়টি বিচার করা যেতে পারে।

প্রথম, কৃত্তিবাসের আত্মজীবনীর প্রামাণিকতা। ড. দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' [১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ২য় সংস্করণ] পুস্তকে বদনগঞ্জ নিবাসী হারাধন দত্তের কাছে রাখা একটি পুঁথি থেকে 'কৃত্তিবাসের আত্মজীবনী' অংশ সংগ্রহ করে ছেপে দেন। আত্মজীবনীর এই আকস্মিক আত্মপ্রকাশে অনেকেই একে জাল বলে সন্দেহ করতে থাকেন। পরে ঢাকার নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে [ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ] আর একটি পুঁথি থেকে প্রায় একই ধরনের 'কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী' খুঁজে পেয়ে প্রকাশ করেন। উভয়ের মধ্যে কোথাও কিছু পার্থক্য থাকলেও প্রথমটির প্রামাণিকতা এর ফলে অস্বীকৃত হয় না। অধিকন্তু আত্মকাহিনীর টুকরো-টুকরো সংবাদও অপরাপর কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথি থেকে এদিকে-ওদিকে পাওয়া যেতে থাকে। এমনকি, উক্ত আত্মকাহিনীতে পাওয়া অধিকাংশ ঐতিহাসিক ঘটনা বা তথ্যের সমর্থনও অপরাপর সূত্র থেকে কোনো না কোনো ভাবে মিলতে থাকে। অতএব বর্তমানে 'কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী'র ভেজালত্বের দুর্নাম ঘুচেছে।

দ্বিতীয়, কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যের মধ্যে অন্য অনেক কিছু বিস্তৃতভাবে বললেও **তিনটি** বিষয়ে অদ্ভুতভাবে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। **ক**) কোন্ সালে তাঁর জন্ম? **খ**) কাব্য-রচনার তারিখ কি? এবং **গ**) যে গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে কবি সংবর্ধনা ও কাব্য-রচনার অনুরোধ পেলেন তিনি কে? এখন এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে কি সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় দেখা যাক :

১। কবি কৃত্তিবাস তাঁর 'আত্মপরিচয়' অংশে গৌড়েশ্বরের সভা, রাজপ্রাসাদ এবং সভাসদদের যে বর্ণনা ও নাম উল্লেখ করেছেন তা থেকে কবির পৃষ্ঠপোষক রাজা 'দনুজমর্দনদেব' গণেশ [কংস] ছাড়া আর কাউকে মনে হয় না। এঁদের যুক্তি এই যে কবি গৌড়েশ্বরের সভায় যাঁদের নামোল্লেখ করেছেন তাঁরা সবাই হিন্দু। অতএব রাজাও হিন্দু। আর এই সময়ে রাজা গণেশ [রাজত্বকাল : ১৪১৩-১৫ থেকে

১৪১৮ খ্রীঃ] ছাড়া আর কোনো হিন্দু রাজাই গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেননি।

কিন্তু এই যুক্তি মানা যয় না। কারণ, গৌড়েশ্বরের সভার মাত্র আট-নয় জন হিন্দু সদস্যের নাম কবি উল্লেখ করেছেন। অথচ কবি নিজেই তাঁর কাব্য-মধ্যে বলেছেন যে ঐ কয়েকজন ছাড়া আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় বসে বা দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা হিন্দু—না মুসলমান? হিন্দু কবি কর্তৃক স্ব-ধর্মীয় কয়েকজনের নাম উল্লেখেই গৌড়েশ্বর হিন্দু হয়ে যান না। অতএব ঐ গৌড়েশ্বর যে গণেশ এমন মনে হয় না।

২। অনেকে মনে করেন যে কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর হচ্ছেন তাহিরপুরের বড় জমিদার রাজা কংসনারায়ণ। কারণ, তাঁদের মতে, কৃত্তিবাস উল্লিখিত মুকুন্দ-জগদানন্দ-নারায়ণ নামে রাজা কংসের তিন জন আত্মীয়ের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই মতেরও ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। কেননা, কৃত্তিবাসের মতো ঐরূপ একজন স্বাধীনচেতা কবি কখনোই তোষামোদকারীর মতো একজন সাধারণ জমিদারকে রাজা বলে বাড়িয়ে পরিচয় দেবেন না।

৩। অতিসম্প্রতি কেউ কেউ এমন সিদ্ধান্ত করেছেন যে, কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক রাজা হচ্ছেন রুকনুদ্দীন বারবক শাহ [১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রীস্টাব্দ]। কিন্তু এই মতও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পরে আলোচিত হয়েছে।

৪। আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে কবি কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক গৌড়শ্বর হচ্ছেন রাজা গণেশের ধর্মান্তরিত পুত্র ও উত্তরাধিকারী জলালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ। কবির জন্ম সন ১৩৯৯ খ্রীস্টাব্দে বা তার কাছাকাছি দু-এক বছরের এদিক-ওদিক, এবং তাঁর কাব্য-রচনার কাল জলালুদ্দীনের রাজ্যলাভের [১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দ] দু-চার বছরের মধ্যেই। আমরা কোন্ যুক্তিতে এই সিদ্ধান্তে পৌছলাম্ তা আলোচনা করা যেতে পারে।

ক. মামলুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্ব-কালে [১৩০১-২২ খ্রীস্টাব্দ] পূর্ববঙ্গে মুসলমান আক্রমণ হয়। এবং একেই কৃত্তিবাস 'বঙ্গদেশে প্রমাদ' বলতে চেয়েছেন। ফলে, ঐ সময়ে কবির পূর্বপুরুষ [নারসিংহ] পূর্ববঙ্গে বাস উঠিয়ে দিয়ে ফুলিয়া এসে বিবাহাদি করে বসবাস আরম্ভ করেন। এর থেকে সময় গণনা করে অধস্তন চতুর্থ পুরুষ [গর্ভেশ্বর-মুরারি-বনমালী] কৃত্তিবাসের জন্মসাল ধরা হয়েছে মোটামুটিভাবে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দশকের কোনো এক সময়ে [অর্থাৎ ১৩৯০-১৪০০ খ্রীস্টাব্দে]। তিনি বারো বছর বয়সে গঙ্গা পার হয়ে উত্তরে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে গুরুগৃহে গমন করেন। এবং সেখানে বারো বছরের কম-বেশি সময় লেখাপড়া করার পর, গৌড়শ্বরের দরবারে যাওয়ার সময় ধরলে গৌড়ের সিংহাসনে জলালুদ্দীনের আসীন কালই [১৪১৮-৩১ খ্রীস্টাব্দ] পাওয়া যায়।

খ. রাজা গণেশের রাজধানী ছিলো পাণ্ডবনগর বা পাণ্ডুয়ায় [বর্তমান মালদহ শহরের মাইল চব্বিশেক উত্তরে]। গণেশ-পুত্র জলালুদ্দীন পাণ্ডুয়া থেকে গৌড় নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন।

গ. কৃত্তিবাস বিদ্যা-সংগ্রহের ইতিহাস আপন আত্মকাহিনীতে যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে দশ বারো বছরের কম যে তিনি গুরুগৃহে ছিলেন এমন মনে হয় না। এবং এগার পেরিয়ে বারোয় পড়ে তবে তিনি 'উত্তরদেশ'-এ পাঠ গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। অতএব চব্বিশ বছরের আগে তিনি কিছুতেই গৌড়েশ্বরের সভায় আসেননি। অতএব রাজা গণেশ উক্ত গৌড়রাজ হতে পারেন বটে, যদি পূর্বে কথিত সময়ে কবির জন্ম হয় [অর্থাৎ 'কবির জন্ম সন ১৩৯০ খ্রীস্টাব্দে বা তার কাছাকাছি দু-এক বছরের এদিক ওদিক' + ২৪ বছর = ১৪১৪ বা ১৪১৬ খ্রীস্টাব্দ বা সম-সময়]। অথচ আমরা সকলেই জানি যে রাজা গণেশ মাত্র চার বছরের মতো সময় [১৪১৪-১৫ থেকে ১৪১৮] সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এবং সে সময়টিতে তিনি আদৌ স্থির হয়ে রাজ্য শাসন করতে পারেন নি। নিজের ঘরের মধ্যে স্বধর্মচ্যুত পুত্র জলালুদ্দীন সবচেয়ে বড় শত্রু। বাইরে তো আছেই। অথচ কৃত্তিবাস রাজসভা ও তার পারিপার্শ্বিকের যে বর্ণনা করেছেন তা পূর্ণ রাজকতা ও চরম শান্তির দ্যোতক।

ঘ কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা এবং রাজসভার সব কিছুরই পরিপূর্ণ ও নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন, কেবল রাজার নামটি ছাড়া। এই মনস্তত্ত্ব সহজে অনুধাবনীয়। রামায়ণে যবন-স্পর্শ না রাখার জন্যে ইচ্ছা করেই মুসলমান সুলতান ও তাঁর সভার মুসলমান পার্ষদদের নাম বাদ দিয়েছেন। কবি অনুগ্রহ বা পৃষ্ঠপোষকতা চান এমন একজনের কাছে যিনি একদিন হিন্দু ছিলেন, কিন্তু আজ ধর্মত্যাগ করেছেন। তিনি গুণপনাতেও কিছু কম নন, অথচ এই বিধর্মীর নাম করা যাচ্ছে না।

ঙ রাজা গণেশের রাজত্বকাল অশান্তিপূর্ণ। তাঁকে এই অল্প সময়ের মধ্যে কোথাও বা কাউকেও পৃষ্ঠপোষকতা করতে দেখা যাচ্ছে না। অধিকন্তু জলালুদ্দীনকে নানাভাবে গুণের ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতে দেখা যাচ্ছে।

চ. কৃত্তিবাসের সময়ে বা তার আগে-পরে সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য অথবা শাস্ত্রের অনুবাদ করা, এমনকি তা শোনাও অত্যন্ত গর্হিত বলে গণ্য হতো। এর ব্যত্যয় করলে ভয়ঙ্কর নরকবাস।[১] এছাড়া এই ছড়া তো আমরা সবাই জানি : 'কৃত্তিবেসে কাশীদেশে আর বামুন ঘেঁসে / এই তিন সর্বনেশে'। অতএব এই আবহাওয়ায় এমন ব্যক্তি রামায়ণ অনুবাদের আজ্ঞা দিতে পারেন যিনি অন্তরে হিন্দু ঐতিহ্যের অধিকারী, কিন্তু ধর্মদ্রোহী বা বিধর্মী। ঐ সম-সময়ে জলালুদ্দীন ছাড়া এমনটি আর কে ছিলেন ?

অতএব নিশ্চিত, যাকে পাথুরে প্রমাণ—তা না পাওয়া পর্যন্ত আমরা রাজা গণেশের ধর্মান্তরিত পুত্র জলালুদ্দীনকেই কবি কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক গৌড়েশ্বর হিসেবেই গ্রহণ করবো। এবং আমরা এই সিদ্ধান্তের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে : ১৩৯৪ খ্রীস্টাব্দে বা একেবারে তার কাছাকাছি দু-এক বছরের এ-পার-ওপারে কবির জন্ম হয়। এবং

১ 'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য-চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥'

টীকা : ৮

গৌড়ের অধিপতি জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের রাজ্যলাভের [১৪১৮ খৃঃ] দু-চার বছরের মধ্যেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদ সম্পন্ন হয়।[২]

৮৪. 'চণ্ডীদাস সমস্যা' ঃ ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাস-সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে দেখা যেতে পারে যে এই 'সমস্যাটি' কি ?

ক। 'চণ্ডীদাস' এই নামে বিভিন্ন সময়ে একাধিক কবিকে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, 'সহজিয়া' চণ্ডীদাস। এঁরা সকলেই কি একই ব্যক্তি—না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ?

খ। বড়ু চণ্ডীদাস আদি-মধ্যযুগের বাঙলা ভাষায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে 'রাধাকৃষ্ণ প্রেম' বিষয়ক একখানি আখ্যান কাব্য রচনা করেছেন। দ্বিজ চণ্ডীদাসও রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবলম্বন করে বাঙলা ভাষাতেই [যাকে প্রায় আধুনিক বাঙলাই বলা যায়] অত্যুৎকৃষ্ট কিছু পদ রচনা করেছেন। দীন চণ্ডীদাস নামে তৃতীয় জন চৈতন্যপরবর্তী কালে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তনায় পুরাণের কাহিনীর সঙ্গে পদাবলীর রস মিশিয়ে এক বৃহৎ পালাগান রচনা করেন। চতুর্থজন চৈতন্যদেবের তিরোধানের বহু পরে রামী নামে এক রজক-কন্যাকে সাধন-সঙ্গিনী করে বৈষ্ণবসহজিয়া ভাবের আশ্রয়ে কিছু 'রাগাত্মিকা' পদ রচনা করেন। এখন আমাদের প্রশ্ন এই যে, এই চারজন চণ্ডীদাস কি একই ব্যক্তি অথবা চারজনই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ?

প্রথমত, দীনেশচন্দ্র সেন থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী অনেকেই মনে করেন যে চণ্ডীদাস একজন। তাঁর জন্ম বীরভূমের নানুরে। তিনি যৌবন কালে বয়সের প্রমত্ততাকে মেনে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মতো একটি তরল আদিরস-প্রধান কাব্য রচনা করেছিলেন। পরে পরিণত বয়সে ভাব-গম্ভীর পদসমূহ রচনা করেছেন।

দ্বিতীয়ত, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ-বিষয়ে বলেছেন : 'সত্যিই চারজন চণ্ডীদাস বর্তমান ছিলেন, এ কথায় কেউ কেউ কৌতুকবোধ করতে পারেন। তবে তাতে বিস্ময়েরই বা কি কারণ থাকতে পারে ? পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় চারশ বছরের মধ্যে চারজন একই নামের কবি এলে অবাক হবার কি আছে…সত্যিই চারজন চণ্ডীদাস বর্তমান ছিলেন কি না নিশ্চয় করে বলা যায় না। কিন্তু পদের ভাববস্তু দেখে চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদাবলী ও আখ্যানে চারটি স্পষ্ট স্তর দেখা যায়। তার মধ্যে দুটি হচ্ছে আখ্যানের ধারা, আর দুটি পদাবলীর ধারা।

এখন সিদ্ধান্ত ॥ দুই-এক-চার চণ্ডীদাসের মধ্যে থেকে আমাদের যতদূর সম্ভব একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে হবে। এ-প্রসঙ্গে প্রথমে আমরা বড়ু আর দ্বিজ অর্থাৎ

২ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে আমরা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত 'বাংলা সাহিত্যের কথা' : ১ম খণ্ড [ঢাকা : ২য় সং ১৯৭৬] গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা ও বাংলীর অতি পরিচিত পদাবলীর রচয়িতা ছাড়া,—অপর দুজনকেই এই সমস্যার বাইরে দাঁড় করলাম।

এক. অতএব 'বড়ু' এবং 'দ্বিজ' এই চণ্ডীদাস পৃথক নয়, একই। যিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য রচনা করেছিলেন, তিনিই পদাবলীর রচয়িতা। কারণ: ১। বড়ু এবং দ্বিজ উভয়েই তাঁদের কাব্যের মধ্যে মাঝে মাঝেই 'বাসলী' বা 'বাশুলী' দেবীর বন্দনা করেছেন। ২। "আর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মত পদাবলীতেও অনেক স্থানে কবির ভণিতায় 'বড়ু চণ্ডীদাস' নাম পাওয়া যায়।" ৩। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'বংশীখণ্ড ও রাধা-বিরহ'-এ এমন অনেক পদ আছে যেখানকার রাধার প্রেমার্তির সঙ্গে ভাবে ভাষায় চৈতন্য-আস্বাদিত [?] পদাবলীর রাধার বেদনাকাতরতার মিল আছে। "ইহার পরে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র একটি পদ রূপান্তরিত আকারে পদাবলীর মধ্যে পাওয়া গেল" [ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার ; 'বাংলা দেশের ইতিহাস (২য়) : পৃ. ৩৭৮]।

দুই. যাঁরা চণ্ডীদাসের দ্বিত্বে বিশ্বাস করেন না, অথচ ভক্তিভাবের ঘোরে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র গ্রাম্য স্থূলতা এবং আদিরসের প্রাবল্যকেও মেনে নিতে পারেন না; অথচ বলেন যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অপরিণত তরলবুদ্ধি বড়ুর যৌবনের রচনা এবং তিনিই পরিণত বয়সে ধর্মভাবাপ্লুত হয়ে পদাবলী রচনা করেছেন, তাঁদের এই মতও মানা যায় না। কারণ: ১। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মোটেই অপরিণত বুদ্ধির রচনা নয়। এতে যথেষ্ট রূপেই পরিপক্কতা আছে; যা কাহিনী-বিন্যাস, ঘটনা-কৌশল, নাটকীয়তা ও চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ২। পদাবলীর মতো সর্বক্ষেত্রে, অত উচ্চ শ্রেণীর না হলেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মধ্যেও যথেষ্ট ভাবুকতা আছে। ৩। মনে হয়, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কোনো এক রাজদরবারের আনুকূল্যে রচিত হয়েছিলো তাই, এবং জয়দেবের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হওয়ায় এতে আদিরসের প্রাধান্য ঘটেছে। আর নিজস্ব স্বাধীন বিচার এবং ভাব ও রসাবগাহনের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে চণ্ডীদাস তাঁর পদগুলিকে রচনা করেছেন। ফল, এই পার্থক্য। এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তিগুলি এই : ক. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পুঁথি যেখানে পাওয়া গেছে সেই গ্রাম মল্লরাজাদের অধীন। এ-ছাড়া ঐ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পুঁথিটি বিষ্ণুপুরের কাঁকিল্যা গ্রামের অধিবাসী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়। এই মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিষ্ণুপুরের রাজগুরু শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশ। যাঁদের সঙ্গে রাজ-পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক। খ. বসন্তরঞ্জন রায় আবিষ্কৃত পুঁথিটি 'বিষ্ণুপুররাজ-পুঁথিশালার সম্পত্তি ছিল'। গ. বড়ুর জন্মস্থান হিসেবে কথিত ছাতনা মল্লরাজাদেরই শাসনাধীন গ্রাম। অতএব কবির পক্ষে রাজানুগ্রহ লাভ আদৌ অসম্ভব নয়। ৪। রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক শ্রেষ্ঠ পদগুলির রচয়িতা 'দ্বিজ' চণ্ডীদাসের দ্বিজ শব্দের অর্থ কি এখানে ব্রাহ্মণ এই অর্থে গৃহীত হবে? না, রূপকার্থে অর্থাৎ রাজার নির্দেশের বাইরে, ভাবের স্বাধীনলোকে দ্বিতীয় জন্মপ্রাপ্ত বা 'দ্বিজ' এই অর্থে গৃহীত হবে? জ্ঞান-বৃদ্ধ চণ্ডীদাস এইভাবে নবজন্ম লাভ করে অপূর্ব সাহিত্য ফসল ফলিয়েছেন,

[এ-ছাড়াও 'বড়ু' ও 'দ্বিজ'-র মধ্যে অর্থ-পার্থক্য কোথায় ?]—এই সিদ্ধান্তই কি অধিক যুক্তিসহ নয় ?

তিন. বলা হয় যে, চৈতন্যদেব বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য আস্বাদন করতেন না, করতেন দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদ;—তাঁকে আমরা পদাবলীর চণ্ডীদাস বলতে পারি। কেন-না, প্রখ্যাত বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে কয়েকবারই উল্লেখ করেছেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু,

'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥' [মধ্যঃ ২ পরি]

কারণ, তিনি গ্রাম্যতা এবং আদিরসের ছড়াছড়ি দেখেই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে আনুকূল্য দেখান নি; তাই এ ক্রমশ লোকচক্ষুর অগোচরে চলে যায়। ফলে, এর ধারা অচিরেই বিলীন হয়ে যায়। এই মতও আদৌ যুক্তিসহ নয়। কারণ: ১। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস জীবনের অন্ত্যলীলায় ভাবাবেশে কোন কাব্যেরই আগা-গোড়া পাঠ হতো না। তাঁর ভক্ত-সঙ্গীরা তাঁকে প্রত্যেক কাব্যেরই নির্বাচিত অংশ পড়ে শোনাতেন। অতএব 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' এমন অনেক অংশ আছে যা ভাবতন্ময়তা সৃষ্টিতে অবশ্যই সক্ষম। ২। এরকম সাক্ষী আছে যে চৈতন্যদেব দিব্যভাবের দ্বারা সাধারণ দেহ-মুখ্য প্রণয় কাব্যকেও সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতা মণ্ডিত করে নিতেন। অতএব, বড়ুর কাব্য আস্বাদ করতে চৈতন্যদেবের বাধা কোথায়? ৩। চৈতন্যদেব স্বয়ং দান-লীলার অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন—সে ক্ষেত্রেও বড়ুর কাব্যকে আশ্রয় করাই তো সম্ভব। ৪। চৈতন্যদেবের আস্বাদন-সৌভাগ্য লাভ করা সত্ত্বেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' অপ্রচলিত হয়ে গেল কেন? যার জন্যে আজও পর্যন্ত একখানার বেশী পুঁথি পাওয়া যায়নি। উত্তর, আজও বাঁকুড়া ও মানভূম, যাকে 'ঝারিখণ্ড' [ঝাড়খণ্ড] বলে, সেখানকার লোক-চেতনায় 'কৃষ্ণকীর্তন' বেঁচে রয়েছে। দ্বিতীয়: তাল শিক্ষার পুঁথিতে যোলটি, 'পদকল্পতরুতে' একটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পদ উদ্ধৃত হতে দেখছি।

এছাড়া আরও একটি বড় প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে, যা থেকে বলতে পারি যে চৈতন্যদেব বড়ু চণ্ডীদাসেরই পদ বা কাব্য আস্বাদন করতেন। প্রমাণটি হচ্ছে এই যে: চৈতন্যদেবের ভক্ত অনুচর সনাতন গোস্বামী তাঁর 'বৈষ্ণবতোষিণী' [ভাগবতের টীকা] গ্রন্থে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র সঙ্গে চণ্ডীদাস রচিত দান-নৌকা ইত্যাদি খণ্ড সম্বলিত কাব্যের উল্লেখ করেছেন। বড়ু চণ্ডীদাস ছাড়া আর কার কাব্যে এমন পালাবদ্ধ খণ্ড-বিভাগ আছে ?

উপরে আলোচিত সমস্ত তথ্য ও যুক্তির উপসংহারে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি উক্তির সাহায্যে একটি স্থির-বুদ্ধিসম্মত সিদ্ধান্তে আসা যায় বলে মনে করি। তিনি বলেছেন: 'দ্বিজ চণ্ডীদাস বলিয়া কোন কবি থাকিলে, তিনি নিশ্চয়ই চৈতন্য-

দেবের পরবর্তী; তবে ইহা সম্ভব যে, সাধারণ কীর্তনিয়া ও অজ্ঞাত কবির হাতে বড়ু চণ্ডীদাসের পদের ভাবের সহিত চৈতন্যদেবের চরিত্রের আদর্শ মিলাইয়া যে কতকগুলি সুন্দর পদ সৃষ্টি হইয়াছিল, সেগুলি না বড়ু চণ্ডীদাসের, না উপরে আলোচিত দীন চণ্ডীদাসের—সেগুলি চণ্ডীদাস নামে প্রচলিত হইয়া বড়ু ও দীন চণ্ডীদাসের সম্মিলিত পদাবলীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া—চণ্ডীদাস এই নামের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে'। এবং তারই ফলে, বড়ু চণ্ডীদাসের কবিত্ব ও চৈতন্যদেবের ভাবাবেশে আস্বাদিত ও সার্বিক ভক্তি-আবেগের মিশ্রণে সমস্ত পদ এক চণ্ডীদাস নামের অমৃত-সমুদ্রে মিলেমিশে সকল ব্যক্তিগত স্বরূপ-পরিচয়কে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে।

□ আধুনিক যুগ □

১. দোম আন্তোনিও / 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ': দোম আন্তোনিও ছিলেন খ্রীস্টান ধর্মযাজক। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল এদেশে খ্রীস্টধর্ম প্রচার। এ-দেশে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের কাজে সর্বপ্রথম আত্মনিয়োগ করেছিলেন পর্তুগীজ ধর্মযাজকগণ। এই যাজকগণের মধ্যে দোম আন্তোনিও একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। আন্তোনিও ছিলেন ভূষণার রাজপুত্র। ইনি বাল্যকালে [১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে ?] মগ জলদস্যুদের দ্বারা অপহৃত হয়ে আরাকানে আসেন। সেখানে এক ধর্মযাজক ফাদার মানোএল-দা-রোজারিও দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে কিনে নেন এবং রোমান-ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত করেন। তখন তাঁর নাম হয় 'দোম আন্তোনিও দো-রোজারিয়ো'। ইনি আপন প্রভাব ও প্রচারের শক্তিতে ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রায় ত্রিশ-হাজার লোককে রোমান-ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত করেন।

এই আন্তোনিও খ্রীস্টধর্ম প্রচারের সুবিধার জন্য বৃদ্ধবয়সে 'জেন্ট'দের প্রতিনিধি একজন ব্রাহ্মণ ও জনৈক রোমান-ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারকের কথোপকথনের ঢঙে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'। গ্রন্থকার এই গ্রন্থের মাধ্যমে হিন্দুধর্ম অপেক্ষা খ্রীস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিপাদন করেছেন। কোন কোন সাহিত্যের ঐতিহাসিক বলেছেন যে: 'ইহার গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই, এভোরা নগরীতে পাণ্ডুলিপির আকারে এখনও রক্ষিত আছে'। কিন্তু এই তথ্য যথার্থ নয়। কারণ, " 'দোম্ এনতোনিও'র গ্রন্থ মুদ্রণের কৃতিত্বও মানোএল-এর। গ্রন্থখানি রোমান্ হরফে মুদ্রিত হয়েছিল—ভাষা যদিও বাঙলা। দোম্ এন্‌তোনিও-র বাঙলা গ্রন্থ পর্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ করেন মানোএল্ এবং সম্ভবত তিনিই বাঙলা হরফে লেখা রচনাটিকে রোমান হরফে পরিবর্তিত করে তা মুদ্রণযোগ্য করে তোলেন [ভূদেব চৌধুরী];—এর সমর্থনে পাওয়া যাচ্ছে: ১) "Manoel da Assumpcao···seems to have been

a zealous missionary and composed two books and edited one in Bengali with the object of affording facilities to the missionaries in their Bengali discussions with the 'Bramenes and Gentoos'" [Dr. S. K. De]। ২) 'ফাদার হস্টেনের নিকট লিখিত ফাদার লোপেসের পত্রে এটিও ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে লিসবনে ফ্রান্সিস্কো-দা-সিলভার ছাপাখানায় মুদ্রিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে' [সজনীকান্ত দাস]। এ-সব যাই হোক, আন্তোনিও তাঁর গ্রন্থ ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে লিখেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। নিচে রোমান অক্ষরসহ ব্রাহ্মণ ও রোমান ক্যাথলিকের কথোপকথনের কিছু নমুনা উদ্ধৃত করা গেলো :

ব্রাহ্মণ—তুমি কারে ভজো [Bramane—Tomi care bhoso]?

রোমান—পরমেশরেরে পুর্ণো ব্রমেরে [Roman—Poromexore Purno Bromere].

ব্রা—তবে তোমরা বরো উতোম ভজোনা ভজো, আমরা তাহারে ভজি [B—Thbe tomara boro utom bhosona bhoso, amora tahare bhasi]।

দোম আন্তোনিও তাঁর এই বই-এর মধ্যে রামায়ণের যে কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন তার ভাষা-রীতি বিধর্মী-ধর্মপ্রচারকের হলেও মূলত বাঙালীর, কারণ আন্তোনিও-র মাতৃভাষা ছিল বাঙলা। তাই তাঁর ব্যবহৃত বাঙলায় যতই অসম্পূর্ণতা থাকুক না কেন, তার ভিত্তিমূল এদেশের মাটিতেই প্রোথিত ছিলো। অধিকন্তু গ্রন্থকারের লক্ষ্য যদিও ছিলো সাধুভাষার একটি দুর্বল কাঠামো তৈরি করা, তবুও সেই খড়-কাঠামোর ওপর প্রায় আগাগোড়াই আঞ্চলিক উপভাষার মাটির প্রলেপ পড়েছিলো। কিছু উদাহরণ দিলে বোধহয় বক্তব্যটি স্পষ্ট হতে পারে : 'রামের এক স্ত্রী, তাহান নাম সীতা, আর দুই পুত্র—লব আর কুশ তাহান ভাই লকণ, রাজা অযোধ্যা বাপের সত্য পালিতে বনবাসী হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহান স্ত্রীকে রাবণে ধরিয়া লিয়া ছিলেন'।

দোম আন্তোনিও-র অপরিপুষ্ট, ব্যাকরণের আদর্শহীন প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে, তাঁরই গুরু-ভাইদের হাতে আরও সমৃদ্ধি লাভ করেছিলো।

২. রাজনারায়ণ বসু : 'রিচার্ডসনের তিনি [রাজনারায়ণ] প্রিয় ছাত্র, ইংরেজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ কিন্তু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন।' ঠাকুরবাড়ীর একান্ত অন্তরঙ্গ সুহৃদ রাজনারায়ণ বসু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির যথার্থতা আমরা তাঁর রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উপলব্ধি করে থাকি।

রাজনারায়ণের জন্ম হয়েছিলো ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর চব্বিশ পরগণার দক্ষিণে বোড়াল গ্রামে। তাঁর পিতার নাম নন্দকিশোর বসু। এই বসুপরিবার নিজ পল্লীতে বিশেষভাবে সম্মানিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কলকাতার হিন্দু

কলেজে অধ্যয়ন করবার সময়েই তিনি 'ইয়ং বেঙ্গলে'র উৎকেন্দ্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে ও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে তাঁর জীবনাচরণে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। রাজনারায়ণের সমগ্র রচনার মধ্যে এই পরিবর্তন-প্রভাব বিশেষভাবে মুদ্রিত রয়েছে। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাঁর চরিত্রের ভগবদ্‌ভক্তি, চিরবালকের পবিত্র নবীনতা এবং দেশের উন্নতি-সাধন করবার আবেগটিকে খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি ব্যক্তি জীবনে একাধারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ অন্তরঙ্গ, মাইকেল মধুসূদন ও ভূদেবের সহপাঠী। কিন্তু অপূর্ব কুশলতায় ও চারিত্র্যমাধুর্যে রাজনারায়ণ এই দুই বিপরীত মানসিকতার মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও পৃথক ব্যক্তি-স্বভাবটিকে বজায় রেখে চলতে পেরেছিলেন। ফলে, তাঁর অধিকাংশ রচনাই ব্যক্তিত্বের প্রবল প্রক্ষেপে সহজ সরল ও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। যার সবচেয়ে সার্থক উদাহরণ পাওয়া যাবে তাঁর 'সে কাল আর এ কাল' [১৮৭৪] ও 'আত্মচরিত' [১৯০৯—মৃত্যুর পরে প্রকাশিত] গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে। এখানে আমরা বাইরের প্রবীণতা, অন্তরের নবীনতা এবং প্রচুর পাণ্ডিত্যের অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করে থাকি। উচ্ছল সরসতা যা তাঁর জীবন ও সাহিত্যকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করেছে তার সার্থক পরিচয় বিধৃত আছে রাজনারায়ণের 'আত্মচরিত' গ্রন্থের প্রতি ছত্রে। এখানে তিনি আত্মনিরপেক্ষভাবে বাক্‌সংযমের সঙ্গে নিজের জীবনের দোষত্রুটির প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা বাঙলা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক দুর্লভ সঞ্চয়।

এ ছাড়াও রাজনারায়ণ 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' [১৮৭৩], 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' [১৮৭৮], 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' [১৮৮৭] ইত্যাদি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত ইংরাজী গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়। রাজনারায়ণের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা' বইতে দেশীয় ভাষা ও দেশীয় সাহিত্যের প্রতি তাঁর মতামত এবং অভিজ্ঞতার যে আন্তরিক ও সহৃদয় পরিচয় পাওয়া যায়, তার বক্তব্যমূল্য আজও সমানই রয়ে গেছে। পরিশেষে আমরা রাজনারায়ণের রচনা থেকে কিছু উদাহরণ সংগ্রহ করবো। যেমন: 'বোধ হইল বঙ্গদেশ স্বাধীন হইয়াছে ও ইংরাজেরা তথা হইতে চলিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশ স্বাধীন হইবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমন সুসভ্য হইয়াছে যে, পূর্বে পৃথিবীতে কোন দেশ এমন সভ্য হয় নাই। আর ইংলণ্ড বঙ্গদেশ হারাইবার সময় যে প্রকার সভ্য ছিল তাহাই রহিয়াছে' ['বিবিধ প্রবন্ধ': প্রথম খণ্ড: ১৮৮২: 'আশ্চর্য স্বপ্ন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]। এই রচনার সঙ্গে আমরা 'কমলাকান্তে'র জাগর স্বপ্নের সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। অধিকন্তু রাজনারায়ণের দেশহিতৈষণার পরিচয়টিও এখানে একান্তভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রাজনারায়ণ শেষ জীবনে দেওঘরে বসবাস করতে থাকেন এবং ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর ৭৩ বছর বয়সে ইনি প্রয়াত হন।

৩. **'ভ্রান্তিবিলাস'**: এই গ্রন্থখানি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর [১৮২০-১৮৯১] মহাশয় কর্তৃক রচিত হয়ে ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর মুদ্রিতাকারে আত্মপ্রকাশ করে।

এটি বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা নয়। বিশ্ব-বিশ্রুত নাট্যকার মহাকবি শেক্সপীয়র রচিত 'কমেডি অব এরস্' নাটকের বাঙলা গদ্যানুবাদ।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত পণ্ডিত। ইংরেজী তাঁর কাছে তৃতীয় ভাষা—ফলে এই ভাষা সম্পর্কে তাঁর কোন পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিলো না। এবং শেক্সপীয়রের ঐ সুপরিচিত নাটকটি অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি ভূমিকায় বেশ বিনয়ের সঙ্গেই বলেছেন: 'তাঁহার [সেক্সপীয়রের] প্রণীত নাটকসমূহে কবিত্বশক্তির ও রচনা কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।...অনেকে বলেন, তিনি যে কেবল ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি ছিলেন, এরূপ নহে, এ পর্যন্ত ভূমণ্ডলে যত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন। এ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বা পক্ষপাত বিবর্জিত কি না মাদৃশ ব্যক্তির তদ্বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্ভতা প্রদর্শন মাত্র।' এর থেকেই বোঝা যায় যে বিদ্যাসাগরের রসবোধ কতখানি তীক্ষ্ণ ও সচেতন ছিলো এবং শেক্সপীয়রের নাট্য-প্রতিভার তাৎপর্যকে অনুধাবন করতেও তাঁর অসুবিধা হয় নি। কেন তিনি শেক্সপীয়রের এই নাটকখানিকে অনুবাদের জন্যে বেছে নিয়েছিলেন? কারণ, এর মধ্যে দিয়ে বাঙালীর চিত্তরঞ্জন সহজ হয়। প্রথমেই কোন গভীর ভাবদ্যোতক ও গম্ভীর নাটক বেছে নিলে দেশীয় পাঠকদের প্রীতিপ্রদ নাও হতে পারে। এ-ভাবে একই সঙ্গে বাঙালীর রসবোধ ও শেক্সপীয়রীয় নাট্যশক্তির নিরিখটি ধরতে পারায় এপর্যন্ত শেক্সপীয়রের নাটকের যত বঙ্গানুবাদ হয়েছে তার মধ্যে 'ভ্রান্তিবিলাস' অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে পেরেছে।

এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণগুলি সূত্রাকারে এই রকম: ১। বিদ্যাসাগর তাঁর পূর্ববর্তী শেক্সপীয়র অনুবাদকদের মতো অপ্রয়োজনীয় কোন কিছু সংযোজনার মধ্যে দিয়ে নাট্যকারের নিজস্বতা এবং নাটকটির বিশিষ্টতাকে ক্ষুণ্ণ করেননি। ২। বিদ্যাসাগরের কলমে যমজ ভাই দু-জনের নাম চিরঞ্জীব, 'এফিসিউস' ও 'সাইরাকিউস' দেশ দুটি হেমকূট ও জয়স্থল নামে 'দুই প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজ্যে' পরিণত হয়েছে, তবুও তাঁর অনুবাদ মোটামুটি সৎ। ৩। *Commedy of Errors* মূলত আদিরস-মুখ্য নাটক। তাই এর অনেক অংশই আদিরসের লঘু কৌতুকে ভারি। কিন্তু শেক্সপীয়রের যুগে তা সচল হলেও বিদ্যাসাগরের সময়ে ও দেশে তা সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়। তাই তিনি এখানে মধ্য রুচি ও পথ গ্রহণ করে উচ্চ সাহিত্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। ৪। আমরা জানি বিদ্যাসাগরের ব্যবহারিক জীবনে দয়া-পাণ্ডিত্য-সমাজ সংস্কার শিক্ষা বিস্তার-কর্মের মতো সব গুরুতর কাজের ফাঁকে ফাঁকে কৌতুকরসের ধারা নিয়ত বহমান ছিলো। সেই ready wit-বোধের পরিচয় এই ভ্রান্তিবিলাসের সর্বত্র সুমুদ্রিত হয়ে আছে। ৫। *Commedy of Errors* সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য: 'পাঠকালে হাস্য করিতে করিতে শ্বাসরোধ উপস্থিত হয়'; ভ্রান্তিবিলাস সম্পর্কেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য; কারণ, প্রসাদগুণ, প্রবহমানতা ও জীবনরস-রসিকতার সম্পদে বিদ্যাসাগরের ভাষা মূল রচনার শিল্প-সৌকুমার্যকেই স্মরণ করায়। এই জন্যেই বোধ হয় প্রমথ চৌধুরী

বলেছেন : 'বিদ্যাসাগরী ভাষা অতি সহজ গদ্য। বাঙলা ভাষাও যে syntax-এর গুণে অতি চমৎকার ভাষা হতে পারে, তা প্রথমে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখে দেখিয়ে দেন।' আমরা এখানে মূল ইংরেজী এবং বিদ্যাসাগরের অনুবাদের একটু উদাহরণ উদ্ধৃত করে সহজ-সুরুচিপূর্ণ ও সরস অংশের অনুবাদে তিনি কতখানি সার্থক হয়েছেন তা দেখাবো : 'She is so hot because the meat is cold, / The meat is cold because you come not home, / You come not home because you have no stomach./You have no stomach, having broke your fast ; / But we, that know what 'tis to fast and pray./Are penitent for your default to-day.' অনুবাদ : 'আহার সামগ্রী যত শীতল হইতেছে, কর্ত্রীঠাকুরাণী তত উষ্ণ হইতেছেন। আহার সামগ্রী শীতল হইতেছে কারণ আপনি গৃহে যান নাই, কারণ আপনার ক্ষুধা নাই ; আপনার ক্ষুধা নাই, কারণ আপনি বিলক্ষণ জলযোগ করিয়াছেন ; কিন্তু আপনকার অনুপস্থিত জন্য আমরা অনাহারে মারা পড়িতেছি।'

এইভাবে আরও উদাহরণ দিয়ে দেখানো যেতে পারে যে বিদ্যাসাগরের অনুবাদও মৌলিক সৃষ্টির প্রসাদগুণ বিশিষ্ট।

৪. **'অঙ্গুরীয় বিনিময়'** : ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে [(?) ১৭৭৯ শকাব্দ] ভূদেব মুখোপাধ্যায় [১৮২৭-১৮৯৪] 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' [Historical Tales] নামে একটি বাঙলা গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে দুটি গল্প আছে,—১) 'সফল স্বপ্ন' এবং ২) 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ভূদেব স্বয়ং ভূমিকায় বলেছেন : "গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়, ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ইহাতে দুইটি স্বতন্ত্র উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহার প্রথমটির সহিত দ্বিতীয়টির কোন সম্বন্ধ নাই। উভয় উপন্যাসেই রাজ্য সম্বন্ধীয় যে সকল কথা আছে, তাহা প্রকৃত ইতিহাসমূলক। ...ইংরাজীতে 'রোমান্স অব হিস্টরী' নামক একখানি গ্রন্থ আছে, তাহারই প্রথম উপাখ্যান লইয়া 'সফল স্বপ্ন' নামক উপন্যাসটি প্রস্তুত হইয়াছে। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক দ্বিতীয় উপন্যাসেরও কিয়দংশ ঐ পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।"

কন্‌টর সাহেবের যে 'রোমান্স অব হিস্টরী-র ছায়ায় 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' রচিত, তার কাহিনী মোঘল ইতিহাস থেকে গৃহীত হয়েছে। এখানে ঔরঙ্গজেবের কন্যা রোশেনারার সঙ্গে মারাঠা বীর শিবাজীর প্রণয় ও বিচ্ছেদের রোমান্সকে উপজীব্য করা হয়েছে। ভূদেব তাঁর কাহিনীতে শিবাজী-সাজাহান-ঔরঙ্গজেব-জয়সিংহ-রোশেনারা-রামদাস স্বামী প্রমুখ প্রত্যেককেই প্রকৃত ইতিহাসের পাতা থেকেই সংগ্রহ করেছেন এবং এঁদের মধ্যেকার সম্বন্ধ-ঘটনা-পরিচয় সবই ইতিহাস-সম্মত। বাঙলা উপন্যাস-রচনার সেই প্রাক্-উষালগ্নে ভূদেব অধীত ইতিহাসবিদ্যা এবং আপন সহজ ঔচিত্যবুদ্ধির সাহায্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পক্ষে স্বল্প হলেও যে প্রকৃত রস পরিবেষণ করেছিলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। কোন আদর্শ সামনে না পেয়েও ভূদেব 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র

সত্যসিদ্ধ ঐতিহাসিক কাঠামোর ফাঁকে ফাঁকে এমন কিছু কাল্পনিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন যাতে একদিকে যেমন ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠা, অন্যদিকে তেমনি কল্পনা-রসের সিদ্ধি দুই-ই সাহিত্যরূপ লাভ করেছে। লেখক আপন 'মাধুকরী কল্পনার' উদ্ভাবন শক্তিতে মোঘলযুগের পটভূমিকায় শিবাজী-রোশেনারার আবেগতপ্ত এবং মহৎ প্রেমের যে কাহিনী-সূত্র বয়ন করেছেন সেখানে তিনি 'পাইওনিয়র'—একক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এবং এইখানেই ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

প্রসঙ্গত, ভূদেবের এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র কথা এসে যায়। কারণ বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'র [১৮৬৫] আট বছর আগে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' রচিত হয়েছিলো। উভয়ের তুলনা করে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন: 'আজ এই উপন্যাসখানির মূল্য তেমন হয়তো নাই, কিন্তু বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে ইহার অসীম মূল্য বলিয়া আমার ধারণা। দুর্গেশনন্দিনীর [১৮৬৫] জগৎসিংহ ও আয়েষার প্রণয় কাহিনীর চিত্রমূল শিবাজী ও রোশেনারার প্রণয় কাহিনী।...আমার ধারণা সত্য হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের ও তাঁহার একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের সহিত ভূদেবের উপন্যাসের প্রভাবাত্মক যোগাযোগ সূচিত করে। আর, দুইখানি উপন্যাসেই দেখিতে পাওয়া যায় ইসলাম ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। ভূদেব যথার্থ হিন্দু ছিলেন বলিয়াই এমন সম্ভব হইয়াছে। যথার্থ হিন্দু পরধর্ম বিদ্বেষী হইতে পারে না। কেবল পলিটিক্যাল হিন্দুর পক্ষেই পরধর্ম বিদ্বেষ সম্ভব।'

পরিশেষে আমরা 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করে ভূদেবের ভাষা ব্যবহার ও বর্ণনা শক্তির পরিচয় দেবো: 'তৎকালে বাদশাহ-পুত্রীর বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষমাত্র হইয়াছিল। তাঁহাকে যদিও প্রধানা সুন্দরীদিগের মধ্যে গণ্য করিতে না পারা যায়, তথাপি অবশ্যই প্রশংসনীয়রূপা বলিতে হয়। স্ত্রীলোকেরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটি একটি করিয়া বিবেচনা করিলে রোসিনারার কোন কোন অবয়বের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দোষ নির্বচন করিতে পারিতেন, কিন্তু সদা সুস্থ শরীর এবং আনন্দযুক্ত অন্তঃকরণ থাকিলে মুখমণ্ডলের যাদৃশ মনোহারিতা হয়, নৃপদুহিতা সেই শোভাতেই জনগণের কামনীয়া ছিলেন।'

৫. **'সংবাদ প্রভাকর'**: 'সংবাদ প্রভাকর' কবি ঈশ্বর গুপ্ত [১৮১২-১৮৫৯] সম্পাদিত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের একটি প্রখ্যাত সংবাদ-সাময়িক পত্র। ঈশ্বর গুপ্তের যখন মাত্র উনিশ বছর বয়স তখন পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে বাঙলা ১২৩৭ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে বাংলা সংবাদ-সাময়িক পত্রের প্রত্যূষযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রটি প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রথম কিছু টাল-মাটালের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এই পত্রিকা বারত্রয়িক রূপে প্রকাশিত হতে থাকে এবং শেষে ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জুন দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। গুপ্তকবির মৃত্যুর পর তাঁর ছোট ভাই রামচন্দ্র গুপ্ত কিছুদিন

এই দৈনিক পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছিলেন। এরই মধ্যে ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর একটি মাসিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিলো। 'প্রভাকর'-এর প্রতি সংখ্যায় এর কণ্ঠভূষণ হিসেবে যে সংস্কৃত শ্লোকটি মুদ্রিত থাকতো তা এই : '॥ সতাং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥' উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসম্বাদনবপ্রভাকর ॥'

'প্রভাকর'-এর জন্মের বছর দেড়েক পরে এর পৃষ্ঠপোষক যোগেন্দ্রমোহনের আকস্মিক মৃত্যু হয়। এর কিছু আগে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় গুপ্তকবি প্রভাকরের সম্পাদকত্ব ত্যাগ করেন। যাই হোক, ১৮৩৬—এ তিনি আবার দায়িত্বভার গ্রহণ করে প্রভাকরকে প্রকাশিত করতে থাকেন। তখন এর পৃষ্ঠপোষক হলেন ঐ পাথুরেঘাটার ঠাকুর পরিবারেরই কানাইলাল ও গোপালচন্দ্র নামে দুই ভাই।

প্রভাকরের এই পরিচালন ইতিহাস অতিক্রম করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজ যাকে সাংবাদিকতা [Journalism] বলে তা আমাদের দেশে প্রভাকরের পাতাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর ব্যক্তিগত সাহিত্যিক প্রতিভার বিচিত্র আস্বাদের ফসল যেমন এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় নানাভাবে উৎপন্ন হতে থাকে, তেমনি এই পত্রিকাকে আশ্রয় করেই পরবর্তী যুগের শক্তিমান এবং সৃষ্টিশীল ও অমিত প্রতিভার অধিকারী কিছু লেখক ও কবিকুলের শিক্ষানবিশীও শুরু হয়; এঁদের মধ্যে রঙ্গলাল দীনবন্ধু-বঙ্কিম-মনোমোহন-দ্বারকানাথ অধিকারী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।—অর্থাৎ এঁদের অবলম্বন করে প্রভাকরের পাতায় একটি literary school গড়ে ওঠে, যা সেদিনের পটভূমিকায় ছিলো অভাবনীয়। অধিকন্তু এই পত্রিকাকেই প্রথম সাহিত্য-পত্রিকা বলে গ্রহণ করা যায়; কারণ এর আগে আর যে-কটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিলো তা প্রধানত ধর্ম তর্ক ইত্যাদিতেই ব্যাপৃত থাকতো। কিন্তু গুপ্ত-কবি তাঁর পত্রিকায় সংবাদ-সাহিত্য ছাড়াও সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করে সরস পদ্যে ব্যঙ্গাত্মক রচনাও প্রকাশ করতেন; ফলে প্রভাকরের পাঠক সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে, বঙ্গীয় পাঠক-সাধারণ নানা স্বাদের সাহিত্যভোজ্য আস্বাদ করে পরিতৃপ্ত হতে থাকেন।

'সংবাদ প্রভাকরে'র আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে বাঙলার পুরাতন কবিদের জীবন-কীর্তি সংগ্রহ করে ছাপানো। এখানে কবি ও সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্তের তথ্যানুসন্ধানকারী গবেষকরূপে অন্য একটি পরিচয় পরিস্ফুট। এ-বিষয়ে গুপ্তকবির অনুসন্ধান ও পরিশ্রমস্পৃহা উল্লেখযোগ্য প্রশংসা দাবী করে। যাঁদের জীবন ও কাব্য-প্রতিভা 'প্রভাকরে'র পাতায় আলোচিত হয়েছিলো তাঁরা হচ্ছেন : ১) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ২) কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ, ৩) রামনিধি গুপ্ত, ৪) রাম বসু প্রমুখ। এই সমস্ত কারণেই 'প্রভাকর'-এর ঐতিহাসিক মূল্য। গুপ্তকবি এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় তাঁর 'প্রবোধ-প্রভাকর' 'হিত-প্রভাকর' 'বোধেন্দুবিকাশ', 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র গদ্যানুবাদ [অসমাপ্ত] প্রকাশ করেন। পরিশেষে 'প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় আর একটি

ঘটনার উল্লেখ অবশ্যই প্রয়োজন, তা হচ্ছে 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ'। দীনবন্ধু-বঙ্কিম ও দ্বারকানাথ অধিকারী যথাক্রমে হিন্দু-হুগলী ও কৃষ্ণনগর কলেজের তিন কৃতী ছাত্র প্রভাকরের পাতায় কবিতার মাধ্যমে যে বাদানুবাদ সৃষ্টি করেছিলেন তা-ই 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ' নামে পরিচিত।

৬. **'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' / কালীপ্রসন্ন সিংহঃ** 'হুতোম প্যাচার নক্‌শা' 'হুতোম প্যাচা' এই ছদ্মনামে কালীপ্রসন্ন সিংহ [১৮৪০-৭০] রচনা করেন [১৮৬১— পরে সম্পূর্ণ খণ্ড ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে]। এটি উপন্যাস নয়; গ্রাম্য ভাষা, কলকাতার 'ককনি' [cockney] এবং মুসলমানী বুকনী মিলিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর জীবন ও সমাজের অনন্য ভাষা-চিত্র-গ্রন্থ।

কলকাতার জোড়াসাঁকোর প্রখ্যাত দেওয়ান বংশের একমাত্র পুত্র কালীপ্রসন্ন ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নন্দদুলাল সিংহ। হিন্দু কলেজে বিদ্যাশিক্ষার প্রথম পর্যায়ের পর গৃহশিক্ষকের কাছেই বাকী পাঠ সম্পূর্ণ হয়। কালীপ্রসন্ন আয়ুষ্কাল মাত্র ত্রিশ বছর। কিন্তু এই অল্প জীবন-সময়ের মধ্যেই ইনি বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতির সেবায়, সমাজ সংশোধনায়, স্বদেশহিতৈষণায় এবং উদার দানকার্যের মধ্যে দিয়ে বিস্ময়কর কর্মকুশলতার পরিচয় রেখে গেছেন। বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠা [১৮৫৩] এবং এই সভার পক্ষ থেকে কবি মধুসূদনকে বঙ্গভারতীর সেবার জন্য এবং রেভারেণ্ড জেম্‌স লঙকে দেশপ্রেমের জন্য সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কালীপ্রসন্নের শিক্ষক ডি. রিচার্ডসনকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ও তাঁকে বিলাত যাবার পাথেয় দেওয়াও তাঁর কীর্তি। তাঁর সভার পক্ষ থেকে একটি নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় [১৮৫৬] এবং তিনি ঐ মঞ্চের জন্য 'বাবুনাটক' [১৮৫৪], 'বিক্রমোর্বশীনাটক' [১৮৫৭], 'সাবিত্রী-সত্যবান-নাটক' [১৮৫৮] ইত্যাদি নাটক রচনা করেন। তিনি সংস্কৃত মহাভারত বাঙলা গদ্যে অনুবাদ করিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' [১৮৫৫] ও 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' [১৮৫৬] নামক মাসিক পত্রিকাটির কথাও উল্লেখ করতে হয়। এগুলি তাঁর সাহিত্যানুরাগের পরিচয়, কিন্তু এর সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ সমর্থন, বহুবিবাহ নিরোধ, 'নীলদর্পণ'-এর মামলায় রেভাঃ লং-এর জরিমানার এক হাজার টাকা দেওয়া তাঁর দেশহিতৈষণার পরিচয় বহন করে। হরিশ মুখুজ্যের পরিবারকে পাঁচ হাজার টাকা দান, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষে দান, গ্রাণ্ট মেমোরিয়াল ফাণ্ডে দান, কলকাতায় নিজের খরচে প্রথম পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা তাঁর বদান্যতাকে চিহ্নিত করেছে।

কিন্তু এসবকে ছাড়িয়ে তাঁর প্রধান কীর্তি বিধৃত হয়েছে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র মধ্যে। সাহিত্য-সমাজ-দেশ-এর সম্পর্কে নানা গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ও কাজ তিনি করলেও সেদিনের বাঙালীর জীবন-চর্চার প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব পরিচয়ের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সম্পর্কেই তিনি যে কতখানি সচেতন ছিলেন তা তাঁর 'নক্‌শা'-র সূচীপত্রের

দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। যেমন : 'কলিকাতার চড়কপার্বণ', 'হুজুক', 'ছেলেধরা', 'ক্রিশ্চানি হুজুক', 'সাতপেয়ে গরু', 'ছুঁচোর ছেলে বুঁচো', 'পাদ্রি লণ্ড ও নীলদর্পণ', 'বুজরুকি' ইত্যাদি।

'নক্শা' উপন্যাস নয়, লেখক সে দাবী করেনও নি। তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন : 'আমরাও এই নক্শাটি পাঠকদের উপহার দিয়ে এই এক নতুন বলে দাঁড়ালেম—এখন আপনাদের স্বেচ্ছামতো তিরস্কার বা পুরস্কার করুন।' হুতোম তাঁর নক্শা-দর্পণে যাদের ব্যঙ্গ-চিত্র দেখিয়েছেন তারা ছাড়া সকলেই তাঁকে পুরস্কৃত করেছেন। তাঁর অভিপ্রায় সম্বন্ধে হুতোম বলেছেন : 'কি অভিপ্রায়ে এই নক্শা প্রচারিত হল, নক্শাখানির ভু-পাত দেখলেই সহৃদয় মাত্রেই তা অনুভব কত্তে সমর্থ হবেন, কারণ এই নক্শায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা হয় নাই—' এই বাস্তব ও জীবনমুখী দৃষ্টিভঙ্গীই হুতোমের রচনাকে সজীব ও সাহিত্যগুণোপেত করেছে, এবং এই সকল উপাদান প্রকৃত সাহিত্য-পোষ্টার উর্বর চিন্তাক্ষেত্রে সযত্নে ও তন্নিষ্ঠরূপে লালিত হয়ে পরবর্তীকালে উপন্যাসের বিশাল মহীরুহের বীজটিকে অঙ্কুরিত করেছে।

এ-প্রসঙ্গে হুতোমের ভাষার কথাও বলা দরকার। 'কালীপ্রসন্নের হুতোম অবিমিশ্র চলিতে লেখা।...এদিক থেকে কালীপ্রসন্ন গদ্যরীতির ক্ষেত্রে পরবর্তী শতকের জন্য মহামূল্য ঐতিহ্য রেখে গেলেন। প্রবাদ-প্রবচনের সাবলীল ব্যবহার ও অন্য সব দিক থেকেই তিনি চলিত রীতিটিকে পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করেছিলেন।' একটু উদাহরণ : 'কল্‌কেতায় প্রথম বিধবা-বিবাহের দিন বালী, উত্তোর পাড়া, অম্বিকে ও রাজপুর অঞ্চলের বিস্তর ভট্চাযিরা সভাস্থ হন—ফলার বিদেয় মারেন, তারপর ক্রমে গা ঢাকা হতে আরম্ভ হন, অনেকে গোবর খান, অনেকে সভাস্থ হয়েও বলেন, আমি সেদিন শয্যাগত ছিলাম।'

সম্প্রতি একটি প্রশ্ন উঠেছে যে হুতোমের নক্শা নাকি কালীপ্রসন্নের লেখা নয়। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা,—কালীপ্রসন্ন পয়সার জোরে নামস্বত্ব কিনে নিয়েছিলেন। এই সংশয় প্রকাশ করে গবেষকদের লাভ হলেও জনচিত্ত থেকে হুতোম ও কালীপ্রসন্নকে পৃথক করা খুবই কঠিন।

৭. **'স্বর্ণলতা' :** বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার যখন মধ্যাহ্নদীপ্তি, সেই সময়ে বাঙলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের [১৮৪৩-১৮৯১] আবির্ভাব। 'স্বর্ণলতা' [১৮৭৪] তাঁর প্রথম উপন্যাস। তারকনাথ তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন যে, ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ৭ই জুলাই সোমবার রাত আটটার সময় এই গ্রন্থ রচনা শেষ হয়েছে। তিনি আরও লেখেন যে, 'some character of my novel are from the real life'.

আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক রোমান্স উপন্যাসগুলি, এমনকি 'বিষবৃক্ষ' [১৮৭২]-র কাহিনীবস্তুও তারকনাথের পছন্দ হয়নি ; তিনি মনে করতেন যে এর মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশের জীবন ও যথার্থ মানুষগুলির সন্ধান পাওয়া যায় না। তারই প্রতিবাদস্বরূপ তারকনাথ যে এই 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস রচনা করেন তার প্রমাণ গ্রন্থের

আখ্যাপত্রেও মুদ্রিত আছে। সেখানে তিনি প্রথমে ইংরেজীতে: 'Fictions to *please* should wear the face of truth.' এবং পরের লাইনে 'হরিবংশ' থেকে: 'কথাপি তোষয়েদ্বিজ্ঞং যত্নসৌ তথ্যবস্তুবেৎ' উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বঙ্কিমের বিরুদ্ধতা করতে গিয়েই তিনি তাঁর কাহিনীকে তথ্যবৎ করতে চেয়েছিলেন ['face of truth.']। এতে জেদ বজায় থাকলেও, তৎসময়ে প্রভূত প্রশংসা জুটলেও [As a painter of real ordinary life, both in its comic and in its serious and tragic side Babu Taraknath is unrivalled among Bengali authors···' : *The Calcutta Review*] গভীর প্রত্যয় বা তীব্র জীবন-জিজ্ঞাসা সমৃদ্ধ কোন রসই এর থেকে পান করা সম্ভব হয়নি। ফলে, এক অগভীর, পারিবারিক-জীবনের অনাড়ম্বর ছবি হিসাবে এ এককালে আমাদের আনন্দ দিয়েছিলো. এইটুকুই এর ঐতিহাসিক মূল্য।

গ্রামে ডাক্তারীর সূত্রে তারকনাথ এর কাহিনী-বস্তু ও কিছু কিছু চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হন। তাকেই তিনি উপন্যাসে বাঁধবার চেষ্টা করেন।

বাঙালীর পারিবারিক জীবনের সরল-সামাজিক চিত্র হলেও লেখক কাহিনীর বাঁধুনিতেও বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে পারেননি। কেননা এর কাহিনী পরিষ্কার দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। প্রথম অংশ সরলার মৃত্যু পর্যন্ত, দ্বিতীয় অংশ তার পরবর্তী ঘটনা। এ-দুয়ের মধ্যে কোন নিবিড় ঐক্য নেই, সংযোজক কোন চরিত্রও নেই, একমাত্র দাসী শ্যামা ছাড়া। কোন বলিষ্ঠ কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং এক-লক্ষ্য প্রতিপাদ্য না থাকায় উপন্যাস হিসেবে এটি তেমন সার্থক হতে পারেনি। পরিশেষে উপন্যাস সম্পর্কে বলা হচ্ছে: "অন্যায় ভাবে অত্যাচারিত এবং ব্যথিত মানবতার প্রতি সুগভীর সহানুভূতিবোধ হইতে জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তারকনাথেরও চরিত্রে মানবতার প্রতি সহানুভূতিবোধের একটি বিশিষ্ট গুণ ছিল।···তথাপিও, 'স্বর্ণলতা'র মধ্য দিয়া তারকনাথের বাস্তব জীবন-রূপায়ণ যতই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠুক না কেন, তাহা আদর্শবাদের স্পর্শ লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া আর্টের সীমায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই; সেই কারণেই প্রত্যক্ষ জীবনাচরণের নিখুঁত বর্ণনার অতিরিক্ত আর কিছুই প্রকাশ পায় নাই বলিয়াই ইহা উপন্যাসের যতদূর লক্ষ্য ততদূর পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে নাই, কেবল সেই পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে মাত্র।"

'স্বর্ণলতা' দেশী-বিদেশী কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয় এবং রসরাজ অমৃতলাল কর্তৃক 'সরলা' [১৮৮৮] নামে নাটকায়িত হয়ে ঐ বছরের ২২এ সেপ্টেম্বর 'স্টার থিয়েটারে' অভিনয়ের মাধ্যমে প্রচুর জনসমাদর লাভ করে।

৮. **'পুরুবিক্রম নাটক'**: রবীন্দ্রনাথের 'জ্যোতিদাদা' এবং দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৪৯-১৯২৫]-এর একটি সার্থক ঐতিহাসিক নাট্যগ্রন্থ এই 'পুরুবিক্রম নাটক' [১৮৭৪]। দেবেন্দ্রনাথের অপরাপর পুত্রদের মতো জ্যোতিরিন্দ্র-

নাথও কর্মৈষণায়, স্বাদেশিকতায় এবং সাহিত্যিক প্রতিভার শক্তিতে বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছিলেন। যে বছর বাঙলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সূচনা হয় সেই ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনটিকে অবলম্বন করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। এর পর ইনি প্রহসন-নাটক মিলিয়ে তেত্রিশখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে প্রায় বাইশখানাই হয় অনুবাদ, না হয় ভাবানুবাদ। এই অনুবাদ নাটকগুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক নাটকের গুণ বা প্রচারকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। অথচ এই মৌলিক নাটকগুলির মধ্যে দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগত জাতীয়তাবোধ এবং স্বাদেশিকতার ধারণা স্ফূর্তি লাভ করেছিলো। সত্য কথা বলতে কি, তিনি খ্রীষ্ট জন্মাবার চার-শ বছর আগের ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগের বাঙলার রাজা-মহারাজার ইতিহাস অবলম্বন করে যে-সব ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক রচনা করেছিলেন তাদের প্রত্যেকের মধ্যে দিয়েই তাঁর দেশপ্রীতির উত্তাপকে অনুভব করতে পারা যায়। অথচ এই দেশপ্রেম কোন সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির দ্বারা কলুষিত ছিলো না; বরঞ্চ অতিরিক্ত আদর্শনিষ্ঠা কোন কোন ক্ষেত্রে এদের ঐতিহাসিক রস ও বাস্তবতার দাবীকে ক্ষুণ্ণ করেছে। এই সব দোষ এবং গুণই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম নাটক'-এও সমানভাবেই বর্তমান।

চতুর্থ খ্রীস্টপূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ঐতিহাসিক কাহিনী-আশ্রয়ে নাট্যকার নাটকটি রচনা করেছেন। পুরুর বীরত্ব, তক্ষশীলের দেশদ্রোহিতা, ঐলবিলা এবং অম্বালিকার প্রেমকাহিনী নাটকটিতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বীরত্ব-ঈর্ষা প্রদর্শনের সুযোগ তৈরি করেছে। এই নাটকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র তক্ষশীল রাজার বোন অম্বালিকার। তার ট্র্যাজিক পরিণতি পাঠক-দর্শকদের আগ্রহ আকর্ষণ করে। মৃত্যু-বিচ্ছেদ-হাহাকার-আবেগে মথিত মিলন কিন্তু নাটকটিকে অতিনাটকে [melo-drama] পরিণত করেনি। পাশ্চাত্ত্য—বিশেষ করে ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিল্পী-চেতনায় যে আভিজাত্যবোধের জন্ম হয়েছিলো তা-ই তাঁর নাটকগুলিকে অতিনাটকীয়তার অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করেছে। 'পুরুবিক্রম নাটকে'র ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে এটি যেহেতু তাঁর প্রথম মৌলিক নাটক [সম্প্রতি কোন সমালোচক বিস্তৃত উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে 'পুরুবিক্রম' মৌলিক নাটক নয়। ফরাসী নাট্যকার জঁা রাসিন-এর 'আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট' (১৬৬৫) নামক নাটক থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'নিজের বিশিষ্ট পন্থায় রূপান্তর' করে 'পুরুবিক্রম' রচনা করেন। অর্থাৎ এটি অনূদিত বা মৌলিক নাটক নয়, রূপান্তরিত নাটক]—তাই এর মধ্যে তাঁর বিশিষ্ট নাট্য-কৌশল, ক্রিয়াশীলতা ও আবেগ যথাযথভাবে সংমিশ্রিত হতে পারেনি। এই জন্যই বোধহয় 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচনা কালে [১২৮২ বঙ্গাব্দ] বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন: 'গ্রন্থখানি বীররস-প্রধান এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্যবিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বলিয়া মনে হয়।' কিন্তু এ-সত্ত্বেও এই নাটকে 'যে অকৃত্রিম দেশানুরাগ-রস

উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।' নাটকের আরম্ভেই [১।১] সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান-মন-প্রাণ' ইত্যাদি বিখ্যাত গানটি ব্যবহৃত হয়েছে। এবং এরই শেষ চরণটি সারা নাটকেই উৎসাহ-বাক্যের মতো ঘুরে ঘুরে গীত হয়েছে।[১] বেশ সাফল্যের সঙ্গে নাটকটি কলকাতার কয়েকটি রঙ্গমঞ্চে সেদিন অভিনীত হয়েছিলো—তার মধ্যে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' অন্যতম।

৯. **রামনারায়ণ তর্করত্ন / 'নবনাটক'**ঃ ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশের অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামে রামনারায়ণের জন্ম হয়। এঁর পিতার নাম রামধন শিরোমণি। রামনারায়ণ অল্প বয়সেই পিতা-মাতাকে হারান। কিন্তু তাঁর দাদা-বৌদি তাঁকে পুত্রস্নেহে মানুষ করেন। ইনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুশিক্ষিত হয়ে মেট্রোপলিটন কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। তাঁর এই চাকুরি প্রাপ্তি সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছিলেন : '…ইনি অতি সুপণ্ডিত ও সংস্কৃত কলেজের একজন বৃত্তিধারী ছাত্র ছিলেন। বঙ্গভাষা লেখন-পঠনেও বিশেষ পারদর্শী …'। কিন্তু কেবল পারদর্শী নন, রামনারায়ণ বাঙলা বা মাতৃভাষার প্রতি যে শ্রদ্ধা সেদিন দেখিয়েছিলেন দেশ স্বাধীন হওয়ার চুয়াল্লিশ বছর পরেও আমরা তার ধারে-কাছে পৌছাতে পারিনি। তিনি মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্রদের সামনে সেদিন বলেছিলেন : 'তোমরা যেমন মনোযোগ পূর্বক ইংরাজী শিখিবে বাঙলাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে, বাঙলার প্রতি কদাচ অনাস্থা করিবে না ; বাঙলা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা, সুতরাং মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক।' তাঁর এই বক্তৃতা 'প্রকাশ্য বক্তৃতা' নামে ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থবদ্ধ হয়। মেট্রোপলিটনে কিছু দিন কাজ করার

১ ড. সুকুমার সেন, ড. ভূদেব চৌধুরী বলেছেন যে এই নাটকে মোট তিনটি স্বদেশী সঙ্গীত আছে। কিন্তু আমাদের সংগ্রহে 'বিশ্বভারতী' প্রকাশিত [১৯৬৯] ও ড. সুশীল রায় সংকলিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ' গ্রন্থটি রয়েছে। তাতে ১/১ দৃশ্যে 'গায়িকা'-র কণ্ঠে 'মিলে সবে ভারত সন্তান' গানটি প্রযুক্ত হয়েছে। আর ৫/২ দৃশ্যে হতাশ প্রেমিকা অম্বালিকার গলায় দুটি টুকরো প্রেম সংগীত দেওয়া হয়েছে। এ-ছাড়া এই নাটকে আর কোন গান নেই। উক্ত ইতিহাসকারগণ ও সংকলক সকলেই পণ্ডিত, আমরা এখন কাকে রাখি কাকে ছাড়ি? এই প্রসঙ্গে আরও একটু কৌতুককর ব্যাপার আছে। ড. রায়-এর উক্ত সংকলন গ্রন্থের 'প্রসঙ্গ কথা' অংশে [পৃ. ৬৫০-১] লিখেছেন : 'পুরুবিক্রম' দ্বিতীয় সংস্করণে [১৮৭৯] রবীন্দ্রনাথের : 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন, / এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন' গানটিও ব্যবহৃত হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকেই গানটির প্রথম প্রকাশ।' কিন্তু কি আশ্চর্য, ড. রায়ের সংকলিত 'নাট্যসংগ্রহ'-এ এই রবীন্দ্র-সঙ্গীতটি নেই। তা-হলে এই সংকলনটি কোন্ সংস্করণ অবলম্বনে প্রস্তুত। সংকলন কর্মের সাধারণ ও স্বীকৃত তথ্যনিষ্ঠ রীতিটিকে অনুধাবন করবার সৌজন্যটুকুও এখানে পালন করা হয়নি।

পর রামনারায়ণ কলকাতার গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন। এবং সাতাশ বছর কাজ করার পর ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁকে বেশিদিন অবসর ভোগ করতে হয়নি, ১৮৮৬ সালের ১১ জানুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়।

বাঙলা এবং সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্য রামনারায়ণের রচনাবলীর মুখ্য বিষয় হচ্ছে নাটক ও প্রহসন; এবং সেদিনের তুলনায় নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলে তিনি 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামেই অধিক সুপরিচিত ছিলেন। ইনি 'কাব্যোপাধ্যায়', 'কবিকেশরী' প্রভৃতি উপাধি দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন। বাঙলা ছাড়াও 'সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে তিনি যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, সেরূপ প্রায় দেখা যায় না।' একবার ছাত্রাবস্থায় এবং আর একবার শিক্ষকতা করার সময়ে, দু-দুবার সমাজ-সমস্যা-মূলক প্রবন্ধ ও নাটক রচনার প্রতিযোগিতায় রামনারায়ণ পঞ্চাশ টাকা করে পুরস্কার লাভ করেন। প্রথম প্রবন্ধখানির নাম 'পতিব্রতোপাখ্যান' [১৮৫৩] এবং দ্বিতীয় গ্রন্থটির নাম 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক' [১৮৫৪]। এ-ছাড়াও রামনারায়ণ 'বেণীসংহার নাটক' [১৮৫৬], 'রত্নাবলী নাটক' [১৮৫৮], 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' প্রহসন [১৮৬৫], 'নবনাটক' [১৮৬৬], 'উভয় সঙ্কট' [১৮৬৯] ও 'চক্ষুদান' [১৮৬৯] ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় চোদ্দখানি নাটক-প্রহসন রচনা করে বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এর মধ্যে সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ 'রত্নাবলী' বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিল। এই 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখেই মধুসূদনের মধ্যে নাটক লেখবার সংকল্প জাগে।

বাঙলা ছাড়াও বেশ কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্য-প্রবন্ধ রচনা করে রামনারায়ণ সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ও ব্যুৎপত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। মৃত্যুর পর রামনারায়ণের কৃতিত্ব সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশ' [১৩ মাঘ ১২৯২] লিখেছিলেন: 'তর্করত্ন নানাগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন।...বাঙলা নাটকের ইনি এক প্রকার সৃষ্টিকর্তা বলিতে হইবে।... সংস্কৃত ভাষায় তিনি কাব্য ও অলঙ্কার বিষয়ে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। বর্তমান সময়ে তাঁহার ন্যায় সংস্কৃত কবি আর কেহ ছিল না।...ইনি ছাত্রদিগের নিরতিশয় শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।'

বহুবিবাহকে ধিক্কার দিয়ে লেখা 'নবনাটক' [১৮৬৬] রামনারায়ণের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাটক। অবশ্য এর মধ্যে মধুসূদনের সব নাটক প্রকাশিত হয়ে গেছে, 'নীলদর্পণ'-ও দেশে ইতিহাস সৃষ্টি করে ফেলেছে। শুধু নাটক নয় মধুসূদনের হাত ধরে সমগ্র বাঙলা সাহিত্য আধুনিকতার সুপ্রশস্ত রাজপথে সদর্পে পা ফেলতে আরম্ভ করেছে। এমন সময় বহুবিবাহের কুফল এবং লোকশিক্ষার অনুকূলে 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা'র পক্ষে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের ২২ জুন তারিখে 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' পত্রে পুরস্কার ঘোষণা করে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। "কিন্তু অল্প দিন পরেই সংবাদপত্র হইতে বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করিয়া, পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর এই

টীকা : ৯

নাটক রচনার ভার অর্পিত হয় [১৫।৭।১৮৬৫]। ··ইহার অল্প দিন পরেই রামনারায়ণ 'নবনাটক' রচনা করিয়া 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা'র কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে দুই শত টাকা পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন।"

'নবনাটক' রামনারায়ণের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক। এর পূর্ণ নাম 'বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নবনাটক'। নামেই নাট্য-বিষয় পরিস্ফুট। আমরা আগেই বলেছি যে এই নাটক প্রকাশিত বা লেখার অনেক আগেই বাঙলা নাট্যসাহিত্য-প্রকোষ্ঠে য়ুরোপীয় হাওয়া প্রচুর পরিমাণে খেলতে আরম্ভ করেছে। তা সত্ত্বেও রামনারায়ণ সেই আলো-হাওয়া প্রাণ-রসকে পাশ কাটিয়ে নব-নাটকে তাঁর নিজস্ব পরিচিত এবং সিদ্ধ পথকে অনুসরণ করেই চলেছিলেন; নান্দী-প্রস্তাবনাই তার প্রমাণ। অর্থাৎ কালের দিক থেকে নব-নাটক নতুন যুগের কোলে জন্মগ্রহণ করলেও অন্তর এবং বহিঃপ্রকৃতির দিক থেকে এ-প্রাক্-মধুসূদনীয় যুগেরই সন্তান। বৃদ্ধকালে বিয়ে করে আনা তরুণীবধূ বড় সতীন ও তার দুই ছেলেকে অত্যাচারে কি ভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলো—তাই-ই এই নাটকে 'নীলদর্পণে'র অনুসরণে ও melodramatic ভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে যুগপ্রভাব তো কেউ-ই এড়াতে পারেন না;—রামনারায়ণও পারেননি। যেমন: ১) ইংরেজী নাটকের অনুসরণে অঙ্কের অন্তর্গত গর্ভাঙ্ক বা 'সিন' ব্যবহার করেছেন। ২) সংস্কৃত পণ্ডিত ও নাট্য-অলঙ্কার-শাস্ত্র বিশারদ হয়েও বিয়োগান্তক রূপে নাটকটি রচনা করতে দ্বিধা করেননি। ৩) পাত্র-পাত্রীর মুখে পদ্য ব্যবহার অনেক কমিয়ে দিয়েছেন। ৪) নাটকীয়তা না থাকলেও একটা নিটোল প্লট এখানে পাওয়া গেল। ৫) ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বা কৌতুকরস পরিবেষণকালে রুচির মুখরক্ষা করেছেন। ৬) এই নাটকের ভাষায় সারল্য এবং জীবন-নৈকট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'নবনাটক' জোড়াসাঁকো থিয়েটারে বেশ কয়েকবার অভিনীত হয়েছিলো।

১০. 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' / মানোএল-দা-আসুম্পসাঁউ: ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে বাঙলার মাটিতে ইউরোপীয় বণিকেরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়ে বুঝেছিলেন যে এদেশে প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে এ-দেশের জনসাধারণকে খ্রীস্টধর্মের আওতায় আনতে পারলে সবচেয়ে সুবিধা হবে। তাই এদেশে প্রথমে যে বণিক দল এসেছিলো সেই পর্তুগীজেরা খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারে বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়। এই পর্তুগীজরা ছিলো রোমান ক্যাথলিক। তাই ধর্ম-বিষয়ে কিছু গোঁড়া। ফলে, তাঁরা বিশেষ আগ্রহ নিয়ে এবং বাঙলার মাটির সঙ্গে যোগ রেখে ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই কাজে সবচেয়ে উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন মানোএল দা-আসুম্পসাঁউ। ইনি অক্লান্ত পরিশ্রমে পর্তুগীজ-মিশনারীদের বাঙলা গদ্য-চর্চাকে মুদ্রিত করে স্থায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মনোএল-এর জীবন কথা প্রায় কিছুই জানা যায় না। যেটুকু জানি তা এই রকম: মানোএল ছিলেন এভোরার অধিবাসী এবং অগস্তনীয় সন্ন্যাসী হিসেবে তিনি এদেশে আসেন। তিনি

একজন অত্যুৎসাহী পাদ্রী এবং ঢাকা জেলার পর্তুগীজ গীর্জার অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে বা তার কিছু আগে এদেশে আসেন এবং ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এদেশে ধর্মপ্রচার করেছিলেন।

মানোএল সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন একজন মিশনারী হিসাবে নয়, অক্লান্ত ধর্মপ্রচারক হিসেবেও নয়; বাঙলা গদ্যের জন্মের আদি স্তরে ইনি একটি ধর্মপ্রচার গ্রন্থ, একটি বাঙলা ব্যাকরণ ও বাঙলা-পর্তুগীজ শব্দকোষের রচনাকার এবং তাঁর পূর্ববর্তী গুরুভাই-এর আর একটি ধর্মপ্রচারের বই-এর সম্পাদনাকারী হিসেবে। মানোএল নিজে যে বইটি লেখেন তার নাম 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' [*Crepar Xasetrer Orth, bhed*]। দেশীয়গণের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি দ্বি-ভাষায় [পর্তুগীজ এবং বাঙলা] এই গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যাচ্ছে যে, ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দের ২৮ আগস্ট গ্রন্থ রচনা সম্পন্ন হয় এবং ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থকারের চেষ্টাতেই পর্তুগালের লিসবন শহর থেকে সম্পূর্ণ রোমান অক্ষরে এটি ছাপা হয়। লেখক বাঁদিকের পাতায় বাঙলা অংশ রোমান অক্ষরে এবং ডান দিকের পাতায় পর্তুগীজ ভাষান্তর লিপিবদ্ধ করেছেন। পরবর্তী ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা থেকে জানতে পাবা যাচ্ছে যে, 'অনুবাদের সময় বৃদ্ধ ফাদার মানোএল মাঝে মাঝে যখন ঝিমিয়ে পড়তেন, তখন দেশীয় অনুবাদক তাঁর অজ্ঞাতে খ্রীস্ট ধর্মবিরোধী নানা গালগল্প জুড়ে দিতো—এর ফলে মূল পর্তুগীজের সঙ্গে বঙ্গানুবাদের অমিল লক্ষ্য করা যায়। অধিকন্তু এই তথ্য সত্য হলে এখানে ব্যবহৃত বাঙলা থেকে প্রায় আড়াইশো বছরের আগেকার ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলের মৌখিক গদ্যের স্বরূপ-পরিচয়কেও জানতে পারি'।

গুরু এবং শিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে রোমান-ক্যাথলিক খ্রীস্টধর্মের মহিমা কীর্তন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সুপ্রচুর ব্যাখ্যার সাহায্যে এখানে খ্রীস্টতত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা আছে, তার মধ্যে একদিকে যেমন উৎকল্পনার সাহায্যে লেখকের ভাওয়াল ভ্রমণকে ভিত্তি করা হয়েছে, অপরদিকে তেমনি ছোট ছোট এবং কিছু এলোমেলো গল্পের সাহায্যে মূল নীতিসারগুলিকে বোঝাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। যেমন: পুঁথি—এক এবং পুঁথি—দুই। এখন 'কৃপার শাস্ত্র' থেকে কিছু উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে:

'গুরু। বড় আশ্চর্য কথা কহিলা; এমত হয়। আর কহ। সিদ্ধি ক্রুশ করিলে ভূতের কুমতি কি দূর যায়?

শিষ্য। হোয়! ভূতের কুমতি দূর যায় এবং ভূতেও পালায়। এহি শোনার প্রমাণ শোনো।

এক রাহোয়াল [রাখাল] মেড়ির আছিল। তাদের ভূতে বাজি দিয়া কহিল, তুই যদি আমার নফর হইতে চাইস, আমি তোরে অনেক ধন দিবাম। রাহোয়াল কহিলো: ভালো, তোমার দাস হইব, তোমি আমারে ধন দিবা।'

প্রায় আড়াই শতাব্দীর আগের একজন য়ুরোপীয় ধর্মপ্রচারকের কলমের এই বাঙলা রচনা আজও ঐতিহাসিকের কৌতূহল আকর্ষণ করে থাকে।

মানোএল-এর পরের কীর্তি বাঙলা ব্যাকরণ ও বাঙলা পর্তুগীজ শব্দকোষ গ্রন্থ রচনা। এই গ্রন্থটিও ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে লিসবন থেকে মুদ্রিত হয়। বইটির পূর্ণনাম হচ্ছে: *Vocabulario em Idioma Bengalla e Protuguez, dividido em duas du as partes dedicado as Excellent e Rever.* এই গ্রন্থের প্রথম চল্লিশ পৃষ্ঠা বাঙলা ব্যাকরণ এবং অবশিষ্ট অংশের প্রথম ভাগ বাঙলা-পর্তুগীজ ও দ্বিতীয় ভাগ পর্তুগীজ-বাঙলা শব্দকোষ। এ-গ্রন্থটিও আগাগোড়া রোমান হরফে লিখিত। এই গ্রন্থের ব্যাকরণ অংশের মুখবন্ধে যে আবেদন আছে তা থেকে খ্রীস্টানদিগের দেশীয় ভাষা চর্চার পেছনে কি কারণ অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিলো তা বোঝা যাবে। সেখানে বলা হচ্ছে: '…ইহাতে তুমি আর কিছু না হউক, অন্ততঃ দেশীয়দের ব্যবহৃত শব্দগুলির অধিকাংশ পাইবে।'

পরবর্তী ইতিহাস এবং কর্মপদ্ধতির গভীরতা ও ব্যাপকত্বের বিচারে পর্তুগীজ মিশনারীদের বাঙলা গদ্যচর্চার প্রচেষ্টা-উদ্যোগ-উপাদান খুবই স্বল্প ছিলো। কোন প্রত্যক্ষ প্রভাবও পরবর্তী ধারায় মিশ্রিত হয়নি, কিন্তু সামান্য একটা পাখীর ডাকে যেমন রাতের অবশেষ সূচিত হয়, তেমনি মানোএল বা দোম আন্তোনিওর ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সেদিন যে পথিকৃতের কাজ করেছিলো তার ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যাবে না।

১১. **'কালীমির্জা'**: হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায় ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ কালিদাস চট্টোপাধ্যায়-এর জন্ম হয়। দীর্ঘদিন পশ্চিমাঞ্চলে বাস, আচার-ব্যবহারে খানদানী মুসলমানী আদব-কায়দা অনুসরণের ফলে তিনি 'কালীমির্জা' নামে সাধারণ্যে পরিচিত হন। কালিদাসের পিতার নাম বিজয়রাম চট্টোপাধ্যায়। যেহেতু দীর্ঘদিন এবং প্রায় শৈশব থেকেই কালিদাস প্রবাসে কাটিয়েছিলেন সেহেতু দীর্ঘায়ু হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবন-কথা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। লক্ষ্ণৌ-বেনারসে বাস করে তিনি যেমন হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন তেমনি সংস্কৃত-ফার্সী প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্যেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। পশ্চিমের আরও কয়েকটি শহরে থেকে মুসলমান ওস্তাদদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদী সঙ্গীতের সঙ্গে টপ্পা-প্রভৃতি গান বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষা করেন। অনেকদিন পরে দেশে ফিরে কালিদাস সংসারী হন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য বর্ধমানরাজের সভা-গায়কের বৃত্তি গ্রহণ করেন। সেখানে বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় তিনি কলকাতায় গোপীমোহন ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং নাগর সমাজে তাঁর এতদিনের শিক্ষাকে উজাড় করে দেন—অচিরেই রসিক গায়ক ও গুণগ্রাহী মহলে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। অপর টপ্পা গায়ক নিধুবাবুর প্রতিভা-দীপ্তির মাঝখানেও কালীমির্জার টপ্পা-খেয়ালকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। আসলে কালীমির্জার সঙ্গীতের মধ্যে একটা আত্মোপলব্ধির

প্রাণময় উত্তাপকে খুব সহজেই অনুভব করা যেতে পারে। নিধুবাবুর খ্যাতি তাঁর প্রতিভাকে আড়াল করে ফেললেও এদিন বা সেদিনেও একটু অন্তরঙ্গভাবে কান পাতলেই উদার মানবিকতার পাদপীঠে কালীমির্জার পরিশীলিত মন ও অধ্যাত্মবোধের জগৎ থেকে জাত সহৃদয়-সঙ্গীতকে শুনতে পাওয়া যেতে পারতো, বা পারে। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে কালিদাসের মৃত্যু হয়।

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে 'গীতি-লহরী' নামে কালীমির্জার একটি গীতগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীমির্জার গানগুলির মধ্যে পূর্ব-কথিত হৃদয়ানুভূতির উত্তপ্ত স্পর্শ থাকায় অনেক ক্ষেত্রে একটি মধুর বেদনা উদ্বেল হয়ে উঠেছে; ফলে কেবল পাঠ্য কবিতা হিসেবেও তাদের মূল্য গৌণ হয়ে যায়নি। যেমন কবি যখন বলেন: 'কে গো ফিরে ধীর সমীরে, / বঙ্ক বিলোচনে চাহে ফিরে ফিরে।' কিংবা, 'আমি ঐ ভয়ে মুদিনে আঁখ।/ নয়ন মুদিলে পাছে তারাহারা হয়ে থাকি।/ যখন থাকি শয়নে / তখন ঐ ভয় মনে / না হেরে হারাই পাছে চাহিয়া ঘুমিয়ে থাকি॥' তখন আমরা সরস কবিত্ব-রস-পানে এবং সহজ ভাষা-সৌন্দর্যে তৃপ্তি পাই।

পরিশেষে, কালীমির্জার গানের বাণীরূপ এবং জীবন-রস-রসিকতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের কালের খুব উপযোগী। কবি কালীমির্জা তাঁর বেশ কিছু গানে নায়িকার ব্যথা-বেদনা ও ব্যর্থপ্রেমের আন্তর-দহন বর্ণনায় এমন একটি সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী আবেগ সৃষ্টি করতে পেরেছেন যাতে এ গীতি-কবিতার সভায় এসে ঠাঁই পেয়েছে। যেমন: 'আমি যারে চাই, তারে নাই পাই, / চাইনে কাহারও পানে। / মিলেছে ত চিত, / কহিতে উচিত, / বলিব তাহার স্থানে॥' প্রায় সাড়াইশ গান নিয়ে 'গীতি লহরী'টি সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে শ্যামাবিষয়ক, রাধাকৃষ্ণবিষয়ক, অপরাপর দেবদেবীবিষয়ক গান এবং প্রেম-সঙ্গীতও আছে। এর মধ্যেকার কিছু গান সেদিন খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলো।

১২. **'সমাচার দর্পণ'**: শ্রীরামপুরের ইংরেজ ও খ্রীস্টান মিশনারী দ্বারা 'সাপ্তাহিক সমাচার পত্র' হিসেবে জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদকত্বে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের ২৩ মে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত এটি দ্বিতীয় পত্রিকা। এর মাসখানেক আগেই ঐ একই ব্যক্তির সম্পাদনায় আর একটি বাঙলা মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়েছিলো ['দিগ্‌দর্শন']। এই পত্রিকায় সম্পাদক হিসাবে মার্শম্যানের নাম ছাপা থাকতো বটে, কিন্তু সম্পাদনার প্রকৃত দায়িত্ব ন্যস্ত ছিলো দেশীয় পণ্ডিতদের ওপর, এবং তাঁরা অনুপস্থিত থাকলে পত্রিকার পাতায় নতুন কোন সংবাদ ছাপা বন্ধ থাকতো। প্রথম দিকে পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ওপর সম্পাদকীয় বিভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিলো। এই পত্রিকার কণ্ঠভূষণ হিসেবে নিম্নলিখিত শ্লোকটি ছাপা থাকতো: 'দর্পণে মুখ সৌন্দর্যমিব কার্যাবিচক্ষণাঃ। / বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥'

আমরা এই 'সমাচার দর্পণ'কেই প্রথম বাঙলা সংবাদপত্র বলতে চাই। কারণ, সংবাদপত্রের যে কাজ, সংবাদ পরিবেষণ তা এই পত্রিকাতেই প্রথম আরম্ভ হয়। 'দর্পণে'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বক্তব্য ও কর্তব্য থেকেই তা বোঝা যাবে: 'এই সমাচারের পত্র প্রতি সপ্তাহে ছাপানো যাইবে তাহার মধ্যে এই ২ সমাচার দেওয়া যাইবে। ১. এতদ্দেশের জজ ও কলেক্টর সাহেবদের ও অন্য রাজকর্মাধ্যক্ষরদের নিয়োগ। ২. শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব যে ২ নূতন আয়িন ও হুকুম প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন। ৩. ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্য ২ প্রদেশ হইতে যে ২ নূতন সমাচার আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার। ৪. বাণিজ্যাদির নূতন বিবরণ। ৫. লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া। ৬. ইউরোপ দেশীয় লোক কর্তৃক যে২ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে এবং যে নূতন পুস্তক মাসে ২ ইংলণ্ড হইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যে ২ নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে। ৭. এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ।'

'সমাচার দর্পণে'র প্রকাশ-দিন ছিলো প্রতি শনিবার। এবং প্রকাশের পর প্রথম তিন সপ্তাহ এ-বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিলো। পরে মূল্য ধার্য হয়েছিলো প্রতি মাসে দেড় টাকা। এই 'দর্পণ' পত্রিকা নিয়ে এর প্রকাশক-পরিচালকবৃন্দ নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। যেমন: **ক** ১৮২৮-এর ৬ মে থেকে এর একটি ফারসী সংস্করণ ['আখবারে শ্রীরামপুর'—সাপ্তাহিক] প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ দীর্ঘজীবী হতে পারেনি। **খ** ১৮২৯-এর ১১ জুলাই থেকে 'সমাচার দর্পণ' দ্বিভাষিক [বাঙলা-ইংরাজী] রূপে আত্মপ্রকাশ করে। **গ** ১৮৩২ থেকে 'দর্পণ' সপ্তাহে দুবার [বুধ ও শনি] করে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়—কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বুধবারের সংখ্যাটিকে বন্ধ করে দিতে হয়।

প্রায় তেইশ বছর একনাগাড়ে চলার পর মার্শম্যান সরকারী কাজের দায়িত্ব পাওয়ার পর 'দর্পণে'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং দর্পণের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় [১৮৪১-এর ২৫ ডিসেম্বর]। এরপর দুবার চেষ্টা হয়েছিলো একে পুনর্জীবিত করার কিন্তু, অবশেষে ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে 'দর্পন' 'শ্রীরামপুরের গঙ্গার জলে প্রাণত্যাগ করে।'

আমরা আগেই প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি যে সেদিনের দেশী-বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস-সাহিত্য সম্বন্ধে দর্পণের সমান কৌতূহল ছিলো। অধিকন্তু সেদিনের বাঙলাদেশ, বাঙালীর সমাজ-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ সম্পর্কেও এই পত্রিকাটি সমান আগ্রহ পোষণ করেছে। অর্থাৎ সদ্য জাগ্রত বাঙালী জাতির জীবনের সব দিকে অনুসন্ধানী আলো ফেলে যে চিত্র সে তার পাতায় সংগ্রহ করে রেখেছিলো, আজ তার থেকে আমাদের কেবল ঐতিহাসিক কৌতূহলই নিবৃত্ত হচ্ছে না, একটা জাতির ভিতটি কোন উপাদানে নির্মিত হয়েছিলো তাও জানতে পারছি। সতীদাহ সম্পর্কে লেখা, নারী-শিক্ষার প্রসার, নানাবিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক

আন্দোলনের খবর একদিকে, অন্যদিকে কৌতুককর ও সরস-রসরচনা বা 'বাবু উপাখ্যান'-এর প্রকাশ—সম্মার্জন ও গঠন এই দ্বিবিধ কার্যধারা পরিচালনার মধ্যে দিয়ে সেদিন 'দর্পণ' এক মহামূল্যবান সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছিলো। ফলে, 'সমাচার 'দর্পণ' কেবল সংবাদপত্রের ইতিহাসের দিক থেকে নয়, বাঙলা-সামাজিক ও সাহিত্যিক ইতিহাসের দিক থেকেও সমান গুরুত্বের সঙ্গে আলোচ্য।

১৩. **'ভূতপত্রীর দেশ'** : শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৭১-১৯৫১]—যিনি তুলি দিয়ে ছবি লেখেন, আর কলম দিয়ে লেখা আঁকেন, তাঁর আর একটি অনন্য সাহিত্যকর্ম হচ্ছে এই 'ভূতপত্রীর দেশ' [১৯১৫]। অবনীন্দ্রনাথ একবার [১৯১১ খ্রীস্টাব্দে] পুরী থেকে কোণার্ক গিয়েছিলেন। 'বছর তিন-চারি পরে সেই নৈশ নিরুদ্দেশ-যাত্রার স্মৃতি-সূত্র অবলম্বনে মেয়েলি আলাপ ছেলেমি প্রলাপ ছড়ার বাক্‌ছন্দের এবং রূপকথার রঙের মিশ্রণে অদ্ভুত-কৌতুকরসের, স্বপ্ন-জাগরণের, সম্ভব-অসম্ভবের, অতীত-বর্তমানের বহু-মাত্রিক ও বিচিত্র-বর্ণময় মায়াপট বুনিলেন'—এই 'ভূতপত্রীর দেশ' গ্রন্থে। এতে শিল্পগুরুর আঁকা ছবি আছে—ভাষার ও রঙের দুয়েরই তুলনা নেই। অবশ্য রূপকথা-আশ্রয়ী, বাঙলার মেয়েলি ভাষা ও চিত্রকল্পনির্ভর অবনীন্দ্রনাথের এই ধরণের বইগুলি বাঙলা সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ—অসাধারণ বিশিষ্টতা মণ্ডিত। এর স্বাদ, এর বর্ণসুষমা, এর অক্ষরে অক্ষরে মা-মাটির স্নেহতপ্ত স্পর্শ গ্রন্থপাঠমাত্রই আমাদের অনাস্বাদিতপূর্ব রসলোকে পৌঁছে দেয়!

'ভূতপত্রীর দেশ' তিনটি গল্পাংশে ভাগ করা। প্রথম অংশে 'ভূতপত্রীর দেশ', তারপর আছে 'হাব্রুন্দের কথা' এবং সব শেষে আছে 'কিচকিন্দের গল্প'। তিনটি অংশেরই নায়ক অর্থাৎ লেখক—যিনি 'মাসি পিসি' দুজনেরই ডাকে পাল্‌কি চড়ে আগে এসেছেন মাসির বাড়ি। বরাবরই অনুযোগ ছিলো : 'মাসি পিসি বনগাঁবাসী বনের ধারে ঘর।/ কখনো মাসি বলেন না যে খই মোয়াটা ধর।' এবার কিন্তু আর তা হয়নি, মাসির বাড়ি পেট ভরে ধামা করে মোয় খাওয়া গেছে, পিসির বাড়ি যাওয়ার জন্যে এসেছে পাল্‌কি। এই পাল্‌কি চড়ে যেতে যেতে পথে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে লেখকের, তাই-ই শিশুর ভাষায়, মায়ের মমতায়, রূপকথার স্বপ্নে এবং অবনীন্দ্রনাথের ছবির রঙে ধরা আছে এই গ্রন্থে। আমরা এখানে ঐ বই থেকে কয়েকটা রঙিন লাইন চুপিচুপি তুলে আনবো, যা কাজল করে মনশ্চক্ষুর পাতায় লাগালে হুস করে হাব্রুন্দে বা কিচকিন্দের দেশে পৌঁছে যেতে পারা যাবে; যেখানে : 'তখন পিসির দেশের কালাচাঁদ নাচতে-নাচতে পূর্বদিকে অস্ত যাচ্ছেন আর সোনারচাঁদ নাচতে-নাচতে পশ্চিম দিকে উদয় হচ্ছেন। এই দুই চাঁদের আলোয় সমস্ত পৃথিবীটা গোবিন্দর মায়ের ফুলো গালের মতো খানিক আলো খানিক কালো দেখা যাচ্ছে। আকাশ দেখতে হয়েছে যেন হলদে-আর-কালো ডুরে শাড়িখানি। হাওয়া বইছে আধেক গরম আধেক ঠাণ্ডা।'

১৪. **নিধুবাবু [রামনিধি গুপ্ত]** : হুগলী জেলার ত্রিবেণীর সন্নিকটে চাঁপতা গ্রামে

১৭৪১ খ্রীস্টাব্দে রামনিধি গুপ্ত ওরফে নিধুবাবুর জন্ম হয়। এটি তাঁর মামার বাড়ী। বৈদ্যবংশ হিসাবে কবিরাজী করাই ছিলো এঁদের পারিবারিক পেশা। রামনিধির পিতা হরিনারায়ণ কোন এক সময়ে কলকাতার কুমারটুলি অঞ্চলে বাস আরম্ভ করতেন; সেই সময় থেকেই সেখানে আজও তাঁদের অধস্তন পুরুষেরা বসবাস করছেন। প্রায় সাত বছর বয়সে [১৭৪৭ খ্রীস্টাব্দ] নিধুবাবু পিতার সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন এবং কিছু সংস্কৃত, পারসিক ও একজন পাদ্রীর কাছ থেকে কিছু ইংরাজী শিক্ষা করেন। কিন্তু কোন প্রথাবদ্ধ শিক্ষালাভ তাঁর ঘটেনি। নিধুবাবু এক প্রতিবেশীর সহায়তায় ১৭৭৬ সালে ছাপরা জেলার কলেক্টরেটে একটি চাকরী সংগ্রহ করেন। বিহারে তিনি প্রায় আঠারো বছর চাকরী করার পর ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর উর্ধ্বতন কর্মচারীর সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় কর্মত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন। নিধুবাবুর তিনটি বিবাহ এবং তৃতীয়পক্ষের মধ্যমপুত্র জয়গোপাল কর্তৃক সঙ্কলিত হয়ে নিধুবাবুর একমাত্র গীতিগ্রন্থ 'গীতরত্ন' প্রকাশিত হয় ১৮৩৮-এ তাঁর মৃত্যুর সামান্য কিছু পূর্বে।

ছাপরায় বসবাস কালে এক মুসলমান ওস্তাদের কাছে রামনিধি খেয়াল ও টপ্‌পা শিক্ষা করতেন। কিন্তু কিছুদিন গান শেখার পরই তিনি বুঝতে পারলেন যে গুরু তাঁকে মন খুলে শিক্ষা দিতে নারাজ, তখন তিনি বাঙলাতেই ঐ ধরণের গানের অনুকরণে গান রচনা করে নিজস্ব রুচি-অনুযায়ী সুর-সংযোজনপূর্বক গাইতে থাকেন। পরে কলকাতায় এসে শোভাবাজারের কাছে এক বটতলায় চালা নির্মাণ করে প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে গানের আসর বসাতেন। অচিরেই গুণানুরাগী কিছু মানুষ তাঁর সঙ্গে জুটে যায়, যাঁদের মধ্যে সেকালের বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিও ছিলেন। অতি দ্রুত খেয়াল ও টপ্‌পা গাইয়ে হিসেবে, তাঁর প্রচারক ও রচয়িতা রূপে, নিধুবাবু সেদিনের কলকাতার এক প্রবাদ-পুরুষে পরিণত হন। নিধুবাবু কখনও পেশাদারী গায়ক ছিলেন না। যাই হোক, নিধুবাবু দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং একান্ত পরিণত বয়সে [১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে] প্রয়াত হন।

নিধুবাবুর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'গীতরত্নে'র প্রকাশের উদ্যোগ নেন কবি স্বয়ং। এ-প্রসঙ্গে তিনি নিজেই তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন: 'এই গীত সকলের অল্প অল্প অংশ অশুদ্ধ করিয়া আমার অজ্ঞাতে প্রচার করিতে লাগিল'; তাই তিনি তাঁর গানগুলির শুদ্ধরূপ নির্ধারণ করে বললেন: 'বঙ্গভাষায় এতাদৃশ গানের পুস্তক যথার্থ সম্পূর্ণ অভিনব নহে, তথাপি এ-ভাষায়, এমত গ্রন্থ, অন্যের পুস্তকের দৃষ্টান্ত মত কহা যাইতে পারে না।' তিনি ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের হুবহু অনুসরণ করেননি—তাঁর দক্ষতা অনুসরণকারীর নয়, সমীকরণাত্মক। নবনব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির শক্তিতে সৃষ্টিসুখের উল্লাসে তিনি 'রাগদ্বয়ে এবং রাগিণীদ্বয়ে মিলাইয়া কতক গীত প্রকাশ' করেছিলেন।

যেহেতু টপ্‌পার আদর্শ ছিলো শোরী মিঞা, সেহেতু নিধুবাবুর সমস্ত শ্রেষ্ঠ গানই হচ্ছে প্রেম-বিষয়ক। প্রেম মূল অবলম্বন হওয়াতেও তাঁর গানে কিন্তু কোন এক-

ঘেঁয়েমি আসে নি। কারণ যে জীবনাবেগকে অবলম্বন করে তাঁর প্রেম মঞ্জুরিত হয়েছে তা মর্ত্যমায়ার গাঢ় আবেগের অন্তস্তল থেকে রস আহরণ করেছে। তাই সেদিন বা আজকের সমালোচনায় তা রূঢ়ভাবে আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু তাঁরা: 'নয়নেরে দোষ কেন। / মনেরে বুঝায়ে বল নয়নেরে দোষ কেন।/আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মনমিলন। / আঁখিতে যে যত হেরে সকলি কি মনে ধরে, / যেই যাকে মনে করে সেই তার মনোরঞ্জন॥' / অথবা, 'না হতে পতন তরু দহন হইল আগে। / আমার এ অনুতাপ তারে যেন নাহি লাগে॥/ চিতে চিতা সাজাইয়ে তাহে দুখ তৃণ দিয়ে / আপনি হইব দগ্ধ আপনারি অনুরাগে॥ / —ইত্যাদি গানগুলি যদি পাঠ করতেন তা হলে গতানুগতিক দাম্পত্য প্রেমের বাইরে বাস্তব জগতের শরীরী স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে রোমান্টিক সৌন্দর্য-স্বর্গের কলাবতীর মোহিনীরূপকেও দেখতে পেতেন এবং বিমল ও অপার আনন্দ লাভ করতেন। পরিশেষে জনৈক বিশিষ্ট সমালোচকের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তাঁর কবি বৈদগ্ধ্যকে প্রতিষ্ঠিত করবো। তিনি বলেছেন: 'The characteristic charm and value of these Tappas lies in the fact that they are spontaneous and free··· They speak of love no doubt, and eternally engaging them with poets of all time ··The poet looks into his own hearts write ; he sings of his own feelings, his own joys and sorrows, his own triumph and defeat.'

১৫. **'সম্বাদ কৌমুদী'**: " 'সম্বাদ কৌমুদী' বাঙ্গালির সমাচার পত্র"। এর প্রথম সংখ্যার প্রকাশ তারিখ ৪ ডিসেম্বর ১৮২১ [২০ অগ্রহায়ণ ১২২৮]। তৎ-সমসাময়িক দুটি ঘটনায় বাঙালী কর্তৃক এই প্রথম সংবাদ পত্রটি প্রকাশিত হয়। ১. লর্ড হেষ্টিংস-প্রবর্তিত সংবাদপত্র-বিষয়ে নতুন নিয়ম ও আইন-কানুন এবং ২. 'সমাচার দর্পণ-'এ হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিহীনতা, কুলীনদের প্রতি কটূক্তির প্রতিবাদ করার ইচ্ছায় ও 'বাঙালী-পরিচালিত বাঙলা সমাচার-পত্রের অভাব' বিধায় কলকাতার কলুটোলা-নিবাসী দেওয়ান তারাচাঁদ দত্ত ও 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থ-লেখক এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই 'সম্বাদ কৌমুদী'-র জন্ম হয়। 'দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং। / রবিনা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ॥' এই শ্লোকটি ছিলো এই পত্রিকার কণ্ঠভূষণ। এই পত্রিকার মূল লক্ষ্য ছিলো: 'ধর্মনীতি ও রাষ্ট্র-বিষয়ক আলোচনা, আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী, দেশ-বিদেশের সংবাদ ও জ্ঞাতব্য তথ্য-সম্বলিত প্রেরিত পত্রাবলী প্রকাশ—এক কথায় লোকহিতসাধন।'

প্রতি মঙ্গলবারে এই কৌমুদি প্রকাশিত হতো, পরে [১৮২২, ১৬ই মার্চের পর] পত্রিকা মঙ্গলবারের বদলে শনিবার প্রকাশিত হতে থাকে। 'কৌমুদী'র জীবন কিন্তু নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হয়নি। নানা সময়ে বিভিন্ন হাত ফেরতা ও মালিকানা

বদল হয়ে প্রায় ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত চলে 'কৌমুদী'র প্রচার লোপ পায়। রামমোহন রায় বিলাত চলে গেলে একেবারে শেষের দিকে রামমোহন-পুত্র রাধাপ্রসাদ এই পত্রিকার পরিচালন ভার গ্রহণ করেন।

যিনিই এই 'কৌমুদী'-র সম্পাদক থাকুন না কেন, যাঁর ওপরেই এর পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকুক না কেন, রামমোহন রায়ই এই পত্রিকার প্রাণ এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি খ্রীস্টান, হিন্দু, মুসলমান সর্বধর্মের মধ্যেকার গোঁড়ামী ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতাকে আক্রমণ করে সুচিন্তিত প্রবন্ধ এর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত করতেন। এতে সংবাদ অপেক্ষা বিজ্ঞান-ধর্ম-সমাজ-নীতি এবং তৎসহ একেশ্বরবাদ সম্পর্কে প্রবন্ধই অধিক পরিমাণে দেখা যেতো। পরে ১৮২৭ সালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে এই পত্রিকাখানি সেই সমাজের মুখপত্ররূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। এর অনেক আগেই রামমোহন যখন সতীদাহের বিরুদ্ধে এই পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন তখন এই পত্রিকার আদি প্রতিষ্ঠাতা রক্ষণশীল ভবানীচরণ এর সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করেন [১৩ সংখ্যা ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৮২২ পর্যন্ত ভবানীচরণ এর প্রকাশক ছিলেন]। ভবানীচরণ 'সমাচার চন্দ্রিকা' [১৮২২ খ্রীস্টাব্দ ৫ মার্চ] প্রকাশ করেন। নতুন সমাজ-সংস্কারের পক্ষে 'কৌমুদী'—রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে রামমোহনের লেখনী-আশ্রয়ে সেদিন সমাজে যে কি দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো সে সম্পর্কে তৎকালীন একটি মন্তব্য এই রকম: 'The Paper which was considered so fraught with danger, and like to explode over all India like a spark thrown into a barrel of gunpowder,…chiefly we understand because it offended the Native Community, by opposing some of their customs, and particularly by Burning of Hindoo Widows.' অতএব এর থেকে প্রমাণিত হয় যে স্বল্পজীবী হয়েও এই 'কৌমুদী' সেদিন একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলো।

১৬. **ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় / পঞ্চানন্দ**: 'পঞ্চানন্দ' ছদ্মনামের আড়ালে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৪৯-১৯১১] 'ঊনবিংশ শতকের শেষপাদে ভারতের রাজনৈতিক ও বাঙলার সামাজিক জীবনে যে অসঙ্গতি-অসামঞ্জস্যের সুপ্রচুর সমাবেশ হইয়াছিল' তাকে ব্যঙ্গে, সূচীমুখে প্রপীড়িত করেই বাঙলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার পাণ্ডুগ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর পৈত্রিক বাস ছিলো এর চার ক্রোশ উত্তরে গঙ্গাটিকুরী গ্রামে—পিতার নাম বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি পূর্ণিয়ার উকিল ছিলেন, সেই বৃত্তি অনুসরণে ইন্দ্রনাথও কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতে আরম্ভ করেন। তারপর পূর্ণিয়ায়, দিনাজপুরে, আবার হাইকোর্ট হয়ে বর্ধমান কোর্টেই শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেন। মধ্যে ওকালতী-জীবনের প্রথমে বিহারের ডণ্ডখোবাতে

কিছুদিন মুন্সেফের চাকুরী করেন। এই আইন ব্যবসাকর্মের মধ্যে থেকেই ইনি বঙ্গভারতীর সেবাতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এরই মধ্যে ইন্দ্রনাথ 'পঞ্চানন্দ' নামে একটি রসপ্রধান পত্র ও সমালোচনা পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২৬শে অক্টোবর ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে। কাব্য-খণ্ডকাব্য-উপন্যাস-প্রহসন-গালগল্প-সন্দর্ভ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে ইন্দ্রনাথ প্রায় আট-নয়খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পরিণত বয়সে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে মার্চ গঙ্গাতীরে ইন্দ্রনাথের দেহান্ত হয়।

'কল্পতরু' [২১ জুন ১৮৭৪] বাঙলা-সাহিত্যে প্রথম ব্যঙ্গ উপন্যাস। এ-রকম উপাদেয় গ্রন্থ বাঙলা-সাহিত্যে খুব কমই রচিত হয়েছে। এই প্রথম উপন্যাসখানি হাতে নিয়েই ইন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্য-সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। এই উপন্যাসখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের পাতায় লিখেছিলেন : 'ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া, বাঙ্গালায় প্রধান লেখকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রহস্যপটুতায়,—মনুষ্য চরিত্রের বহুদর্শিতায়, লিপি-চাতুর্যে, ইনি টেকচাঁদ ঠাকুর এবং হুতোমের সমকক্ষ,...তাঁহার গ্রন্থ রত্নময়, সর্বস্থানেই মুক্তা প্রবালাদি ঝলিতেছে। 'কল্পতরু' বঙ্গভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।"

এ ছাড়াও 'ভারত উদ্ধার' [২ জানুয়ারী ১৮৭৮], যা তিনি 'খণ্ড-কাব্য' হিসাবে প্রচার করেছিলেন, সেটিও একটি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ-কাব্য। এই কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকা লিখেছিলো : "এই হাস্য-রস উদ্দীপক 'মহাকাব্য'খানি পাঠ করিতে করিতে আমরা গ্রন্থকর্তাকে শত শত সাধুবাদ দিয়াছি। বাস্তবিক এরূপ সরসগ্রন্থ আমরা অনেকদিন পাঠ করি নাই এবং বোধ হয় এরূপ বিদ্রূপাত্মক কাব্য [satire] বঙ্গভাষায় আর নাই।" ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফাঁক ও ফাঁকি, কপট-দেশপ্রেম লেখক সরস অথচ মর্মদাহী কৌতুকে এখানে উত্থাপিত করেছেন। আজও দেশপ্রেমে, জাতীয়তাবোধে যে চূড়ান্ত তঞ্চকতা, তার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু শব্দ পরিবর্তিত করে নিলে 'ভারত-উদ্ধার' কাব্যের তির্যক বক্তব্য মূল্যহীন বলে মনে হবে না। কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে প্যারডি করেছেন তাও বেশ সার্থক হয়েছে।

'পঞ্চানন্দ' ইন্দ্রনাথের অতুলনীয় কীর্তি। এখানে তিনি 'পঞ্চানন্দ' ছদ্মনামে গদ্যে পদ্যে যে সব সরস চুটকীগুলি রচনা করেছিলেন তাই ই পরে 'পঞ্চানন্দ', পাঁচুঠাকুর' নামে কয়েকখণ্ডে সঙ্কলিত হয়। এই সংকলনের মুখপাতে তিনি বলেছেন : 'রহস্য ও রসিকতা এক পদার্থ নহে। আমি সরস রহস্য লিখিতে পারিয়াছি কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু শুধু রসিকতার অনুরোধে কিছু লিখি নাই ...।'

এই জীবনবোধ, স্বদেশ সম্বন্ধে এই যথার্থ অনুরাগ থেকেই 'পঞ্চানন্দ' বা 'পাঁচুঠাকুর' বা 'কল্পতরু' অথবা 'ভারত-উদ্ধারে'র জন্ম। ফাঁক ও ফাঁকি, পরম ভারতীয়ত্ব, জাতীয় স্বার্থহানিকর আত্মপরতন্ত্রতাই চরম স্বাদেশিকতা, জনগণমঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় অবিরাম কুম্ভীরাশ্রু

বিসর্জনই দেশপ্রেম, খণ্ডবুদ্ধির তীক্ষ্ণ অস্ত্রে দেশমাতৃকার দেহ-ব্যবচ্ছেদই জাতীয়তাবোধ—এই অভিনব অভিনয়ের যে ধারা এদেশে বয়ে আসছে তার মর্মভেদে অসামর্থ্য-হেতু পঞ্চানন্দ সেদিন যেমন হতবুদ্ধি ও বিমূঢ় হয়ে রসিকতা করতে আরম্ভ করেছিলেন, আজ আমরা কিন্তু সেই রস-উৎপন্ন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে নিজেদের বিকৃত মূর্তিকে নিজেরাই ভেংচি কাটছি, আপনার মাথার চুল আপনি ছিঁড়ছি। এমন আশাভঙ্গ, এমন ব্যর্থতার গ্লানি, এরূপ আত্মপ্রবঞ্চনার মর্মজ্বালার মধ্যে হাসতে পারলে বোধ হয় জীবনের অনেক ব্যথা, ব্যর্থতার ভার লঘু হয়ে যেতো—এই জন্যই আজ 'পঞ্চানন্দে'র বড়ো প্রয়োজন। কারণ, আমরা একান্ত আশা করেছিলাম যে, 'পঞ্চানন্দের ভবিষ্যৎ সংস্করণ আগামী যুগের বঙ্গবাসীকে আমোদের ভিতর দিয়া শিক্ষা দিবে, ব্যঙ্গের কষাশাতে তাহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিবে এবং এই আশা পোষণ না করিলে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎকে অস্বীকার করা হয়।'

১৭ **'গীতাঞ্জলি'**: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'গীতাঞ্জলি' [১৯১০, সেপ্টেম্বর] কাব্যগ্রন্থটি কেবল বাঙলা বা ভারতীয় নয়, সমগ্র বিশ্বের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বিশেষ আলোচনা ও কৌতূহল আকর্ষণের দাবী রাখে। কারণ এই কাব্যগ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করে সুইডিশ আকাদেমী তাঁকে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্মান 'নোবেল প্রাইজ' উপহার দেন। সেদিনের পক্ষে পরাধীন ভারত বা এশিয়ার একজন কবির এই মহান সাহিত্য-পুরস্কার লাভ এক গৌরবজনক ঘটনা। এখানেই 'গীতাঞ্জলি'র গৌরব ও ঐতিহাসিক মূল্য।

মোট ১৫০টি কবিতা ও গানের সংকলন এই কাব্যগ্রন্থটি। অবশ্য 'গীতাঞ্জলি'র কবিতা বা গানগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার অনেক আগে থেকেই অন্যত্র কিছু কিছু প্রকাশিত হয়। যেমন, ১৯০৮ ও ১৯০৯-এ প্রকাশিত যথাক্রমে 'শারদোৎসবে' ও 'গানে' গীতাঞ্জলির কুড়িটি গান প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ বেশ কিছুদিন ধরেই এর কবিতা ও গানগুলি রচিত হচ্ছিল। এ-প্রসঙ্গে কবি নিজেও তাঁর গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বলেছেন : 'অল্প সময়ের ব্যবধানে যে সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া তাহাদের সকলগুলিই এই পুস্তকে বাহির করা হইল।'

'গীতাঞ্জলি'তে ধৃত সবগুলিই গান নয়। এর মধ্যে ৫৬টিতে সুর-দেওয়া, আর বাকিগুলি কবিতা বা সুর না দেওয়া গান। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, যে সময়ে এই 'গীতাঞ্জলি'র গান-কবিতাগুলি লেখা হচ্ছিল সেই সময়ে কবির জীবনে কর্মকোলাহল ও সংসার-সংগ্রাম অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু সে যাই হোক, অনেকে মনে করলেন যে এই গান-কবিতার অঞ্জলি কবি যেন তাঁর দেবতার পায়ে সসম্ভ্রমে নিবেদন করেছেন। আবার কেউ বললেন যে এখানে দেবতা, প্রকৃতি এবং মানব-প্রীতির গান অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা পড়েছে—'সৌন্দর্য ও সুন্দর একাঙ্গীভূত অদ্বৈত হইয়াছে। কবির যথার্থ আধ্যাত্মিক সংগীতের [spiritual as opposed to

religious] সূত্রপাত এই গীতাঞ্জলির পর্ব হইতে। সুতরাং এগুলিকে ব্রহ্ম সংগীত বলা ভুল হইবে।' এবং এই কারণেই বলা হয়েছে যে 'গীতাঞ্জলি' থেকেই মর্ত্যে ফেরার গানের সূচনা। আমরা এখানে 'গীতাঞ্জলি'র একটি গানের কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করছি : 'জগৎ জুড়ে উদার সুরে / আনন্দ গান বাজে, / সে গান কবে গভীর রবে / বাজিবে হিয়া মাঝে।'

সব শেষে রবীন্দ্রনাথের যে 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলো তার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। এ-সম্বন্ধে রবীন্দ্র-জীবনীকার জানাচ্ছেন 'রবীন্দ্রনাথ যখন আমেরিকায় সেই সময়ে লণ্ডনে ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হইল। এই গীতাঞ্জলি বা Song-offerings [*Gitanjali* (Song Offerings) by Rabindranath Tagore A collection of prose translation made by the author from the original Bengali with an introduction by W. B. Yeats.] বাঙলা গীতাঞ্জলির অনুবাদ নহে। ইহার মধ্যে গীতাঞ্জলির ৫১, গীতিমাল্যের ১৮, নৈবেদ্যের ১৬, খেয়ার ১১, শিশুর ৩ ও চৈতালি-স্মরণ-কল্পনা-উৎসর্গ-অচলায়তন হইতে একটি করিয়া মোট ১০৩টি কবিতা আছে।'

১৮. 'সুরধুনী কাব্য' : নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র [১৮৩০-৭৩] রচিত 'সুরধুনী কাব্য' গ্রন্থটি দু ভাগে বিভক্ত হয়ে [১ম ভাগ : ১৮৭১ ও ২য় ভাগ : ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দ] প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এর দ্বিতীয় ভাগটি প্রকাশিত হয় দীনবন্ধুর মৃত্যুর তিন বছর পরে। প্রকৃত কথা বলতে কি দীনবন্ধুর সাহিত্য-প্রতিভার যথার্থ স্ফূর্তি ঘটেছিল নাট্যকলার ক্ষেত্রে। যদিও 'প্রভাকরে'র পাতায় 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধে' লেখনী-শস্ত্র নিয়ে তাঁর সাহিত্য-রণাঙ্গনে আবির্ভাব এবং 'সুরধুনী কাব্য' ও 'দ্বাদশ কবিতা' কাব্যগ্রন্থদ্বয় রচনার দ্বারা সেই যুদ্ধবিদ্যাকে ঝালিয়ে নিতে, চাওয়া।*

এটি একটি ভ্রমণ-কাব্য হিসেবে গৃহীত হতে পারে। কবি এখানে গঙ্গার জন্মস্থান গোমুখী থেকে সাগরে পৌছানো পর্যন্ত পথের বর্ণনা করেছেন। এবং এই পথে যত দর্শনীয় স্থান আছে প্রায় সবেরই বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি বর্ণনা করার লোভে কবি গঙ্গার তীর অতিক্রম করে মাঝে মধ্যে কিছু দূরেও চলে গিয়েছেন; যেমন 'তাজমহল' ইত্যাদি। 'কখনো স্থানসূত্রে কিম্বদন্তী বা পুরাণ কথা বিবৃত হয়েছে। কোথাও মনীষীদের কীর্তির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কাব্যটিতে বিবরণ উল্লেখেরই বাহুল্য। মাঝে মাঝে কাহিনী কথন। কিন্তু এ-সব বর্ণনাও ভাষাচিত্র রূপে প্রকাশ

---

* এ-কারণেই বোধহয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আক্ষেপকে ['দীনবন্ধুকে আমরা বিস্মৃত হইতেছি'] সত্যে পরিণত করে প্রখ্যাত বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকার তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে এই কাব্যগ্রন্থটির নামোল্লেখ করতে পর্যন্ত ইচ্ছা করেননি।

পেলে সুরধুনী কাব্য সার্থক হয়ে উঠত এবং একটি তাৎপর্যে বা ভাবগত ঐক্যে বিচ্ছিন্ন অংশগুলি সূত্রবদ্ধ হলে সে-কবিত্ব সার্থক হত। তা হয়নি। সুরধুনী কাব্য একটি নূতন ব্যর্থ চেষ্টা।' এ সত্ত্বেও দীনবন্ধুর এই নতুন চেষ্টার মধ্যে যে অভিনবত্ব ছিলো, তার সঙ্গে যদি কিছু কবিতা হয়ে ওঠা যুক্ত হতো তাহলে বাঙলা সাহিত্য অবশ্যই একটি নবীন কাব্যাঙ্গিক লাভ করতো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই অনুষঙ্গে আমরা দীনবন্ধু-সুহৃদ বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু মন্তব্য এই কাব্য সম্পর্কে উদ্ধৃত করবো; উদ্দেশ্য এ-কালে সুরধুনী সম্পর্কে যে মনোভাব পোষণ করছি তার পূর্বপটটি কেমন ছিলো তা জানা। বঙ্কিম বলেছেন: " 'সুরধুনী কাব্য' অনেকদিন পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। আমার বিবেচনায় ইহা দীনবন্ধুর লেখনীর যোগ্য হয় নাই। বোধহয়, অন্যান্য বন্ধুগণও এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই জন্য ইহা অনেকদিন অপ্রকাশ ছিল।· তিনি সেই তরুণ বয়সে যে কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার অসাধারণ 'সুরধুনী কাব্য' এবং 'দ্বাদশ কবিতা' সেই পরিচয়ানুরূপ হয় নাই।·· সেই সকল কবিতা যেরূপ প্রশংসিত হইয়াছিল 'সুরধুনী কাব্য' এবং 'দ্বাদশ কবিতা' সেরূপ প্রশংসিত হয় নাই। তাহার কারণ·· 'সুরধুনী কাব্যে' ও 'দ্বাদশ কবিতা'র হাস্যরসের আশ্রয়মাত্র নাই" ['দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা']। এখন আমরা নিন্দিত-নতুন কাব্য থেকে কয়েক চরণ উদ্ধৃতি গ্রহণ করে দেখবো যে, কবি সুরধুনীর জবানীতে সিরাজের প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা ঐতিহাসিকতা অপেক্ষা কিংবদন্তীপ্রিয় মনোভাবের পরিপোষক। যেমন: 'ওপারে বিরাজে সেরাজুদ্দৌলা কবর, / শ্বেতশিলা বিনির্মিত ভাব ভয়ঙ্কর, / কোথা গেল বীরদম্ভ কোথা বা বিভব, / কোথা গেল অহঙ্কার কোথা বা গৌরব, / কৌতুক দেখিতে আর নদী মধ্যস্থলে / মানব-পূরিত তরি না ডুবায় জলে, / দেখিতে উদরে সুত কিরূপে বিহরে, / নাহি আর গর্ভিণীর উদর বিদরে, / নিদ্রা অনুরোধে আর সঙ্কীর্ণ কারায়, / ইংরাজে বিনাশ নাহি করে পিপাসায়, / রাজ্যপাট মান প্রাণ গিয়াছে সকল, / কবরের মাটি মাত্র এখন সম্বল।'

১৯. **গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য:** 'উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত বাঙলা সাময়িক সাহিত্যের স্তম্ভস্বরূপ যে কয়েকজন শক্তিশালী সাংবাদিক বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ [১৭৯৯-১৮৫৯] অন্যতম। এই খর্বাকৃতি ও তেজোদৃপ্ত ব্রাহ্মণ [খর্বাকৃতি বলিয়া 'গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য' নামে তিনি অভিহিত হইতেন] মাত্র পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সুদূর শ্রীহট্ট হইতে বিদ্যার্জনের জন্য নিঃসম্বল অবস্থায় নৈহাটিতে আসিয়া উপস্থিত হন এবং স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও কবি-খ্যাতির অধিকারী হইয়া ভাগ্যান্বেষণের জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। তৎকালে কলিকাতায় ধর্ম ও সমাজ আন্দোলনের যে আবর্ত সৃষ্টি হইয়াছিল, গৌরীশঙ্কর তাঁহার প্রগতিশীল মনোবৃত্তি ও চিন্তাধারা লইয়া সেই আবর্ত মধ্যে অবতীর্ণ হন এবং অল্পকাল মধ্যেই সে যুগের চিন্তানায়কগণের মধ্যে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান গড়িয়া ওঠে' [সাহিত্য সাধক চরিতমালা: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]।

সাংবাদিক হিসাবেই গৌরীশঙ্করের সমধিক প্রসিদ্ধি। সংবাদপত্র পরিচালনায় তাঁর শিক্ষানবিশী আরম্ভ হয় 'জ্ঞানান্বেষণ' [১৮৩১] পত্রিকায়। এরপর 'সম্বাদ ভাস্কর' [১৮৩৯, মার্চ], 'সম্বাদ রসরাজ' [১৮৩৯, নভেম্বর] 'হিন্দুরত্নকমলাকর' [১৮৫৭, ফেব্রুয়ারী] ইত্যাদি সাপ্তাহিক অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশনা-সম্পাদনা ও রচনা-কর্মের সঙ্গে গৌরীশঙ্কর আজীবন জড়িত ছিলেন। এ-ছাড়াও গৌরীশঙ্কর 'ভগবদ্গীতা' [৯ অধ্যায় পর্যন্ত : ১৮৩৫], 'জ্ঞানপ্রদীপ' [১৮৪০], 'ভূগোলসার' [১৮৫৩] 'মহাভারত' [কাশীরামদাসের পদ্যানুবাদের সংশোধন : উদ্যোগ-স্বর্গারোহণ পর্ব : ২য় খণ্ড : ১২৬২ বঙ্গাব্দ ইত্যাদি] গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও রসবোধের পরিচয় দেন।

আমরা আগেই বলেছি যে সংবাদপত্র সম্পাদনা ও সাংবাদিকতা ক্ষেত্রেই গৌরী-শঙ্করের ব্যক্তিত্ব সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে ও দৃঢ়রূপে স্ফূর্তিলাভ করেছিলো। তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক সম্পাদক ও সাংবাদিক। এখানে আমরা বেথুন সাহেব কর্তৃক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের সম্পর্কে তাঁর মত উদ্ধৃত করে তাঁর প্রগতিশীল চরিত্রের একটু উদাহরণ দেবো। তিনি ২৬শে মে ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দের 'সম্বাদ ভাস্করে' লিখেছেন : '…সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি তাহাতে কৃতকার্যও হইয়াছি …..এই ক্ষণেও সেই ভাবের ভাবক আছি, সহস্র ২ কি লক্ষ ২ লোক যদি আমারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন ; তথাচ আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল বাক্যই কহিব, ..' এই মনোভাব সেদিনের এক নৈয়ায়িক পণ্ডিতের পক্ষে কতখানি সাহসিকতার পরিচায়ক ছিলো তা আজকের দিনে বোঝা বা বোঝান কঠিন। এ-কারণেই তাঁকে সেদিনের প্রায় সমস্ত প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান ও সভা-সমিতিতে অংশ গ্রহণ করতে দেখা গেছে।

গৌরীশঙ্কর বিষয়ে আলোচনার সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্করের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন। কারণ, 'বয়সে গৌরীশঙ্কর ঈশ্বরচন্দ্রের অপেক্ষা বারো বৎসরের বড় ছিলেন। কিন্তু উভয়ের সাংবাদিক জীবন একই বৎসর—১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে আরম্ভ হয়। তারপর ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে একপক্ষ কালের ব্যবধানে লোকান্তরপ্রাপ্তি পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৮ বৎসর ধরিয়া সে যুগের সংবাদপত্র-জগতের এই দুই দিক্পালের জীবন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিল। গুপ্ত কবি তর্ক-বাগীশের পাণ্ডিত্য এবং সাংবাদিক হিসাবে তাঁহার কৃতিত্বের প্রশংসা করিতে কার্পণ্য করেন নাই।'

সব শেষে প্রবল ব্যক্তিত্বে অনমনীয় গৌরীশঙ্কর 'Being freed from his trammels of Hindoo superstition, he gladly embraces every opportunity of exposing the folly of the bigotted country-men and showing the great utility of cultivating European knowledge. সেদিনের 'ক্যালকাটা কুরিয়ারের' এই বিশ্লেষণই গৌরীশঙ্করের সম্বন্ধে প্রধান কথা।

২০. **উপেন্দ্রনাথ দাস:** 'দুর্গাদাস দাস' ছদ্মনামের অন্তরালে উপেন্দ্রনাথ দাস [১৮৪৮-১৮৯৫] 'শরৎ-সরোজিনী' [১৮৭৪] ও আরও দুটি নাটক রচনা করেন। ইনি ছিলেন হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল শ্রীনাথ দাসের পুত্র। ইনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন—এ-ছাড়া তাঁর বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানা যায় না। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পত্নীর মৃত্যুর পর ইনি দ্বিতীয় বারে এক বিধবা বিবাহ করেন। নট-নাট্যকার অমৃতলাল বসুর বন্ধুত্ব লাভ করে ইনি নাটক-নাট্যশালা ও নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে'র সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ সাধিত হয়। এখানে তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় নাটক 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' [১৮৭৫] অভিনীত হয়। ইনি পরে উক্ত রঙ্গমঞ্চের ডিরেক্টরও হয়েছিলেন। উপেন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রগতিশীল মনোভাবের মানুষ ছিলেন। পিতার সম্পত্তি ও সমাজের রোষ উপেক্ষা করে বিধবা-বিবাহ করেছিলেন, 'ইণ্ডিয়ান র‍্যাডিক্যাল লীগ' স্থাপন করেছিলেন এবং গোলাপ বা সুকুমারী নাম্নী অভিনেত্রীকে তিনি গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার সুব্যবস্থার মধ্যে সেদিনের বিচারে নিদারুণ দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনিই বোধহয় প্রথম নট ও নাট্যকার যিনি অভিনয় করার জন্য রাজরোষে পড়ে কারাবাস করেছিলেন। বহুলাংশে তাঁরই রাজনৈতিক প্রহসনগুলির বক্তব্যে উত্যক্ত হয়ে ইংরেজ সরকার ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'নাট্য-নিয়ন্ত্রণ' আইন পাশ করেন। আইন পড়বার জন্যে উপেন্দ্রনাথ এরপর বিলাত যান ও সেখানেও কিছু দিন তাঁকে কারাবাস করতে হয়। দেশে ফিরে তিনি দারুণ অর্থকষ্টে পড়েন। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে রচিত 'দাদা ও আমি' তাঁর শেষ নাটক। এটি অভিনয়ের দিক থেকে তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। ১৩০২ বঙ্গাব্দে উপেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

আধুনিক সমালোচনায় বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে উপেন্দ্রনাথের স্থান আলোচনা করতে গিয়ে হাল্কা ভঙ্গীতে বলা রয়েছে যে তিনি ছিলেন 'রোমাণ্টিক নাটকে রোমহর্ষক উদ্দীপনার' নতুন আমদানীকারক, 'সম-সাময়িক সমাজচিত্রনাট্যে খুন-জখমের বাড়াবাড়ি এবং পিস্তল-বন্দুক-লাঠির হুড়াহুড়ি'র প্রবর্তক এবং 'দেশ-প্রেমের উদ্দীপনার সঙ্গে দেশকে স্বাধীন করিবার উদ্দেশ্যে বৈপ্লবিক চেষ্টার' ব্যবস্থাপক। কিন্তু এই সমালোচনা যথার্থ সমাজ-ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী বর্জিত। এমনটি না হলে তিনি উপেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অবশ্যই বলতে পারতেন: ১. মধুসূদন-দীনবন্ধু-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ধারা বেয়ে বাঙলা নাটকে যে ক্রিয়া-প্রাধান্য ও বেগ যুক্ত হচ্ছিলো উপেন্দ্রনাথ সেই পথেই আরও সার্থকভাবে এগিয়ে এলেন। 'তিনি যদি আরও কিছুকাল নাট্যরচনায় ব্যাপৃত থাকতেন, তাহলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রায় একক প্রয়াস অনেকখানি শক্তি অর্জন করতো,—বাঙলা নাটকে গিরিশচন্দ্রের দীর্ঘস্থায়ী আধিপত্য এতটা অসপত্ন হতো না।' ২. উপেন্দ্রের তিনটি নাটকই 'কমেডি'—শেষেরটি আরও একটু লঘু হয়ে প্রহসনের কাছাকাছি পৌঁছেছে। কিন্তু প্রণয়মুখ্য

এই নাটকত্রয়ের নরনারীরা আধুনিক শিক্ষিত বিবেকবান মুক্তমনের, স্বাধীন প্রণয় পোষণ করেছে। এই প্রণয়-ব্যবহার আধুনিক জীবন ও জগতের খুব কাছাকাছি। ৩. উপেন্দ্রর নাটকের উপাদান ছিলো সমাজ-বাস্তবতা। তাঁর নিজস্ব শ্রেণী-চেতনার বাইরে না গেলেও অতীন্দ্রিয় রোমান্টিকতাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। 'উচ্চবিত্ত শিক্ষিত যুবশ্রেণীর ভাব ও কর্মের জগতটি ফুটিয়ে তুলবার বাসনা তাঁর ছিল এবং পারিপার্শ্বিক সমাজ জীবনে উত্থিত চিন্তার ও মানস আন্দোলনের অগ্রবর্তী-পশ্চাৎমুখী দুটি ধারাকেই তিনি চিত্রিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। অলীক কল্পনা বা অতীত ইতিহাসের ধূসরতায় পরিভ্রমণ করবার বাসনা তাঁর একবারও হয় নি।' ৪. নাট্য-কারের দৃষ্টিভঙ্গী একান্ত প্রগতিশীল, সামাজিক সমস্ত কুপ্রথার প্রতি আক্রমণে নির্মম, অন্যায়ের প্রতি আপোসহীন, দেশের পরাধীনতার ব্যথায় সত্যই পীড়িত। আধুনিক জীবনাচার, সাহিত্য-বিজ্ঞান ইত্যাদির চর্চা-সাধনা-প্রচার সমগ্র দেশের সঙ্গে অন্তঃপুরকেও পরিপ্লাবিত করুক এই ইচ্ছা তাঁর নাটকের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সবশেষে, ৫. উপেন্দ্র স্বল্পবস্ত সম্বল করে কিছু দুর্বল ক্ষমতা নিয়ে, বাঙলা নাট্য-সাহিত্য ও নাট্য-প্রয়োজনার ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেও তাঁর প্রচেষ্টার মধ্যে কোন খাদ ছিল না, চিন্তার মধ্যে কোন জড়তা ছিলো না এবং বাস্তববোধের ক্ষেত্রে কোন ভণ্ডকের মুখোশ ছিলো না। এইখানেই উপেন্দ্রের ঐতিহাসিক সিদ্ধি।

২১. **'নবান্ন'** : আধুনিক বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিজন ভট্টাচার্যের [১৯১৭-১৯৭২] 'নবান্ন' [১৯৪৪] নাটকটি নানা কারণেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নাটকটি রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে নাট্যকারের বক্তব্য : "ঘরে যেদিন অন্ন ছিলো না, নিরন্নের মুখ চেয়ে সেদিন আমি 'নবান্ন' লিখেছিলাম। নাটক আরম্ভ করেছিলাম ১৯৪২ সালের জাতীয় অভ্যুত্থান আগস্ট আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়ে।" আমিনপুরের কৃষক প্রধান সমাদ্দার এবং তার পরিবারের কাহিনীই 'নবান্ন' নাটকের উপজীব্য।

১৯৪৪ সালেই 'নবান্ন' মঞ্চস্থ হয়। মঞ্চস্থ হবার পর সেদিনের সংবাদ-সাময়িক পত্রের পাতায় নানাভাবে এর সমালোচনা হতে থাকে। যেমন : 'যুগান্তর পত্রিকা' বলেছে [২৭।১০।১৯৪৪] : 'আগস্ট আন্দোলন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পটভূমিকায় এই নাটকের গল্পাংশ রচিত এবং সমাজের যাহারা একেবারে নীচের তলায় বাঙ্গালার সেই দুঃস্থ কৃষকের জীবন ইহার মধ্যে প্রতিফলিত। ইহা সত্য সত্যই গণজীবনের প্রতিচ্ছবি। এই ধরণের নাটক শুধু নূতনতর আর্ট হিসাবেই প্রশংসনীয় নহে, দুঃস্থ নিপীড়িত মনুষ্যত্বের প্রতি ইহা যে বেদনা জাগ্রত করে তাহার মূল্য অনেক।' এই নাটক ও তার অভিনয় সম্পর্কে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' একটি বড় কথা বললো : "For the first time since Dinabandhu Mitra's 'Nildarpana' truly peasant's drama has come upon the Bengali stage." অভিনয় দক্ষতায়, নতুন বিষয় ইত্যাদি নিয়ে প্রশংসা করা সত্ত্বেও 'পরিচয়' পত্রিকা বললো : 'নাটক হিসেবে 'নবান্ন'কে মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলে না। গল্পের অখণ্ডতার চেয়ে ঘটনার

ব্যাপ্তি এবং নাটকীয় আবেগের একাগ্রতার চেয়ে বৈচিত্র্যই বেশী লক্ষণীয়।...[একে] গত দু-বছরের বাঙলা দেশের ইতিহাস ও সমালোচনা বলা যায়, একে সুদৃঢ় গল্পের ভিত্তিতে নাট্যরসাশ্রিত করে তোলা যুগান্তকারী প্রতিভার অপেক্ষা রাখে। সেই প্রতিভার পরিচয় আজও পাওয়া যায় নি।" [কার্ত্তিক : ১৩৫১]।

এ-সব সত্ত্বেও 'নবান্ন' সেদিন নানা দিক থেকে কতকগুলি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলো। ১ নাটকের মধ্যে দিয়ে সাম্যবাদী মতাদর্শ প্রচারিত হলো। ২. যুদ্ধকালীন কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ' যুক্ত ছিলো এবং ঐ সঙ্ঘের সদস্য ছিলেন বিজনবাবু। তাই বিজনবাবুর ঐ নাটক থেকেই 'গণনাট্য আন্দোলনে'র সূত্রপাত হলো। ৩. দেশের যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তারা সরাসরি এই প্রথম নাটকের আশ্রয়ে মঞ্চে জায়গা পেলেন। ৪. সাহিত্য-শিল্পের একটি মাধ্যম হিসেবে,—বাইরের জীবনে যে 'গণ-আন্দোলন' দেখা যাচ্ছিলো, তা জায়গা পেয়ে নাটককে সত্যিকারের গণনাট্য করে তুললো। ৫. "১৮৬০-এ লিখিত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' মারফত বাঙলার কৃষক প্রথমে মঞ্চে এসেছিলো"; নবান্নের মাধ্যমে কৃষক সমাজের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে জনসাধারণকে যুক্ত করে দেওয়ার চেষ্টা হলো এই প্রথম। ৬. একেবারে মাটির সঙ্গের মানুষদের নিয়ে, বাস্তবতাসমৃদ্ধ অভিনয়ধারার সৃষ্টি করে নবান্ন ভবিষ্যৎ বাঙলা নাটকের অভিনয়-প্রযোজনা-মঞ্চসজ্জা-বেশভূষা-দৃশ্যপট এককথায় সমগ্র নাট্যাভিনয়ের ধারাকেই পরিবর্তিত করে দেয়। ৭. গোঁড়া পেশাদারী রঙ্গমঞ্চকেও 'নবান্ন' গণমুখী, বাস্তব নাটক অভিনয় করতে উৎসাহিত করে। ৮. 'নবান্ন' নাটক থেকেই এক-নায়কত্বের উচ্ছেদ ঘটে। এখন থেকে সমগ্র কুশীলবই সামগ্রিক বা যৌথ নায়কত্ব গ্রহণ করে। ৯. একক অভিনয় প্রতিভার আকর্ষণ অপেক্ষা 'টীম ওয়ার্ক'-ই নাট্য-বেগ ও কৌতূহল জাগিয়ে তুললো। ১০. নাট্য-প্রয়োজনার খরচ কমে গেলো এবং যে-কোনও-না-বাঁধা মঞ্চে নাটক করা সহজ হয়ে গেলো। অতএব 'নবান্ন' নাট্য-সাহিত্য ও নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছে।

২২. **হাফ-আখড়াই :** এখানে 'আখড়াই' গানের পরিচয় দেওয়ার অবকাশ নেই। তবে অনুমান যে সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব আখড়ায় জন্ম বলে এর এই নাম। রাগ-রাগিণীর নৈপুণ্যময় খেলা, রাধাকৃষ্ণ লীলার বিষয়, পরে ভবানী বিষয়কে গ্রহণ করে আখড়াই ধীরে ধীরে বিবর্তিত হতে থাকে। এরপর দ্বিতীয় ও সমৃদ্ধতম স্তর হচ্ছে নিধুবাবুর আমলে। তারপরে নিধুবাবুর জীবনের অন্তিম স্তরে আখড়াই সঙ্গীত ধীরে ধীরে লোপ পায়। এবং এর জীর্ণ কাঠামোয় নতুন উপাদান যোগ করে এই 'হাফ-আখড়াই' গানের উৎপত্তি হয়। কারণ 'আখড়াই গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর নেই, দু-পক্ষের মধ্যে যে-দলের গান-বাজনার সুর ভালো হতো, সেই দলই হত জয়ী'। অথচ এখানে 'সংগ্রাম হইয়াছিল, কিন্তু ইহা প্রকৃত আখড়া গান নহে এবং কবিওয়ালার মতও বলা যায় না, এজন্য অনেকেই কহেন নিম আখড়া অথবা কেহ কহেন হাফ আখড়ার লড়াই হইয়াছিল।' 'হাফ-আখড়াই'-এর সঙ্গীতক্রম এই রকম : 'চিতান—পরচিতান

—ফুকা—ডবলফুকা—মেলতা। মহড়া-শওয়ারি—খাদ ফুকা—ডবলফুকা—মেলতা।' এই 'হাফ-আখড়াই' গানের কিভাবে সৃষ্টি হয় সে-সম্পর্কে মনোমোহন বসু যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এই রকম: 'নিধুবাবু প্রাচীন হইয়া পড়িলেন ..ইহাতেই বোধহয় বহু কৃচ্ছ্রসাধ্য আখড়াই আমোদ বন্ধ হইয়া গেল।...এই রূপে চলে, একদা কোনো ধনশালী মল্লিকবাবুদের ভবনে ..বাগবাজারের সহিত জোড়াসাঁকোর কবি যুদ্ধ হয়।...বাগবাজারের সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ জয় হইল।' এই সাফল্যের উৎসাহে বাগবাজার দল পরবর্তীকালে আরো ভালো ও নতুন ধরণের গান শোনাবেন বলে আশ্বাস দিয়ে ফেললেন। কিন্তু কি সেই গান তা এই আশ্বাসদাতাও জানেন না এবং শিক্ষক মোহনচাঁদবাবুও জানেন না। তখন মোহনচাঁদ গভীর চিন্তার অবশেষে এক নতুন সঙ্গীত-রীতির উদ্ভাবন করলেন: 'আখড়াই এখন হওয়া ভার, বিশেষ তাহা তো পুরাতন—একটা নূতন কিছু চাই—তবে কেন আখড়ায়ের অনুকরণে হাফ-আখড়াই করি না? রাগ-রাগিণীর মত নৈপুণ্যময় খেলা ও অত ভাঁজ ছাড়িয়া দিই, অথচ দাঁড়া-কবি হইতে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ হউক—অথচ তাহার ন্যায় ইহাতে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলুক।'...মোহনচাঁদবাবু প্রথম প্রথম হাফ আখড়ায়ের যে সুর করিয়াছিলেন তাহা তত ভাল হয় নাই—ক্রমে তাহার এত উৎকর্ষ করিয়া তুলিয়াছিলেন যে তাহার তুল্য নাই, মূল্য নাই।"

উক্ত নতুন রীতির সঙ্গীত-সংগ্রাম যে দিন আরম্ভ হলো সেই দিন থেকেই 'হাফ আখড়াই'-এর জন্মতারিখ ধরা যেতে পারে। 'সমাচার দর্পণে'র ২৮।১।১৮৩২ তারিখের সংখ্যায় 'সমাচার চন্দ্রিকা' থেকে উক্ত সঙ্গীত-সংগ্রামের খবর দেওয়া হয়েছে। সুতরাং হাফ-আখড়াই-এর সূচনা হলো ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে। আমরা এখানে হাফ-আখড়াই-এর উক্ত অনুষ্ঠানে বাগবাজারের দলের একটি গান উদ্ধৃত করবো: "চিতেন। বলনা ছলনা কেন আর। / বচনে, গেল এক্ষণে, প্রতিজ্ঞা তোমার॥ / ডাকো পুরোহিত, কর হিত, সন্নিহিত, হবে যশ। / রবে বশ, তোমার নবরসে, করবো কত যশ॥ / যতনে রাখিবো তোমায় হৃদয় নিবাসে, / ওরে প্রাণ রে, প্রাণ আমার নিবাসে। / যাবে প্রেম ক্ষুধা কোরো সুধা পান।"

২৩ 'বাঁশরী': রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর মধ্যে যেগুলি স্বল্পপরিচিত অথচ কোন না কোন দিক থেকে বিশিষ্ট এমন একটি সৃষ্টির নাম 'বাঁশরী' [১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ]। বৈদগ্ধ্যপূর্ণ সংলাপ, তীক্ষ্ণ ও ঋজু বাচনভঙ্গী এবং আধুনিক সমাজ-সমস্যা নিয়ে এই ছোট নাটকটি [৩টি অঙ্ক ও ৬টি দৃশ্য] রচিত হয়েছে। এটি একটি সামাজিক নাটক, তবে সেই সমাজ উচ্চবিত্ত, উচ্চশিক্ষিত, অভিজাত। বিষয়বস্তুর দিক থেকে মিল না থাকলেও ভাবের থেকে এবং রচনার সময়ের দিক থেকে এই নাটকটির সঙ্গে 'শেষের কবিতা'র বেশ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ইস্পাতের তরোয়ালের মতো ঝকঝকে বাঁশরী ও রাজকুমার সোমশঙ্করের প্রেম, মধ্যে সুষমার ত্রিকোণ উপস্থিতির সমস্যা নাটকটির মধ্যে গতি এনেছে। পুরন্দর নামে এক সন্ন্যাসীর

ছাত্রী সুষমা তাকেই ভালোবাসে কিন্তু তাকে পাবার উপায় নেই। বাস্তববাদী আধুনিক সাহিত্যিক ক্ষিতীশকে প্রত্যাখ্যান ও সোমশঙ্করকে বাঁশরীর বরণ করার মধ্যে দিয়ে কাহিনীতে যবনিকাপাত হয়েছে।

২৪. 'মডেল ভগিনী': প্রখ্যাত 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু [১৮৫৪-১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ] চার ভাগে সমাপ্ত 'মডেল ভগিনী' উপন্যাসটি রচনা করেন [১৮৮৬-৮৯]। এই বিরাট উপন্যাসের মূল উপজীব্য ব্যঙ্গ। যোগেন্দ্রচন্দ্র ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-দৃষ্টির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ব্যঙ্গের কলম হাতে নিয়ে বঙ্গভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তবে তাঁর ব্যঙ্গে ঝাঁজ বড় বেশি, ব্যক্তিগত আক্রমণের স্পৃহা অত্যধিক, রুচি অমার্জিত স্থূলতায় কখনও কখনও ভারি। ইনি সমাজের ভণ্ডামি-অন্যায়কে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে জর্জরিত করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই আঘাত হেনেছেন সব সময়েই রক্ষণশীলতার দুর্গে দাঁড়িয়ে। ব্রাহ্মধর্ম তাঁর হাতে বড় মার খেয়েছে—'মডেল ভগিনী'তে সেই আঘাতের পরিচয় আছে। এক ব্রাহ্ম মহিলাকে তিনি কি ভাষায় আক্রমণ করেছেন তার একটু উদাহরণ দিই: 'সেই প্রকাণ্ড হরিতাল-রঙের হলে কি দেখিলাম? দেখিলাম, এক পীনোন্নত-পয়োধরা, আলুলায়িতকেশ, বিবিধ বর্ণের বেশ-ভূষিতা বরবর্ণিনী রমণী একাকিনী সেই ল্যাজ-বিশিষ্ট চেয়ারে অধিষ্ঠিতা। ···ও হরি! এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই;—পায়ে এষ্টাকিন!! মাগী কে গো? এমন গুমট গ্রীষ্মে দিন-দুপুরে যে মেয়ে-মানুষ এষ্টাকিন এঁটে বসে থাকতে পারে, তার কি অসাধ্য কিছু আছে?'

সেদিন 'তাবৎ ব্যঙ্গ-উপন্যাসের মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্রের মডেল-ভগিনীর প্রচার হইয়াছিল সর্বাধিক।'

২৫. 'রাসেলাস': সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র তারাশঙ্কর [চট্টোপাধ্যায়] তর্করত্নের রচিত 'রাসেলাস' [১৮৫৭] একটি সুপরিচিত গদ্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি জনসনের সুবিখ্যাত *Rasselus* উপন্যাসের অনুবাদ। লেখক একে 'A Free Translation' বলে উল্লেখ করেছেন। তারাশঙ্কর সংস্কৃতে পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও বাঙলার প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করেননি—তাই এখানকার ভাষা অনেক বেশি সহজ-সরল। এখানে 'রাসেলাসে' ব্যবহৃত ভাষার নমুনা গৃহীত হলো: 'তিনি নির্জনে বসিতেন, নির্জনে বেড়াইতেন, মনে মনে সর্বদাই নানাপ্রকার চিন্তা করিতেন। চিন্তায় এরূপ মনোনিবেশ করিতেন যে ভোজনের সময় নানাবিধ সুখাদ্য সামগ্রী সম্মুখে থাকিত, তিনি খাইতে খাইতে বিস্মৃত হইতেন।'

২৬. দাঁড়া কবি: অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে কলকাতায় বা শালকের বা গুপ্তি-পাড়ায় এই তিনের মধ্যে যে-কোন এক স্থানে জাত, জাতিতে কর্মকার রঘুনাথ দাসকে 'দাঁড়া কবি'র সৃষ্টি কর্তা বলা হয়ে থাকে। প্রকরণের দিক থেকে 'দাঁড়া কবি' ও 'হাফ আখড়াই'-এর মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। যেমন দাঁড়া কবির ক্রম এই রকম: চিতান— পরচিতান— ফুকা— মেলতা— মহড়া— শাওয়ারি— খাদ-ফুকা— মেলতা

—অন্তরা। এর মধ্যে 'হাফ-আখড়াই'তে অন্তরা নেই এবং ফুকার পরে ডবল ফুকা ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ হাফ আখড়াই-এর প্রবর্তক মোহনচাঁদ বসুকে 'দাঁড়া কবি'র, 'সখের দাঁড়া কবি'র স্রষ্টা বলে মনে করেন।

আসলে হাফ-আখড়াই, দাঁড়া কবি, সখের দাঁড়া কবি, পেশাদারি এদের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। এ-বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন: " 'হাফ আখড়াই' 'দাঁড়া সখের কবি' ও 'পেশাদারি' কবিতার গাহনার প্রণালী একই প্রকার। কিছু মাত্রই প্রভেদ নাই। প্রথমে 'চিতেন' পরে 'মহড়া' সর্বশেষে 'অন্তরা' গাহিতে হয়, কিন্তু লিখন কালে অগ্রে মহড়া, পরে চিতেন, শেষ অন্তরা লিখিতে হইবে। পাঠকগণের মধ্যে যাহারা অবিদিত আছেন, তাঁহাদিগের বিদিতার্থ লিখিতেছি যে পাঠকালীন প্রথমে 'চিতেন' পরে 'মহড়া' তৎপরে 'অন্তরা' পাঠ করিবেন, এবং সুর করিয়া গাহিতে হইলেও উক্ত নিয়ম অবলম্বন করিবেন।"

এরই সমর্থনে ড. ভবতোষ দত্ত বলেছেন: "তখন কবিগানকে বলা হত দাঁড়া কবি। 'দাঁড়া কবি' কথাটার অর্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। দীনেশচন্দ্র সেন, সুশীলকুমার দে ['Their very name *Danda Kabi* indicates perhaps the peculiar way in which they extemporised their songs, standing like a rhapsodist before a motley assembly,…' Dr. Dey] উভয়েই আসরে দাঁড়িয়ে গাওয়া গান অর্থেই এই শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন। সুকুমার সেনের মতে যে কবিগানে উত্তর প্রত্যুত্তরের ধরা বাঁধা পালা বা গান ছিল তাকেই বলা হত 'দাঁড়া কবি'। আর যেখানে পালা বা গান উপস্থিত মত রচনা করা হত তাকে বলত সাধারণ কবি বা 'কবি গান'। ঈশ্বর গুপ্তের একটি উক্তি থেকে দাঁড়া কবির অর্থের আভাস পাওয়া যায়—'তাঁহারা পেশাদারি দাঁড়া কবির সুরে গান করিয়া বসিয়া গাহিতেন'। এতে বোধ হয় দাঁড়িয়ে গান গাওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এসব বাদ বিতর্কে প্রবেশ না করেও আখড়াই এবং দাঁড়া কবির যুগপৎ অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে বাধা নেই।"

আমরা এখানে একটা দাঁড়া কবিগানের কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করছি: 'অন্তরা: আর কি, হবে হে এমন দিন, পুন যাবে ব্রজেতে। / আর কি হে হরি, হইবে কাণ্ডারি, যমুনা পার হোতে॥ / চিতেন: আর কি কদম্বতলে, কৌশলে, লবে দান পশরা। / কহে রঘুনাথো, হবে মনোনীতো, সকল ব্রজবাসি জনার।'

২৭ মীর মশারফ হোসেন: উনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান লেখকদের মধ্যে মীর মশারফ হোসেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ১৮৪৭ সালে নদীয়া জেলায় লাহানি-পাড়া গ্রামে মীরের জন্ম হয়। ছাত্রাবস্থা থেকেই মীর বাঙলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি তাঁর লেখালেখির প্রথম অবস্থায় কলকাতার 'সংবাদ প্রভাকর' এবং কুমারখালির 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় সংবাদ লেখক হিসাবে আত্মনিয়োগ করেন। বলা যেতে পারে এইখানে তাঁর সারস্বত সেবার আরম্ভ। মীর সাহেব বাঙলা সাহিত্যের

একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অক্ষরকুমার মৈত্রেয়র মন্তব্য "মীর সাহেবের পূর্বে মুসলমান লিখিত বঙ্গসাহিত্যে কবিতা ছিল, পড়িবার মত গদ্য ছিল না। এখন অনেকে সুখপাঠ্য গদ্যগ্রন্থ রচনা করিতেছেন, মুসলমান গদ্য-লেখকবর্গের মধ্যে এখন পর্যন্তও মীর সাহেব সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত। কুষ্টিয়া নিবাসী মীর মশারফ হোসেন বাল্যকাল হইতেই বঙ্গসাহিত্যে নিতান্ত অনুরক্ত। কাঙ্গাল হরিনাথ ইঁহার সাহিত্যগুরু। কুষ্টিয়া একদা নীল বিগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার যথার্থ কাহিনী মীর সাহেব 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' নামক এক বিচিত্র উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ...তৎকালে একজন মুসলমানের পক্ষে ভাল বাংলা রচনা করিবার বহু বাধাবিঘ্ন বর্তমান ছিল, তাহা অতিক্রম করিয়া মীর মশারফ হোসেন যে সাহিত্য-শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।"

গদ্য ও পদ্য মিশিয়ে মীর সাহের প্রায় পঁচিশের বেশী গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে তাঁর 'বিষাদসিন্ধু' [মহরম পর্ব ১৮৮৫, উদ্ধার পর্ব ১৮৮৭, এজিদ বধ পর্ব ১৮৯১] নামক গ্রন্থখানি সর্বাপেক্ষা পরিচিত। এই গ্রন্থ সম্পর্কে গ্রন্থকার স্বয়ং বলেছেন, "চান্দ্রমাসের বৎসরের প্রথম মাসের নাম মহরম। হিজরী ৬১ সালের ৮ই মহরম তারিখে মদিনাধিপতি হোসেন ঘটনাক্রমে সপরিবারে কারবালা ভূমিতে উপস্থিত হন, এবং এজিদ প্রেরিত সৈন্যহস্তে রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন ; সেই শোচনীয় ঘটনা মহরম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই ঘটনার মূল সারাংশ লইয়া 'বিষাদসিন্ধু' বিরচিত হইল।" এই গ্রন্থটি সেকালে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সেই সম্পর্কে দুটি ছোট মন্তব্য উদ্ধৃত করি। প্রথমটি ১২৯১ সালে 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকায়' প্রকাশিত হয়। 'প্রসিদ্ধ মহরমের আমূল বৃত্তান্ত বিষাদসিন্ধুর গর্ভ পূর্ণ হইয়া বিষাদসিন্ধু নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। ইহার এক একটি স্থান এরূপ করুণরসে পূর্ণ যে, পাঠকালে চক্ষের জল রাখা যায় না। ...মুসলমানদিগের গ্রন্থ এরূপ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অল্পই অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।' 'ভারতী' পত্রিকা লিখেছে [১২৯৩]: 'ইহা মহরমের একখানি উপন্যাস ইতিহাস। ইহার বাংলা যেমন পরিষ্কার, ঘটনাগুলি যেমন পরিস্ফুট, নায়ক-নায়িকার চিত্রও ইহাতে তেমনি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে একজন মুসলমানের এত পরিপাটী বাংলা রচনা আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

মীর সাহেবের 'জমিদার দর্পণ' নাটকটিও [১৮৭৩] লেখককে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা দান করেছে। নিজে জমিদার সন্তান হয়েও জমিদারের অত্যাচার সম্পর্কে এমন গ্রন্থ রচনা তাঁর উদার মানব-প্রীতির পরিচায়ক। তাঁর 'গোজীবন' রচনাটিও এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ্য।

মীর মশারফের সাহিত্য-কৃতিত্ব সম্বন্ধে সবশেষে জনৈক সমালোচকের মন্তব্যটি উল্লেখ্য: "বাংলা দেশে বাংলা সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের দান সম্পর্কে যদি

স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা চলে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, একদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে স্থান, অন্যদিকে হোসেনের স্থান ঠিক অনুরূপ। ঐ দেশের মুসলমান সমাজে তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্যশিল্পী এবং এখন পর্যন্ত তিনিই প্রধান সাহিত্যশিল্পী হইয়া আছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' অন্যদিকে 'বিষাদসিন্ধু' বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পঠিত হয়, বাংলাসাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ হিসাবে সকল সমাজেই এই গদ্য কাব্যখানির সমান আদর। আর একটি কথা আজ তাঁহার সম্পর্কে আমাদের স্মরণীয় তিনি জীবনে এবং সাহিত্যে সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিলেন, হিন্দু মুসলমান—বঙ্গমাতার এই দুই বিবদমান সন্তানের মিলন-সাধনের জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যপ্রতিভা এমনই উচ্চশ্রেণীর ছিল যে, সুদূর অতীতের কারবালা প্রান্তরের ট্রাজেডিকে তিনি সমগ্র বাংলা ভাষাভাষীর ট্রাজেডি করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন।"

এই বিশিষ্ট সাহিত্যিক ১৩১৮ সালের শেষভাগে দেহত্যাগ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'হজরত ওমরের ধর্ম-জীবন লাভ' [কবিতা], 'আমার জীবনী', 'বিবি কুলসুম', 'গাজীমিঞার বস্তানী' 'সঙ্গীত লহরী' ইত্যাদি প্রধান।

২৮. **'ভদ্রার্জুন':** 'ভদ্রার্জুন' নাটকখানি ১৮৫২ সালে প্রকাশিত হয়। নাটকটির রচয়িতা তারাচরণ শিকদার। এই নাটকটিকে বাঙলা সাহিত্যে অন্যতর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটকরূপে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ভদ্রার্জুন ইংরেজী ও সংস্কৃত এই দ্বিবিধ আদর্শে রচিত মৌলিক মধুরাস্তিক নাটক। এর কাহিনী মহাভারতের সুভদ্রা এবং অর্জুনের পরিচিত প্রণয়কাহিনী। লেখক সংস্কৃত নাট্যরচনা রীতির দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাকে আদ্যন্ত অনুসরণ করেননি। তিনি সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুযায়ী নান্দী, প্রস্তাবনা, বিদূষক ইত্যাদি ব্যবহার করেননি। নাটকটি পঞ্চাঙ্ক। ইংরেজী রীতি অনুযায়ী এই অঙ্ক বিভাগ করা হয়েছে। তিনি দৃশ্য বা scene অর্থে সংযোজক স্থল ব্যবহার করেছেন। তিনি নাটক আরম্ভের পূর্বে পয়ারে ইংরেজী নাটকের Prologue-এর মত 'আভাস'-এ কাহিনীর পূর্বকথা বর্ণনা করেছেন।

ভদ্রার্জুন নাটকটি কখনও অভিনীত হয়েছিল বলে সংবাদ পাওয়া যায় না। পাঠ্য-নাটক হিসাবেও কোনদিন সমাদর লাভ করেনি। এ-নাটকটি সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য: "ভদ্রার্জুন সার্থক রচনা নয়। বলদেব ছাড়া কোন প্রধান ভূমিকাই ফুটে নাই। অপ্রধান ভূমিকাগুলি মন্দ নয়, বিশেষ করিয়া ভীম, রোহিণী এবং দুঃশাসন। সপত্নী দেবকীর পছন্দ না হইলেও বলদেবের নির্বাচিত পাত্র বলিয়া দুর্যোধনকে সুভদ্রার যোগ্য পাত্র বলিয়া সমর্থন করায় রোহিণী চরিত্রে একটু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। নায়িকা সুভদ্রার ভূমিকা একেবারে ব্যর্থ।"

নাটক হিসেবে ভদ্রার্জুনের অনেক দুর্বলতা থাকলেও লেখক এই নাটকের ভূমিকায় তৎকালীন বাঙলা নাটক, বাঙালীর নাট্যচেতনা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, 'পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় নাটকেরই আঙ্গিক সম্পর্কে

তারাচরণের যে যথার্থ জ্ঞান ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় তিনি প্রাচ্য নাটকের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া, বাংলা ভাষায় প্রথম নাটক রচনা-কালেই যে পাশ্চাত্য নাটককেই সর্বতোভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দূরদর্শিতারই পরিচায়ক।'

এই দূরদর্শিতাই আধুনিক বাঙলা নাটকের জন্মক্ষেত্রকে প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছে। তারাচরণ বাঙলার নাট্যচিন্তার ক্ষেত্রে যে সংস্কার-মুক্তির আন্দোলন সৃষ্টি করলেন তারই ফল অচিরেই রামনারায়ণের মধ্যে দিয়ে মধুসূদনে এসে পৌঁছলো। এই হিসেবে আমরা 'ভদ্রার্জুন'কে বাঙলা নাটকের ক্ষেত্রে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকি।

২৯. 'জাগরী': বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে সতীনাথ ভাদুড়ীর [১৯০৬-১৯৬৫] প্রতিভা অভিনবত্বে এবং তার প্রয়োগের পদ্ধতিতে বহুলাংশে প্রচলিত রীতি থেকে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছে। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা সাত। এই সাতখানি উপন্যাসে সতীনাথ বাঙলা সাহিত্যের পূর্বসূরীদের স্বভাব থেকে সরে এসেছেন। সেই সরে আসার চিহ্ন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জাগরী'তেই [১৯৪৫] সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সতীনাথের এইটিই প্রথম রচনা এবং এই একটি মাত্র রচনা দিয়েই তিনি বাঙলা সাহিত্যের আসরে নিজের বিশিষ্ট স্থানটি সংগ্রহ করে নেন। সতীনাথ ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অকৃতদার এবং গান্ধী আদর্শে অনুপ্রাণিত। তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তাঁর এই সংগ্রামী মনোভাব, রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে পরিচয়, সর্বোপরি মানুষের প্রতি অতলান্ত মমত্ব তাঁকে একজন সার্থক কথাকাররূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। রাজনীতি করতে গিয়ে সতীনাথ ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ সাল সময়সীমায় তিন তিনবার কারাবরণ করেন। এই অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে, ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে পটভূমিকায় রেখে, গান্ধীর অহিংসাবাদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামে র‍্যাডিক্যাল মনোভাব ও মার্কসীয় দর্শনের মশলা মিশিয়ে তিনি তাঁর 'জাগরী'র ভিত্তি তৈরি করেছেন। এই জন্যই 'জাগরী'কে কেউ কেউ বলেছেন বাঙলা সাহিত্যের প্রথম 'কারা উপন্যাস', কেউবা 'রাজনৈতিক উপন্যাস, কেউবা 'আঞ্চলিক উপন্যাস' হিসেবে একে আখ্যাত করতে চেয়েছেন।

'জাগরী' উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক সতীনাথ মন্তব্য করেছেন। "রাজনৈতিক জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই আলোড়নের তরঙ্গ-বিক্ষোভ কোন কোন স্থলে পারিবারিক জীবনের ভিত্তিকেও আঘাত করেছে। এই রকম একটি পরিবারের কাহিনী 'জাগরী'।" গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী বিহারের এক গ্রাম্য আদর্শবাদী শিক্ষক, তাঁর স্ত্রী, তাঁর দুই ছেলে বিলু এবং নীলু এই চারটি চরিত্রকে অবলম্বন করে এই উপন্যাসের কাহিনী বয়ন করা হয়েছে। ১৯৪২ সালের 'ভারত রক্ষা' আইনে ধৃত ফাঁসীর আসামী বড় ছেলে বিলুর কাল সকালে ফাঁসী হবে। 'ফাঁসী সেলে' বন্দী বিলুর স্মৃতিপটে সমস্ত গত-কাহিনী

এবং তৎ-আনুষঙ্গিক চরিত্রগুলি বর্ণিত হয়েছে। ঐ একই জেলে প্রথম শ্রেণীর বন্দী হিসেবে আটক আছেন বিলুব বাবা। তাঁর স্বগত ভাবনার মধ্যে দিয়ে কাহিনীর আরেকটি দিককে ফোটানো হলো। ঐ জেলেরই 'আওরাত কিতায়' বন্দী আছেন বিলুর মা। কাল ভোরে বড় ছেলের ফাঁসী হবে এই সংবাদ তাঁকে কিভাবে আলোড়িত করেছে তারই সূত্র ধরে পিছনের ঘটনাকে মায়ের মনের পর্দায় প্রতিফলিত করা হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে ছোট ছেলে নীলু—যে বিলু এবং তার বাবার বিরুদ্ধ-রাজনৈতিক মতবাদ পোষণ করে, সে জেলগেটে অপেক্ষা করছে ফাঁসীতে মৃত দাদার দেহ গ্রহণ করবার জন্যে।

এই চারজনের মানসিক চিন্তা বৈপরীত্যের পটভূমিকায় লেখক এক অসাধারণ কাহিনী বয়ন করেছেন। প্রথম রচনাতেই লেখক এমন একটা শক্তি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন যার বিন্দুমাত্র ঘাটতি পড়লে সমগ্র উপন্যাসটি রস হারিয়ে রাজনৈতিক প্রচারের মুগুররূপে পাঠকের মাথা চুরমার করে দিতে পারতো।

৩০. **'জ্ঞানান্বেষণ'**ঃ বাঙলা সংবাদপত্রের ইতিহাসের প্রথমযুগে 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৩১ সালের ১৮ই জুন এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি কলকাতার চোরবাগান থেকে উদারপন্থী 'ইয়ং বেঙ্গলের' মুখপত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। সরকারী তরফ থেকে ৩১শে মে ১৮৩১ সালে দক্ষিণানন্দ (পরে দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়ে পত্রিকাটির সম্পাদনাভার গ্রহণ করে প্রকাশ করতে থাকেন। দক্ষিণানন্দ নামে সম্পাদক হলেও 'জ্ঞানান্বেষণে'র যাবতীয় কর্তব্যই সম্পাদন করতেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। এই দু-জনের মতবাদের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত, সেদিনের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ তরুণের লেখনী দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে, রামমোহনের সময় থেকে বাঙালীর চিন্তাক্ষেত্রে যে প্রগতিবাদের সূচনা হয় তারই ঐতিহ্যকে 'জ্ঞানান্বেষণ' লালিত করতে থাকে। 'জ্ঞানান্বেষণে'র শিরোভূষণরূপে গৌরীশঙ্করের রচিত সংস্কৃত এবং বাঙলায় যে কবিতা দুটি মুদ্রিত হতো তা থেকেই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে: 'এহি জ্ঞান মনুষ্যাণামজ্ঞানতিমিরং হর। / দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর॥ / বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন। / দয়া সত্য উভয়কে করিয়া স্থাপন॥ / লোকের অজ্ঞানরূপ হর অন্ধকার। / একেবারে শঠতারে করহ সংহার।' দক্ষিণানন্দের পরে প্রখ্যাত রামকৃষ্ণ মল্লিক এবং মাধবচন্দ্র মল্লিক পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এঁদেরই চেষ্টায় ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের প্রথমভাগ থেকে জ্ঞানান্বেষণের একটি ইংরেজী সংস্করণও প্রকাশিত হতে থাকে। রামগোপাল ঘোষও 'জ্ঞানান্বেষণের' একজন প্রধান লেখক ও সমর্থক ছিলেন। সমকালীন বাঙলার উদারনৈতিক চেতনা সঞ্চারে 'জ্ঞানান্বেষণে'র অবদান ছিল প্রচুর। দশ বছর প্রকাশিত হবার পর ১৮৪০ সালে 'জ্ঞানান্বেষণ' লুপ্ত হয়।

৩১. **রাজেন্দ্রলাল মিত্র / 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'**ঃ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে সমস্ত ব্যক্তি আপন প্রতিভা বা মনীষার দ্বারা তৎকালীন বঙ্গীয় জীবনে নতুন চিন্তার

প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর পাণ্ডিত্য, পুরাতত্ত্বের জ্ঞান, গভীর অধ্যয়ন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে শ্রদ্ধা তাঁকে কেবল দেশেই নয়, বিদেশের পণ্ডিতমহলেও প্রতিষ্ঠা দান করেছে। বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালীর জীবনে জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলালের অবদানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন : "তাঁহার গভীর অধ্যয়ন এবং অক্লান্ত গবেষণার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদির বহু অজানা অন্ধকার-কক্ষ অভিনব আলোক-সম্পাতে প্রোজ্জ্বল হইয়া ওঠে; কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্য এবং গবেষণাক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য নহে। আর একটি কারণেও রাজেন্দ্রলালের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়, সেটি মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অপরিসীম অনুরাগ। ইহার কল্যাণ, পরিপুষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি প্রতিনিয়ত চিন্তা করিতেন এবং কর্মব্যস্ত জীবনেও সাধ্যমত এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিতেন। প্রথম সচিত্র বাঙলা মাসিকপত্র—'বিবিধার্থ সংগ্রহ' সম্পাদন, বাংলা পুস্তক সমালোচনায় নব ধারার প্রবর্তন, ভৌগোলিক পরিভাষা গঠন প্রভৃতি বিবিধ সাহিত্য-প্রচেষ্টার অন্যতম পথিকৃৎরূপে তিনি বঙ্গসাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া আছেন।"

১৮২২ সালে কলিকাতার শুঁড়া অঞ্চলে রাজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। রাজেন্দ্রলালের ছাত্রজীবন গৌরবময়। তিনি কিছুকাল মেডিকেল ছাত্র ছিলেন, পরে তা ছেড়ে দিয়ে আইন অধ্যায়ন করেন। তিনি ইংরেজী ছাড়া ফার্সী, সংস্কৃত, হিন্দী ও উর্দু ভাষাতেও ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। রাজেন্দ্রলালের মণীষার সঙ্গে তাঁর কর্মক্ষেত্র এশিয়াটিক সোসাইটির নাম বিশেষভাবে জড়িত। তিনি দেশের সামাজিক, সারস্বত, রাজনৈতিক ও বহুবিধ জনহিতকর উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেকে সবসময় যুক্ত রাখতেন। তাঁর মহৎ প্রতিভা ও চরিত্রগুণ তাঁকে সেকালের বিদ্বৎমণ্ডলীর শীর্ষে স্থান দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই কারণে বলেছেন যে 'তাঁহার মূর্তিতেই তাঁহার মনুষ্যত্ব যেন প্রত্যক্ষ হইত।' ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে এই মহান কীর্তিধরের দেহান্ত ঘটে।

রাজেন্দ্রলালের বহুমুখী প্রতিভা যে কত বিষয়কে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করেছিলো তা তাঁর 'প্রাকৃত ভূগোল', 'শিল্পিক দর্শন', 'শিবাজীর চরিত্র', 'মেবারের রাজেতিবৃত্ত', 'ব্যাকরণ প্রবেশ' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনাতেই প্রমাণিত হয়েছে। ইংরেজী এবং সংস্কৃতেও তাঁর রচিত ও সম্পাদিত কিছু গ্রন্থ রয়েছে।

রাজেন্দ্রলালের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব পত্রিকা সম্পাদকরূপে। তিনি কিছুকাল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার পরে তিনি নিজেই ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে বিলাতের পেনি ম্যাগাজিনের অনুসরণে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাঙলা ভাষায় এটাই ছিল প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা। 'পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণিবিদ্যা শিল্পসাহিত্যাদিদ্যোতক'—এই পত্রিকা তৎকালে বিবিধ জ্ঞানপ্রচার এবং শিল্পগত উৎকর্ষ সৃষ্টিতে অনন্য-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছিলো। একদিকে যেমন, 'এমন অল্প বিষয় ছিল যে সম্বন্ধে তিনি ভালো করিয়া আলোচনা না করিয়া ছিলেন

এবং যাহা কিছু তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল তাহাই তিনি প্রাঞ্জল করিয়া বিবৃত করিতে পারিতেন'। এই দুর্লভ গুণের সমন্বয়ে রাজেন্দ্রলালের দ্বারা সম্পাদিত হয়েও কিন্তু এই পত্রিকা দীর্ঘায়ু হতে পারেনি ; এরপর তিনি কিছুদিন 'রহস্য সন্দর্ভ' [১৮৬৩] পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। এটিও ছিল মাসিক পত্র।

এই দুই পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়সমূহ বক্তব্যের গাম্ভীর্যে ও বিষয়ের মর্যাদায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র উত্তরসাধক হলেও এতে ব্যবহৃত গদ্য ভাষাই পরবর্তীকালের শিক্ষিত সমাজের ভাষা ব্যবহারের পরিচয়টিকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। সমকালীন সাহিত্যগ্রন্থের পত্রিকার পৃষ্ঠায় সমালোচনার রীতির প্রথম উদ্ভাবক রাজেন্দ্রলাল। 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' পৃষ্ঠায় এর প্রথম প্রবর্তন হয়। পরবর্তী ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে 'বঙ্গদর্শনে' এসে বাঙলা সাময়িকপত্রের ইতিহাস যে নতুন আলোকোজ্জ্বল দিকে মোড় ফিরলো, তার গোড়াপত্তন হয় রাজেন্দ্রলালের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'।

৩২. 'গণদেবতা' : সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের [১৮৯৮-১৯৭১] অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'গণদেবতা' ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রথমে 'চণ্ডীমণ্ডপ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল, পরে গ্রন্থবদ্ধ করার সময় লেখক-এর নামকরণ করেন 'গণদেবতা'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর [১৯১৪-১৮] কালে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার যে আন্দোলন শুরু হয়, তিনের দশকে 'কল্লোল' পত্রিকা তার নেতৃত্ব দান করেছিলো। এই কল্লোল পত্রিকায় তারাশঙ্করের প্রথম আবির্ভাব। বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। তারাশঙ্কর তাঁর সেই রুক্ষ রাঢ় অঞ্চলের মাটিকে 'মা' বলে গ্রহণ করে তার মানুষ ও জীবনকে একান্ত সহানুভূতি ও অন্তরঙ্গতার সঙ্গে চিত্রিত করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতায় কোন খাদ ছিল না, তাই তাঁর নির্ভেজাল মাটির কথা, সেই মাটির মানুষগুলোর কথা, অচিরেই বিদগ্ধ বাঙালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করল। 'গণদেবতা' এইরকম এক জীবনদর্শনের মহৎ সাহিত্য ফসল।

তিন-চারের দশকে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ সংক্ষুব্ধ হচ্ছে তারই পটভূমিকায় এই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। তিনি এখানে আধুনিক যন্ত্রশক্তির সঙ্গে সংগ্রামরত ক্ষয়িষ্ণু গ্রামবাঙলার একটি প্রাণবন্ত চিত্র এঁকেছেন। পুরাণো মূল্যবোধ যেগুলি অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে, তাকে দেবু মাষ্টার, তর্করত্নমশাই প্রবল আবেগে আঁকড়িয়ে রাখতে চাইছে—অপরদিকে ছিরুপাল নতুন আর্থব্যবস্থার প্রতিনিধি হিসাবে 'Asiatic mode of production'-কে পরিবর্তিত করতে চাইছে। এই সংঘর্ষকে বিরাট এক গ্রাম্য ক্যানভাসে রেখে লেখক বহুবর্ণের চরিত্রের মাধ্যমে আঁকবার চেষ্টা করেছেন। পাতু বায়েন, দুর্গা, অন্তরীণ বন্দী তরুণ, অনি কামার ও তার বউ পদ্ম এই সব চরিত্রের মিছিল তাঁর এই উপন্যাসে অনন্য বর্ণসুষমা সৃষ্টি করেছে।

তারাশঙ্কর 'গণদেবতা'য় মুমূর্ষু, অক্ষম, দুর্বল গ্রাম-সমাজের নির্জীব, নিশ্চেষ্ট প্রাণের

চেহারাটাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন। গ্রাম্য মানুষের দারিদ্র্য, তাদের হাসি-কান্না এবং লোকায়ত জীবনের নানা খুঁটিনাটি বর্ণনা, পালপার্বণ, লৌকিক আচার-আচরণ একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে, অসীম মমতায়, কোন কোন স্থলে ফটোগ্রাফিক detail-এ বর্ণনা করে গেছেন। সব মিলিয়ে তারাশঙ্করের 'গণদেবতা' আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের মহৎ উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম।

৩৩. **'পদ্মানদীর মাঝি'**: সাম্প্রতিক বাঙলা উপন্যাস-সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের [১৯১০-১৯৫৬] ঔপন্যাসিক প্রতিভা বিস্ময়কর। তিনি আকস্মিক ভাবে বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিজ্ঞানের ছাত্র, বন্ধুদের সঙ্গে বাজী রেখে বাঙলা সাহিত্যের চর্চা করতে এসে আধুনিক কথাসাহিত্যের ধরণটাকেই পাল্টে দিলেন। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন, আধুনিক জীবনযন্ত্রণা এবং শেষজীবনে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর সাহিত্য-মানস উত্তরণের কয়েকটি স্তরকে চিহ্নিত করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নীচের তলার মানুষদের সম্পর্কে অফুরন্ত প্রত্যক্ষজ্ঞান। এইসব বৈশিষ্ট্যে সমন্বয়ে সৃষ্ট অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল হচ্ছে 'পদ্মানদীর মাঝি' [১৯৩৬] উপন্যাস। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া মাত্রই বাঙালী পাঠক এক অভিনব জগতে পৌছে গেল। অথচ এই জগৎ আমাদের কাছে অপরিচিত ছিলো না, আমাদের চোখের সামনেই কুবের, গণেশ, হোসেন মিঞা, মালা, কপিলারা সব সময়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ তাদের দেখার চোখটাই আমরা খুঁজে পাইনি। পদ্মার বুকে মাছ ধরিয়ে জেলেদের একেবারে নীচুতলার জীবন নিয়ে, তাদের নৌকা-নদী-জাল-মাছ, মাছ ধরার কৌশল নিয়ে, গ্রাম্যজীবন-যাত্রা, কলহ-কলরব, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-বঞ্চনা নিয়ে, ঐ পদ্মাতীরেরই ভাষা ব্যবহার করে এমন উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যে এর আগে আর রচিত হয়নি।

পদ্মা একটি নদী। এই উপন্যাসের পটভূমিকাও রচনা করেছে এই নদী। এই নদী যাদের জীবন-যাপনের উপকরণ যোগায়, স্তন্যদায়িনী মা রূপেই তাদের প্রতিপালিত করে। আবার ঐ নদীই রাক্ষসীরূপে তাদের সুখ-সমৃদ্ধি আশা-স্বপ্নকে ভাসিয়ে দেয়, নদীর বুকের এবং তীরের দুই ধারের জগৎ ও জীবনকে মানিক এই উপন্যাসে আণুবীক্ষণিক দৃষ্টি দিয়ে, কোনো ভাবাবেগ প্রকাশ না করে, কোন হৃদয়দুর্বলতার পরিচয় না দিয়ে ছোট ছোট 'statement'-এর মতো করে প্রকাশ করেছেন। এবং প্রতিটি চরিত্র যেন নিজেদের জীবনকথা ও বক্তব্য নিয়ে পাঠকের দরবারে হাজির হয়েছেন—যেখানে লেখক নিস্পৃহ বিধাতার মতো। সব মিলিয়ে 'পদ্মানদীর মাঝি' বাঙলা সাহিত্যে আজও অনন্য।

৩৪. **ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়**: উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যাঁরা বাঙালীর সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে মঙ্গল চিন্তা করেন,—জাতীয় চৈতন্যের সেই অপরিণত কালেই নিজেদের মত করে একটা পথ খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে একজন। ভবানীচরণ ১৭৮৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতার নাম রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রথাবদ্ধ শিক্ষা না পেলেও

বাঙলা ফার্সী এবং কিছু কিছু ইংরেজী ভাষা-জ্ঞান অর্জন ও ইংরেজের অধীনস্থ কয়েকটি হৌসে চাকরী করে আপন কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়ে বিলক্ষণ ধনোপার্জন করেন।

ভবানীচরণ রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় নতুন এবং পুরাতনের সংঘর্ষে সেদিন যে হলাহল উত্থিত হয়েছিল ভবানীচরণ তাকে অমৃতে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষায় আপন জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই কর্মবীর, যথার্থ দেশানুরাগী ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে Friend of India তাঁকে 'One of the ablest man of the age' বলে উল্লেখ করেন।

ভবানীচরণের প্রধান পরিচয় একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক হিসেবে। রামমোহন প্রবর্তিত 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রে এঁর সাংবাদিকতার হাতেখড়ি এবং এক সময়ে এ-বিষয়ে তিনি রামমোহনের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হন। কিন্তু রামমোহনের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে মনোভাবের সঙ্গে একমত হতে না পেরে ঐ পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করে নিজেই ১৮২১ সালে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একটি পৃথক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্র অচিরেই রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্ররূপে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনি বাঙলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ব্যঙ্গরচনার পথপ্রদর্শক। তাঁরই হাতে সেদিনের শুষ্ক তরু বাঙলা গদ্য মঞ্জুরিত হয়ে উঠল। ব্যঙ্গের তীব্র কষাঘাত ব্যবহার করে তিনি পথভ্রান্ত বাঙালীকে কর্মের, শীলতার ও মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর সাহিত্য-কৃতিত্ব সম্বন্ধে সমালোচক বলেন: "নীরস শাস্ত্রীয় বিচার বিতর্কের যুগে তিনি বাঙলা ভাষায় যে লালিত্য ও রসসঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঠিক ইতিহাস রচিত হইলে সে সংবাদ বাঙালীর অগোচর থাকিত না। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপপূর্ণ সামাজিক চিত্র রচয়িতা হিসেবে তাঁহার নাম সর্বাগ্রে করিতে হয়। ১৮২১-২২ খ্রীস্টাব্দে 'সমাচার দর্পণ' পত্রে 'বাবুর উপাখ্যান', 'শৌকীন বাবু', 'বৃদ্ধের বিবাহ', 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত', 'বৈষ্ণব', 'বৈদ্য সম্বাদ' এই কয়টি বিদ্রূপ ও হাস্যরসাত্মক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলি খুব সম্ভব ভবানীচরণেরই রচনা; অন্ততঃ 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' চিত্রটির লেখক যে তিনিই, তৎকালীন সাময়িক পত্রে তার ইঙ্গিত আছে।" ভবানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়', নববাবুবিলাস', 'দূতীবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের বাঙালী সমাজের ঐতিহাসিক উপকরণে সমৃদ্ধ। ভবানীচরণ কালের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে পারেননি, কিন্তু বাঙলা গদ্যে রসরচনার প্রথম শিল্পী হিসাবে ভবানীচরণের কৃতিত্ব স্বীকার না করলে ইতিহাসকেই অবমাননা করা হবে।

৩৫. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: বঙ্কিম-সূর্যকে ঘিরে বঙ্গদর্শনের স্তম্ভে যে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী বাঙলা গদ্যপ্রবন্ধের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁরা এই গদ্যপ্রবন্ধকে পাশ্চাত্ত্য রীতি অনুযায়ী শুধুমাত্র জ্ঞান পরিবেষণের কর্তব্যভার থেকে মুক্তি দিয়ে বাঙালীর রস, রুচিবোধ ও জীবন-প্রজ্ঞার সঙ্গে হৃদ্য সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অন্যতম। ইনি ১৮৫৩ সালে ২৪ পরগণার নৈহাটির

ভট্টাচার্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতার নাম রামকমল ন্যায়রত্ন। হরপ্রসাদের সরকারী ও বেসরকারী স্কুল ও কলেজে শিক্ষাদান কর্ম সেদিনের সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। সেকালের বিখ্যাত পণ্ডিত, প্রবীণ পুরাতত্ত্ববিদ্ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সাহচর্য লাভ করে হরপ্রসাদ প্রধানত প্রত্নতত্ত্ব, পুরাণতত্ত্ব এবং বাঙলা ও সংস্কৃতের প্রাচীন সাহিত্যচর্চালোচনায় জীবন অতিবাহিত করেন। Asiatic Society, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' প্রভৃতি সারস্বত প্রতিষ্ঠান তাঁর কর্মপ্রতিভার স্পর্শে ধন্য হয়েছিল। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর দেহান্ত ঘটে।

বাঙলা, সংস্কৃত, ইংরাজী, ইত্যাদি ভাষায় তিনি অসংখ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সেদিনের 'বঙ্গদর্শন', 'আর্যদর্শন', 'কল্পনা', 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা', 'নারায়ণ' প্রভৃতিতে অসংখ্য বিষয়ে বহুতর রচনা প্রকাশিত হয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য, মনস্বিতা ও জ্ঞানের গভীরতাকে প্রকাশ করেছে। 'ভারত মহিলা', [১৮৮১] 'বাল্মীকির জয়' [১৮৮১] 'কাঞ্চনমালা' [১৯১৬] 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' [১৯০২], 'বেণের মেয়ে' [উপন্যাস ১৯২০] ইত্যাদি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। হরপ্রসাদের সাহিত্যকৃতিত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করছেন : 'হরপ্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে যুগে বৈজ্ঞানিক বিচার বুদ্ধির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন করে নিতে শিখেছিল। তাই স্থূল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাঁধা গৎ আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে কোনদিন সম্ভবপর ছিল না। বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধনা নেই, এইটেই আমাদের দেশে সাধারণত দেখতে পাই—অধিকাংশ স্থলেই আমরা কম শিক্ষায় বেশী মার্কা পাবার অভিলাষী। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সাধকের দলে, এবং তাঁর ছিল দর্শন শক্তি।'

আসলে, 'বঙ্কিমযুগের একটা দক্ষিণী হাওয়া. একটা প্রাণোচ্ছলতার তরঙ্গ শতাব্দীর একপাদ অতিক্রম করিয়া, বিংশশতকে গম্ভীরতর পরিবেশে লালিত ও যুগোচিত পাণ্ডিত্যপ্রধান গবেষণাকার্যে নিয়োজিত হরপ্রসাদকে স্পর্শ করিয়া তাঁহার মধ্যে অতীত স্মৃতির সার্থক উদ্বোধন ঘটাইয়াছিল।'

৩৬ 'আনন্দমঠ' : ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালে বঙ্কিম-প্রতিভা বাঙালীর জীবনের স্থির জলাশয়ে যে 'অদৃষ্টপূর্ব ভাবোচ্ছ্বাস, 'জোয়ার-ভাঁটার তরঙ্গ' তুলে গেল তার প্রধান উপাদান ছিলো বাঙলায় তাঁর অভিনব-সৃষ্ট উপন্যাসগুলি। ১৮৬৫ থেকে ১৮৮৬ সালের মধ্যে লেখা বঙ্কিমের মোট চৌদ্দখানি উপন্যাসকে সাধারণত চারভাগে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে ধর্মতত্ত্ব প্রভাবিত চতুর্থ ভাগের উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'আনন্দমঠ' [১৮৮২]। সমালোচক মনে করেন যে বঙ্কিমচন্দ্র জীবন-প্রত্যয় অপেক্ষা এই পর্বে এসে ধর্মতত্ত্বের পরীক্ষাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই পর্বের অন্তর্গত আনন্দমঠকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলে দেখা যাবে যে, এখানে তন্নিষ্ট জীবনবোধ, বাঙালীর লোকায়ত জীবনচর্চা, সর্বোপরি দেশপ্রেম একদল সন্ন্যাসীর ইংরেজ বিরোধিতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে এই

উপন্যাসের সন্তানদল বীরভূমের সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের ছায়ায় রচিত। 'আনন্দমঠ' সম্পর্কে বাঙলা উপন্যাসের ইতিহাসকার মন্তব্য করেছেন : 'আনন্দমঠ'-এ ইতিহাসের নিরূপিত তথ্যসীমায় ধ্যানকল্পনা যতদূর প্রসার লাভ করিতে পারে, কর্মসন্ন্যাসের গেরুয়ায় আধুনিক স্বদেশ-প্রেমের ইউনিফর্ম কতটা তৈয়ারী হইতে পারে অতীতের ছায়াপটে ভবিষ্যতের অস্ফুট সম্ভাবনা কতখানি সুস্পষ্টভাবে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, বঙ্কিম উপন্যাসরীতির মাধ্যমে তাহারই পরীক্ষা করিয়াছেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ঐতিহাসিক ঘটনা সমাজ ও রাষ্ট্রে যে ভয়াবহ শূন্যতা সৃষ্টি করিয়াছিল, বঙ্কিম তাঁহার কল্পনার দ্বারা সেই ফাঁক পূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন।···ভবানন্দ-জীবানন্দ-শান্তি এবং উপন্যাসের সমগ্র ঘটনা লেখকেরই অন্তর-লোকের প্রতিবিম্ব মাত্র—উপন্যাসরীতির ছদ্মবেশে কল্পিত ভাবসাধনারই বহির্বিকাশ।'

এই উপন্যাসে ব্যবহৃত 'বন্দেমাতরম্' গানটি 'আনন্দমঠ' লেখার কিছু আগে রচিত হয়েছিলো। এই গানের বন্দেমাতরম্ ধ্বনি এবং সন্তানদলের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে একদা প্রভূত উদ্দীপনা যুগিয়েছিলো। ফলে, বাঙালীর জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে উপন্যাসটির অন্যতর ভূমিকাও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

৩৭ **'লিপিকা'**: এই গল্পগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট রচনা। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে এটি প্রকাশিত হয়। ঐ বছরের গরমের ছুটিতে শান্তিনিকেতনে বাসকালে কবি 'নূতন রীতিতে কথিকা নামে কতকগুলি গল্পাণু বা গল্পকণা লেখেন। যে গদ্যছন্দ লইয়া কবি পরে অনেক আলোচনা করিয়াছেন, তাহারই গোড়াপত্তন হয় এই সময়ের কথিকার মধ্যে। এইগুলি লিপিকা নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এইগুলি নূতন রীতিতে লেখা গল্পের রেখাচিত্র, মনের ভাবনার নিরাভরণ আলপনা যেন।'

'লিপিকা'র সমস্ত রচনাগুলি ১৩২৪-২৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে 'সবুজপত্র', 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'মোসলেম ভারত', 'মানসী ও মর্মবাণী' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ৩৯টি রচনা এর মধ্যে সংগৃহীত হয়েছে। প্রথম ভাগের ১৪টি রচনাকে আমরা গদ্য কবিতার আদিরূপ বলতে পারি। কারণ, অনেকদিন পরে তাঁর 'পুনশ্চ' কাব্যের ভূমিকায় [১৯৩২] কবি বলেছিলেন যে 'লিপিকা'য় তিনি প্রথম বাঙলা গদ্য কবিতার পরীক্ষা করেন। কিন্তু 'ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মত খণ্ডিত করা হয়নি···বোধহয় ভীরুতাই তার কারণ।'

পরের অংশের আটটিকে আমরা কথিকা বলতে পারি। এবং শেষভাগের সতেরটি রচনা রূপক জাতীয়। এই সমস্ত রচনাগুলিতে পদ্যের অবয়বে গল্পের রস প্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর বেশ কিছু রচনায় বিষয়ের ক্ষুদ্রত্ব সত্ত্বেও বৃহত্তর প্রসারের আভাষ রয়েছে। যেমন, 'একটি চাউনি', 'সতের বছর', 'প্রথম শোক' ইত্যাদি। আবার কিছু রচনায় অনুভূতি অকিঞ্চিৎকর সেন্টিমেন্ট খাঁটি নয়, এরা যেন টবের ফুলগাছ তাতে বর্ণসমৃদ্ধি থাকলেও ধরণীর সংস্পর্শহীন। যাই হোক, 'লিপিকা' রবীন্দ্রসৃষ্টিলোকে অভিনব বৈচিত্র্যের স্রষ্টা।

৩৮. **'শ্রীকান্ত'** : চারখণ্ডে প্রকাশিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের [১৮৭৬-১৯৩৮] 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটির প্রথম পর্ব ১৩২২ সালের মাঘ থেকে 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাস প্রকাশ করবার সময় নিজের নাম গোপন করে 'শ্রীকান্ত শর্মা' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন। 'ভারতবর্ষে' প্রকাশের সময় এর নাম ছিলো 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী'। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার সময়ে তিনি চারটি খণ্ডেরই 'শ্রীকান্ত' নামকরণ করেন [পর্বানুযায়ী]।

'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের আত্মজৈবনিক উপন্যাস কিনা এ-নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে দীর্ঘদিনের তর্ক আছে। বারে বারে জিজ্ঞাসিত হয়ে শরৎচন্দ্র বারে বারেই বলেছেন : 'ও সব বানানো মিছে গল্প। শ্রীকান্ত একটা উপন্যাস বইতো নয়, এসব নিয়ে জনরবে কান দিতে নেই।' কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হয় যে শ্রীকান্ত উপন্যাস শরৎচন্দ্রের পরিণত-রচনা। এর ভাষা, চরিত্রচিত্রণ প্লট-সংস্থাপন সমস্ত কিছুতেই শরৎচন্দ্রের পরিণত প্রতিভার স্বাক্ষর বর্তমান। চার খণ্ডের 'শ্রীকান্তে' শরৎচন্দ্র যে বিরাট জীবন পরিধিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন, যে বহুবিচিত্র চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, তা একে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি ও গভীরতা দান করেছে। রাজলক্ষ্মী, অভয়া, কমললতা প্রমুখ নারীচরিত্র বাঙলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। শ্রীকান্ত চতুর্থ খণ্ডটি ১৩৩৮ সালে 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিক ভাবে এবং ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। অতএব ১৯১৫ থেকে ১৯৩১ সাল, এই দীর্ঘ ১৬ বছরে লেখকের অভিজ্ঞতা, পরিচয়ের ব্যাপ্তি, শৈল্পিক পরিণতি কিভাবে ক্রমাগ্রসর হয়ে গেছে তার ধারাবাহিক ইতিহাস এই চার খণ্ড উপন্যাস পাঠে সহজেই আমরা বুঝতে পারব। এবং তাতে শিল্পী শরৎচন্দ্রের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটিও অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

৩৯. **'কল্লোল'** : একটি মাসিক পত্রিকার নাম। এই মাসিক পত্রিকার প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হয়েছিল যে কেউ কেউ আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের এক বিশেষ সময়কে 'কল্লোলের কাল' বলে উল্লেখ করেছেন। যাই হোক 'বিধাতার সাহায্যে ১৩৩০-এর পহেলা বৈশাখ কল্লোল ছাপিয়া বাহির হইল।' দীনেশরঞ্জন দাস, গোকুলচন্দ্র নাগ প্রমুখ কয়েকজন দুঃসাহসী সাহিত্যপ্রেমী যুবকের প্রচেষ্টায় 'কল্লোল' আত্মপ্রকাশ করে। এই পত্রিকাকে আশ্রয় করে আনুষ্ঠানিকভাবে বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা হয়েছিলো বলে মনে করা হয়। এই পত্রিকা তার সাত বছরের আয়ুষ্কালে [১৩৩০-১৩৩৬ পৌষ] আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রবিপরীত ধারাটিকে পরিচালনা করে। এই সময়ে অর্থাৎ ১৯২৩-২৪ সালে বাঙলা [মূলত, কলকাতা ও ঢাকার] শিক্ষিত যুবকদের সামনে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিলো তার প্রভাব পড়ে তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে। সেদিনের বেশ কিছু তরুণ প্রধানত 'কল্লোল' পত্রিকাকে অবলম্বন করেই বাঙলা সাহিত্যে একটি নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন—যাঁরা চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে।

প্রত্যেক বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনা দীনেশরঞ্জনের 'কল্লোল' কবিতাটির কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করলেই আমরা পত্রিকার মূল লক্ষ্যটিকে ধরতে পারবো: 'আমি কল্লোল শুধু কলরোল ঘুমহারা নিশিদিন, / অজানা নয়নের বারি নীল/চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি/পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি ফিরে আসি নিশিদিন।'

আমরা জেনেছি যে 'কল্লোল' আরম্ভ হয় মাসিক গল্প-সাহিত্য-পত্রিকা হিসাবে এবং ঘোষিত হয় যে এরকম গল্প-সাহিত্য বাঙলায় এই প্রথম। অবশ্য কর্তৃপক্ষের এই ঘোষণা সত্ত্বেও এর পাতায় কবিতাও অসংখ্য প্রকাশিত হয়েছিলো। সেকালের, একালের অনেক প্রখ্যাত লেখকই 'কল্লোলে'র স্রোতে অবগাহন করেছেন। তাই 'কল্লোল'-এর ঐতিহাসিক পালাবদলের নায়কত্ব প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন: 'তার সাধনায় যেটুকু অভিনব ও নতুনকালের সম্পদ, আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে তার মূল্যই বেশি। কল্লোলের কালে বাংলা সাহিত্য পালা বদলের মহড়া দিয়েছে। মহড়ার পরের কাহিনী হচ্ছে আসল কথা, সেখানেই সত্যাসত্য যাচাই হয়। তাই কল্লোলের ভূমিকার ঐতিহাসিক মূল্য খুঁজতে হবে শুধু তার সাত বছরের জীবৎকালের মধ্যে নয়, কল্লোলোত্তর বাংলা সাহিত্যের মধ্যেও।'

৪০. **বিষ্ণু দে:** কবি বিষ্ণু দে [১৯০৯-১৯৮০] আধুনিক বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে একটি নিজস্বতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত এই কবি তাঁর কাব্যভাষাকে গোড়া থেকেই দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে নিয়ে আসরে নেমেছিলেন। আধুনিক সমালোচকের ভাষায় "তিনি আধুনিক কাব্যজগতের প্রথম অস্তিবাদী কবি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'হাঁ'-ধর্মী, যদিও সে 'হাঁ'-ধর্মের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আধুনিক, রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ থেকে উৎসারিত অস্তিবাদ থেকে তার মৌল পার্থক্য সুস্পষ্ট। আবার আধুনিকদের মধ্যেও তাঁর সার্থকতা জীবনানন্দের ক্রমজাগ্রত এবং অমিয় চক্রবর্তীর সহজাত আশাবাদের থেকে পৃথক। বিষ্ণু দে-র অন্বিষ্ট একক সাধনায় পথ পেলে না —তাকে পাওয়া যায় সচেতন সামাজিক সমবায়ের পথে।"

প্রথম আবির্ভাবেই বিষ্ণু দে নিজের পথ চলার চিহ্নটিকে স্পষ্ট করে তোলেন এবং সেখানে দেখা যায় যে তিনি রবীন্দ্র-আবহাওয়া থেকে মুক্ত হতে চাইছেন। সেদিনের সামাজিক পরিবেশকে অন্তরে উপলব্ধি করে ও তাকে তাঁর কাব্যে স্বাকৃতি দিয়ে তিনি নতুন মূল্যে কাব্যভাষাকে আয়ত্ত করতে চাইলেন। তাঁর এই বিশিষ্ট পথ চলাই তাঁকে সেদিনকার কাব্য-সংসারে একটি বিশিষ্ট জায়গা করে দেয়। বিষ্ণু দের প্রথম কবিতার বই 'উর্বশী ও আর্টেমিস' [১৯৩২], দ্বিতীয় 'চোরাবালি'। 'পূর্বলেখ' [১৯৪০], 'সন্দ্বীপের চর' [১৯৪৭], 'অন্বিষ্ট' [১৯৫০], 'নাম রেখেছি কোমল-গান্ধার' [১৯৫০] বিষ্ণু দে-র উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। জীবনের মধ্যভাগে এসে তিনি পুরোপুরি মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন—তাঁর অনেক কবিতায় তার চিহ্ন আছে।

তিনি এলিয়টের কিছু কবিতার অনুবাদ করেছিলেন। 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'

নামে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিলো। 'বিষ্ণু দে সমাজ-সচেতন কবি। তাঁর কবিতায় দেশ-কালের সংবেদনই বেশি করে ধরা পড়েছে, দেশী ও বিদেশী পৌরাণিক চরিত্রের মাধ্যমে কখনো বা ব্যঙ্গচ্ছলে তিনি দেশের অসহায় মানুষের মুক্তি সম্ভাবনার কথা প্রকাশ করেছেন।...তাঁর বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ শোনা যায়। মানুষের কাছে পৌছতে চান তিনি, অথচ তাঁর কণ্ঠে দুরূহবাণী বিন্যস্ত হয়।' তাঁর কবিতায় এলিয়টের প্রভাব অত্যন্ত গভীর।

৪১. **অনুপূর্বা / যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত:** 'অনুপূর্বা' কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের [১৮৮৭—১৯৫৪] কবিতার একমাত্র সংকলন গ্রন্থ। কবি তাঁর মোট ছ-টি কাব্যগ্রন্থ থেকে নিজেই নির্বাচিত করে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে এটি প্রকাশ করেন [বৈশাখ ১৩৫৩]। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৬১ বঙ্গাব্দে। যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-প্রতিভার অপরাহ্ন-বেলায় কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করে তাঁর কাব্যবীণায় একটি নতুন তান ধরেন—তা হচ্ছে দুঃখবাদের সুর। মানুষ জন্মায় আনন্দে, বাঁচে আনন্দে, এবং মৃত্যুও হয় আনন্দে এই রবীন্দ্র-চিন্তার বিপরীতে মানুষের জন্ম দুঃখে, দুঃখের মধ্যেই বেঁচে থাকে এবং মৃত্যু তো পরম দুঃখজনক, এই বক্তব্য নিয়ে তিনি বাঙলা কাব্যসংসারে হাজির হন। এবং অচিরেই আপন স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। 'অনুপূর্বা' অতিশয় সুনির্বাচিত কাব্যসংকলন। এতে মোট ১০২টি কবিতা আছে এবং তাঁর সমস্ত প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতাই এতে স্থান পেয়েছে। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে মামার বাড়ীতে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দ্বারকানাথ, মাতা মোহিতকুমারী। কবি গ্রামের স্কুল, কলকাতার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি এবং বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করার পর শিবপুর ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি. ই. পাশ করে আজীবন স্থপতিবিদের চাকুরী করে ১৯৫৪ সালের মার্চে অবসর নেন। কবি পেশায় ইন্‌জিনিয়ার। পেশার সঙ্গে তাঁর সাহিত্য-সেবার অমিলের জন্য তিনি নিজেকে 'লোহার ফুলদানী' বলেছেন। আগেই বলেছি যে, কবি বঙ্গভারতীর কাব্যবীণায় একটি অভিনব তার সংযোজিত করেছিলেন,—তার নাম 'দুঃখবাদ'। এ-জিনিস বাংলা সাহিত্যে একেবারে অভিনব এবং দুঃখের এই উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস বঙ্গ-কাব্য প্রদেশে মরুভূমির রুক্ষতাকে বহন করে এনেছিলো। এই সূত্রে তাঁর 'মরীচিকা' [১৯২৩], 'মরুশিখা' [১৯২৭] ও 'মরুমায়া' [১৯৩০] কাব্যগ্রন্থত্রয় বাঙলার প্রথাবদ্ধ কবিভাবনার জগতে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলো। অবশ্য তাঁর শেষ তিনটি কাব্যগ্রন্থ 'সায়ম' [১৯৪১], 'ত্রিযামা' [১৯৪৮] এবং 'নিশান্তিকা'-য় [১৯৫৭] নতুন অথচ স্নিগ্ধ জীবন-প্রত্যয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। জনৈক সাহিত্য সমালোচক যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন: 'যতীন্দ্রনাথের রচনায় যেটা সব চেয়ে আমাদের বিস্ময়ে হতবাক্ করে দেয়, অন্তত প্রথম আবির্ভাবকালে অবশ্যই করেছিলো, সে হলো তাঁর অদ্বিতীয় বিশিষ্টতা। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের অনুগমনে বাঙলা সাহিত্যের আসরে এসে

তিনি যে কোন কবিরই অনুকরণ করেননি, এটা অল্প অঘটন নয়। যার পর-নেই অঘটন বলেই হয়তো, যতীন্দ্রনাথেরও কেউ অনুকরণ করে নি বা করতে সক্ষম হয় নি। ··ইহকাল থেকে চিরকালের কবি যতীন্দ্রনাথ, তাঁর কাছে আমাদের অপরিমেয় আনন্দ-ঋণ এইটুকু নয় যে, রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে তিনি তুলনা-রহিত ; বাঙালীর এও এক মস্ত সৌভাগ্য যে তিনি বাঙলা কবিতাই লিখেছেন। এ-জিনিষের আর তো চল নেই।' যতীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ করলে দেখা যাবে যে, বাঙলা কবিতার ভাণ্ডারে তিনি কতকগুলি অতুলনীয় পংক্তি উপহার দিয়েছেন যা তাঁর আগে আর কেউ রচনা করতে সাহস করেননি—ভবিষ্যতেও করবে এমন মনে হয় না। যেমন : ১. 'মরণের শীত করে নিবারণ/বরফের কাঁথা ঢাকি' ['হাটে']। ২. 'রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা' [দুঃখবাদী']। ৩. 'চেরাপুঞ্জির থেকে / একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি-সাহারার বুকে?' ['ঘুমের ঘোরে' : প্রথম ঝোঁক]। ৪. 'প্রতি সন্ধ্যায় কোটি কুসুমের অকাল মরণ পাতি', / ঘরে ঘরে নামে খাঁটি স্বর্গীয় প্রেমের কামুক রাতি' ['পাষাণ পথে'] ৫. 'দেয়াল ধরিয়া বেড়াইছে ঘুরে মৃত কেতকীর গন্ধ' ['কেতকী']। ৬. তুমি শালগ্রাম শিলা ;— / শোওয়া বসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা' ['ঘুমের ঘোরে' : প্রথম ঝোঁক]।

৪২. ফুলমণি ও করুণার বিবরণ : সাধারণত বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই আমরা বাঙলা উপন্যাসের সূচনা-যুগকে ধরে থাকি। কিন্তু এটা পুরোপুরি ইতিহাসসম্মত নয়,—কারণ, পূর্ণ গোলাপেরও যেমন একটি কুঁড়ির ইতিহাস আছে, তেমনি বঙ্কিমের উপন্যাস-চর্চাকেও একটি বিবর্তনধারার মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে। তাই বঙ্কিমপূর্ব যুগের উপন্যাসের ইতিহাস ততই অস্ফুট হোক না কেন, তাকে অবহেলা করা যাবে না। এবং এই ধারাতেই আমরা 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' [১৮৫২] নামে একটি গদ্য আখ্যানগ্রন্থের নাম পাই। এর লেখিকা হলেন হানা কাথেরীন ম্যালেন্স নাম্নী জনৈকা খ্রীস্টান ধর্ম-প্রচারিকা। ইনি প্রধানত দেশীয় স্ত্রীলোকগণকে সদাচার ও সৎশিক্ষাদান করবার উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে খ্রীস্টান ধর্মের প্রচার করতেন এবং তাদের শিক্ষার্থেই ঐ গ্রন্থ রচিত হয়। অনেকে মনে করেন এইটিকেই আদি বাঙলা উপন্যাস হিসাবে ধরা উচিত। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত পূর্ণ সত্য নয় এবং 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'ও যথার্থ উপন্যাসও নয়।

সে যাই হোক, এই গ্রন্থ ভারতের প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাতেই অনূদিত হয়েছিলো। লেখিকা নিজে খ্রীস্টান ছিলেন এবং যাদের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তারাও দেশীয় খ্রীস্টান। সেইজন্য "যে পথ ধরে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' থেকে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে' গিয়ে আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' সেই পথ দিয়ে আসে নি।" তাই বলে 'বৃহত্তর বাঙালীর সমাজ-জীবনের সঙ্গে এর যোগ নেই'···এই মন্তব্যও ঠিক নয়। কারণ ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে মধুসূদন মুখোপাধ্যায় রচিত 'সুশীলার উপাখ্যান'-এর মধ্যে

উক্ত গ্রন্থের একটি মূল্যবান স্বীকৃতি আছে। অধিকন্তু শেষোক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের কিছু ঘটনা ও চরিত্রের ওপর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণে'র প্রভাব আছে। অবশ্য এ-প্রসঙ্গে একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য যে খ্রীস্টান বিদেশী মহিলার রচনা বলে এতে ব্যবহৃত গদ্য বাঙলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ধারায় কোন রেখাচিহ্ন অঙ্কিত করতে পারেনি। গ্রন্থটি দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর আড়ালে ছিলো—সম্প্রতি বিশিষ্ট গবেষক শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এটিকে পুনরুদ্ধার করে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকারগণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন।

৪৩. 'আলালের ঘরের দুলাল' / টেকচাঁদ ঠাকুর / প্যারীচাঁদ মিত্র : বাঙলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর [১৮১৪—১৮৮৩] একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বাংলা গদ্যের প্রারম্ভকাল থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত ব্যবহৃত সাহিত্যভাষার গদ্য সাধারণত 'পণ্ডিতী বাংলা' নামে পরিচিত। এই তৎসম শব্দবহুল গুরুগম্ভীর ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্যারীচাঁদ এক চ্যালেঞ্জ নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি সাধারণের কথ্যভাষাকে অবলম্বন করে তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' [১৮৫৮] রচনা করেন। এই গ্রন্থ দুটি কারণে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথমত এর ভাষা এবং দ্বিতীয়তঃ এর বিষয়বস্তু। কলিকাতার সদ্যজাগ্রত ইঙ্গ-বঙ্গ কালচারের বিষময় ফল ভক্ষণ করে কিভাবে ধনীর দুলাল মতিলাল অধঃপাতের অতলে নেমে গেল প্যারীচাঁদ তা এতে বর্ণনা করেছেন। সম্পূর্ণ মৌলিক অথচ বাঙালীর পরিচিত সমাজ থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর ভালো-মন্দ চরিত্র ও কাহিনী নিয়ে তিনি অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। একেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলা হয়। বাবুরামবাবু, মতিলাল, ঠকচাচা, রামলাল, বেচারামবাবু প্রমুখ চরিত্রগুলির সার্থক রূপায়ণ এবং একটি কাহিনীধারার পরিণতির মধ্য দিয়ে এই গ্রন্থটি উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে পেরেছে। এর আগে ভবানীচরণের বাবু-কাহিনীগুলির মধ্যে যে কাহিনী বা চরিত্র ছিল তা তেমন পরিস্ফুট হতে পারেনি। অপরপক্ষে, ভূদেবচন্দ্রের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' দুটির কাহিনী মৌলিক [ইতিহাসাশ্রিত] বা বাঙালীর জীবনাশ্রিত নয়। এই সমস্ত নানা কারণে 'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙলা উপন্যাসের ইতিহাসে সুপরিচিত হয়ে আছে। আমরা ভাষা-বিদ্রোহী প্যারীচাঁদের এই গ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষার কিছু উদাহরণ দিয়ে 'পণ্ডিতী গদ্যে'র সঙ্গে এর তফাৎটা কোথায় তা বোঝার চেষ্টা করবো : একটু একটু মেঘ হইয়াছে—একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে—গরু দুটো হন হন করিয়া চলিয়া একখানা ছকড়া গাড়ীকে পিছে ফেলিয়া গেল। সেই ছকড়ায় প্রেমনারায়ণ মজুমদার যাইতেছিলেন—গাড়ীখানা বাতাসে দোলে—ঘোড়া দুটো বেটো ঘোড়ার বাবা—পক্ষিরাজের বংশ—টংস টংস ডংস ডংস করিয়া চলিতেছে—পটাপট পটাপট চাবুক পড়িতেছে, কিন্তু কোন ক্রমেই চাল বেগড়ায় না। প্রেমনারায়ণ দুটো ভাত মুখে দিয়া সওয়ার হইয়াছেন—গাড়ীর হোঁকোচে হোঁকোচে প্রাণ ওষ্ঠাগত।'

৪৪. **'অগ্নিবীণা'** : কবি নজরুল ইসলামের [১৮৯৮-১৯৭৬] প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। নজরুলের মতো এমন একজন উঠতি কবির কবিতার বই সেদিনের বাঙালী জনসমাজ যে ভাবে গ্রহণ করেছিলো তা বিস্ময়কর। কোন প্রকার প্রচার ছাড়াই কেবল বিষয়বস্তুর গুণে একটা কবিতার বই এমন hot-cake হয়ে উঠবে তা কেউই ভাবতে পারেনি। কবি নজরুল 'অগ্নিবীণা' গ্রন্থটির নাম রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গানের একটি চরণের অনুপ্রেরণায় ['অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে']। গ্রন্থটিতে মোট কবিতা আছে বারো। এটিকে তিনি 'ভাঙা বাঙলার রাঙাযুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর শ্রীশ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের শ্রীচরণারবিন্দে' উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গে একটি কবিতাও রচনা করে দিয়েছিলেন।

যে-সময়ে নজরুল বাঙলা কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন রাজনৈতিক দিক থেকে সে-সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের অবসান হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে পরাধীন ভারতবর্ষে মানসিক অবসাদ চেপে বসেছে। ইংরেজের শোষক নালিকা আরো গভীরে প্রবিষ্ট হয়ে ভারতবাসীকে ক্রমশই রক্তহীন করে তুলছে। এমন সময় ১৯২০-র সেপ্টেম্বরে কোলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব গ্রহণ, পরের বছরে তার সূত্রপাত, ভুল নেতৃত্বের ফলে অচিরেই তার সহিংসে রূপান্তর এবং গান্ধীজীর আন্দোলন প্রত্যাহার। অথচ জাতির জীবনে যে উন্মাদনা জেগেছিলো তাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করা গেল না। দেশজুড়ে নানা পথে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ হয়ে গেল,—একে সামনে রেখে 'অগ্নিবীণা' [১৯২২] রচিত। তাই, ক এর প্রতিটি কবিতা আগুনের অক্ষরে লেখা। খ গ্রন্থের নামকরণেও আগুনের আঁচ। গ যাঁকে গ্রন্থটি উৎসর্গিত তিনিও এ-দেশে কিছুদিন আগেও আগুনের ভাষায় কথা বলেছেন। অতএব এমন বই যে প্রকাশমাত্রেই জনসমাদর লাভ করবে তাতে আর বৈচিত্র্য কোথায়?

'অগ্নিবীণা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নজরুল বাঙালী তরুণদের, যাঁরা আপোষহীন সংগ্রামে ব্রতী তাঁদের, পূজ্য কবিতে পরিণত হন। 'বাঙলার নগরে-গ্রামে-পল্লীতে ভ্রমণ করে দেশবাসীকে ভৈরবকণ্ঠে স্বজাতীয়ত্বে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে লাগলেন। বাঙলার আকাশ-বাতাস স্বদেশ-মন্ত্রের ধ্বনিতে জাগ্রত হয়ে উঠলো, দেশময় অপূর্ব এক সাড়া, অননুভূত শিহরণ দেখা দিল। সমগ্র বাঙলার তিনি চারণ কবি হয়ে উঠলেন।' এখানে আমরা তাঁর অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করবো : "সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেল মা গো / জ্বলে যেথা জ্বলে কাল চিতা। / তোমার খড়্গা রক্ত হউক / স্রষ্টার বুকে লাল ফিতা। / টুঁটি টিপে মারো অত্যাচারে মা / গল্-হার হোক নীল ফাঁসী ; / নয়নে তোমার 'ধূমকেতু'-জ্বালা / উঠুক সরোষে উদ্ভাসি॥' ['রক্তাম্বর-ধারিণী মা']।

৪৫. **'আখড়াই গান'** : ১৪৬ পৃষ্ঠার ২২ নং টীকার প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য।
'আখড়াই' বা অনুসর্গ 'আই' বিযুক্ত 'আখড়া' শব্দটির ব্যুৎপত্তি বা ব্যাখ্যা নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক আছে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের মতে সংস্কৃত "অক্ষবাট" [club]

>অকৃথবাড়>আখড়া—এইভাবে শব্দটির উৎপত্তি—এর অর্থ enclosed ground for physical exercise.' কিন্তু এই অর্থ পরে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তিত বা বিকৃত হয়ে এ পরে যে রূপই ধারণ করুক না কেন আখড়াই গানের আদি উৎস হচ্ছে শান্তিপুর। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশে উচ্চাঙ্গ রাগাশ্রয়ী গানের বিষয় ও সুরের ভিন্নতা ঘটিয়ে এ স্বতন্ত্র চেহারা নেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আখড়াই গান একটি বিবর্তিত বস্তু এবং বিখ্যাত কবিওয়ালা ভোলা ময়রার গান শুনে মনে করা যেতে পারে যে নিধুবাবুর সম্পর্কে-মামা কুলুইচন্দ্র সেন এই আখড়াই গানের স্রষ্টা।

কেউ কেউ আখড়াইকে টপ্পার আদি অবস্থা বলে মনে করেন। 'বাঙলা এগার শতাব্দীর কিছু পরে শান্তিপুরে কতিপয় ভদ্রলোক আখড়াই সুর উদ্ভাবন করেন। তাঁহারা টপ্পার কতকগুলি আদি রসাত্মক গান গাইতেন ও ছড়া কাটাইতেন' [রামনিধি গুপ্তের গীতি সংকলন]। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ কুলুইচন্দ্র শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবের পৃষ্ঠপোষকতায় আখড়াই গানকে নতুন মর্যাদা দান করেন। তিনি এতে যেমন নানা রাগ যুক্ত করেন, তেমনি অন্যদিকে নানা ধরনের একাধিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে গান-গুলিতে নতুন মাত্রা যোগ করেন। আখড়াই 'চাপান-উতোর' যুক্ত গান নয়। দু-তিন দলের গানের মধ্যে যার গান-বাজনা-সুর-বাণী ভালো হতো তাকেই বিজয়ীর জয়মাল্য দেওয়া হতো।

আখড়াই গানে দুটি 'তুক' [অস্থায়ী ও অন্তরা]—খেউড় ও প্রভাতি। প্রথমের বিষয় ছিলো আদিরসাত্মক ও দ্বিতীয়ে নায়কের অবর্তমানে নায়িকার বিলাপ। 'যতদূর মনে হয় আখড়াই গানের বাণীর দিকে কেউ কৌতূহলী ছিলেন না—না কবি, না গায়ক, না শ্রোতা। যা কিছু কারদানি দেখানো হতো বাদ্য-ভাণ্ডে ও কণ্ঠবাদনে।' কবি ঈশ্বর গুপ্তও বোধ হয় কয়েকটি আখড়াই গান রচনা করেছিলেন, কারণ বঙ্কিমের ঈশ্বর গুপ্ত গান সংগ্রহে পাওয়া যাচ্ছে: 'অপার মহিমা তব শুনি পুরাণে। / যার চিন্তামণি-চিন্তা অন্তরে, / তার কি চিন্তা মরণে?'

৪৬. **'আবোল তাবোল'** : সুকুমার রায় চৌধুরী [১৮৮৭-১৯২৩]—যিনি সুকুমার রায় নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ, ছোটদের জন্য ছড়া-গল্প-উপন্যাস রচনা করে বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। ইনি "ভারতীয় বৈঠকের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ১৩২৮ [১৯২১ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯১৩ (বৈশাখ ১৩২০)] সালে ইনি ছেলেদের জন্য 'সন্দেশ' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন। চিত্রশিল্পে, ফটোগ্রাফিতে এবং ছোটদের জন্য গদ্য-পদ্য-নাটক রচনায় ইঁহার বিশেষ নিপুণতা ছিল।" ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে এঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আবোল তাবোল' প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে ড সুকুমার সেন জানাচ্ছেন : "বিলেত থেকে ফিরে আসার পর সুকুমার রায়ের প্রথম 'আবোল তাবোল' পদ্য 'খিচুড়ী' বেরিয়েছিল 'সন্দেশ' পত্রিকায় ১৯১৪ সালে। এই চমৎকার ছড়াটিতে লীয়রের প্রভাব আছে কিন্তু সর্বাংশে নয়। লীয়র তাঁর কোন 'নন সেন্স ভার্সে' উদ্ভট জন্তু-জানোয়ারের কল্পনা করেছেন এবং যথেচ্ছ ধ্বনি জুড়িয়ে তাদের

অদ্ভুত ও উদ্ভট নাম গেঁথেছেন। সুকুমার রায় কিন্তু তা করেন নি। তাঁর জন্তু-জানোয়ারের উদ্ভট কল্পনায় এবং সেগুলির নামকরণেও মিশ্ররীতি অবলম্বন করেছেন। যেমন—হাঁসজারু = হাঁস + সজারু। এই নামকরণরীতি শব্দবিন্যাসসম্মত। এগুলিকে বলে পোর্টম্যান্টো শব্দ। 'খিচুড়ী' কবিতাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। ঐ কবিতাটি থেকে আরম্ভ করে 'সন্দেশে' প্রকাশিত ননসেন্স পদ্যগুলি সুকুমার রায় 'আবোল তাবোল' নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে সংকলন করেছিলেন, কিন্তু প্রকাশিত হওয়ার দিন কতক আগে তাঁর মৃত্যু হয়। 'আবোল তাবোল' নামটি 'ননসেন্স ভার্স'-এর যথার্থ বাঙলা প্রতিশব্দ। সুকুমার রায়ের যশ যে বাঙালী পাঠক-সমাজে 'আবোল তাবোল'-এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তা, কিছুমাত্র বিস্ময়ের ব্যাপার নয়।"

শিশু-মনোরঞ্জনের জন্য বাঙলা সাহিত্যে এর আগে থেকেই এদিক-সেদিকে ননসেন্স জাতীয় গদ্য-পদ্য রচনা প্রকাশিত হলেও—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এদিকে কিছু কিছু কলম চালালেও, সুকুমার রায়-এর 'আবোল তাবোল' বা তাঁর পরবর্তী রচনা সব দিক থেকেই অনন্য। এই কাব্যগ্রন্থের সূচনায় কৈফিয়ৎ দিয়ে তিনি লিখছেন: 'যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই, সুতরাং সে-রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ-পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।'

কিন্তু খেয়াল রস শুধু নয়—একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে 'আবোল তাবোলে' বা সমগ্র সুকুমার-রচনায় বালকের ছদ্মবেশে সাবালকত্ব দেখিয়েছেন তিনি। 'আবোল তাবোল'-কে সামনে রেখে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে: 'নাবালক-সাবালকের মধ্যবর্তী মূঢ়তার গণ্ডি ভেঙে, নিয়ম-বেনিয়মের চৌহদ্দি ডিঙিয়ে এক বিচিত্র সরল সত্যের জগতে টেনে নিয়ে গেছেন মানুষকে। তিনি শিশু সাহিত্যিকের অন্তরালে ছিলেন প্রকৃত বয়স্ক সাহিত্যিক। উদ্ভট এবং অকাট্য মিল দিয়ে তিনি যেমন শব্দের খিল, জংধরা ভাষার দরজা খুলে দিয়েছেন, তেমনি তাঁর আবোল তাবোল, উল্টোদর্শন, উদ্ভট চিত্রকল্পমালা ননসেন্সের চিকের পেছনে দাঁড়িয়ে এমন এক জীবনকে তুলে ধরেছে যা সব বয়সের সব সময়ের—চিরকালের।'

৪৭. **'আরণ্যক':** প্রকৃতি-প্রেমিক ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের [১৮৯৪-১৯৫০] একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'আরণ্যক' [১৯৩৯]। আধুনিক [দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্য ও পরবর্তী] জটিল বিশ্বের মানুষ হয়েও বিভূতিভূষণ যেন কোন ভাবেই সভ্যতা-সচেতন সাহিত্যিক নন—মানুষের এমনকি তাঁর নিজের মধ্যেও যুগের যন্ত্রণার কোন ছায়াই পড়েনি—সমালোচকের এই মন্তব্য একপেশে বলে মনে হয়। কারণ, তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'আরণ্যক' পাঠ। এ-শুধু নিছক প্রকৃতির আকাশ-জঙ্গল-পাহাড় বর্ণনার কাহিনী নয়, এ-হচ্ছে ভূমিলগ্ন মানুষের, দরিদ্রের বেঁচে থাকার—নিষ্করুণ জীবন-সংগ্রামের মর্মস্পর্শী উপাখ্যান। 'নাঢ়া ও নবটুলিয়া বইহার আরণ্যভূমিতে যে বিস্ময়, তা একদিকে যেমন অ-নীহারিকা-তৃণঘনবিস্তৃত জীবনের বিস্ময়, তেমনি লেখকের স্বদেশ-

জীবনের অন্তর্গত মানুষের জীবনধারণের বিস্ময়ও বটে। এই দুই ব্যাপারকে, তথা জীবনের দ্বৈত রূপকে লেখক শিল্পস্থ করেছেন। ফলে, অনেক টুকরো টুকরো কাহিনী এক অনিবার্য ছন্দোবেগে রূপময় হতে পেরেছে। সে-ছন্দ জীবনেরই ছন্দ।'

এই ছন্দকে ধরার জন্য তাঁর আরণ্যকে সম্পূর্ণ নতুন এক শিল্পকৌশল ব্যবহৃত হয়েছে। কোন টানা কাহিনী নেই—কোন কেন্দ্রীয় চরিত্র নেই—নেই নায়ক বা নায়িকা। পড়তে গেলে মনে হয় ভ্রমণ-কাহিনী বা ডায়েরি। কিন্তু আদৌ তা নয়। 'আরণ্যক' উপন্যাস। অবশ্যই উপন্যাস। এই কারণে আরণ্যক উপন্যাস যে, এখানে অরণ্যপট যতই অভিভূত করুক আমাদের, লেখকের লক্ষ্য ছিল পট-বিধৃত মানুষ। এর মঞ্চী-কুন্তা কিংবা মটুকনাথ—প্রমুখের দুঃখ-দারিদ্র্য-জীবন-সংগ্রাম, অথবা দোবরু পান্না-ভানুমতীর জাতীয়-ট্রাজিডি আমাদের এক নতুন অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

এই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যর কথা বলতে গিয়ে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : 'এই উপন্যাসটির পরিকল্পনার অভিনবত্ব বিস্ময়কর—ইহা সাধারণ উপন্যাসের থেকে সম্পূর্ণ নতুন প্রকৃতির। প্রকৃতির যে সূক্ষ্ম, কবিত্বপূর্ণ অনুভূতি বিভূতিভূষণের উপন্যাসের গৌরব তাহা এই উপন্যাসে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতির সহিত মানব-মনের এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কাহিনী বাঙলা উপন্যাসে নাই-ই, ইউরোপীয় উপন্যাসেও এমন দৃষ্টান্ত সুলভ নয়।' এখানে লেখকের ভাষা ব্যবহারও ভিন্নতর : 'তাহার কাছে সরস্বতী কুণ্ডীর কথা তুলতেই সে বলিল—হুজুর ও মায়ার কুণ্ডী, ওখানে রাত্রে হুরী পরীরা নামে ;...সে-সময় যে তাদের দেখতে পায়, তাকে ভুলিয়ে জলে নামিয়ে ডুবিয়ে মারে।' এ-ভাষা পরীরাজ্যের কল্পকাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে।

৪৮. **'একদা'** : সাম্যবাদী দর্শনে বিশ্বাসী, যুক্তিনিষ্ঠায় ও বস্তুবাদে আস্থা স্থাপন-কারী শ্রীগোপাল হালদার [১৯০২—] 'একদা' [গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৩৯ ; কিন্তু এটি লেখা হয়েছিলো ১৯৩৩-এর ১৮-২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী অবস্থায়] উপন্যাসটির লেখক। এটি একটি ত্রয়ী [Trilogy] উপন্যাসের প্রথম খণ্ড—পরবর্তী দুই খণ্ড হলো, ১৯৫০-৫ লেখা 'অন্যদিন' এবং 'আর একদিন'।

কোন কোন সমালোচকের মতে গোপাল হালদারের 'একদা' বাঙলা সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক উপন্যাস [Political Novel]। তাঁদের মতে "রাজনৈতিক বিপ্লবকে উপজীব্য করে বাঙলা সাহিত্যে বহু উপন্যাস লেখা হয়েছে। ...আধুনিক ঔপন্যাসিকেরাও এই বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন ; তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের 'একদা'। ...এঁর অন্তর্দৃষ্টি অতিশয় গভীর ; তিনি বিভীষিকাপন্থার অনিবার্য ব্যর্থতা ও অনতিক্রম্য আকর্ষণের চিত্র এঁকেছেন একটি নায়ককে কেন্দ্র করে। এই নায়ক সম্পূর্ণরূপে বিভীষিকাপন্থী নয় ; অথচ তাকে মূল্য দিতে সে জানে। তার অনুভূতিশীল হৃদয় এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু তার বিচারবুদ্ধির কাছে বিভীষিকাপন্থী বালক বহ্নিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গরূপে প্রতিভাত হয়েছে।"

মননমুখ্য জীবন ও জগৎ-জিজ্ঞাসার যে ধারা তিনের দশকের বাঙলা সাহিত্যের লক্ষণ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলো তা অনন্য ভঙ্গীতে অভিব্যক্ত হয়েছে গোপালবাবুর 'একদা'-য়। সেদিনের বৈপ্লবিক রাজনীতি, অর্থনীতির গ্লানি এই উপন্যাসের

তা এই বাস্তব আঘাতে এক অভিনব রূপ লাভ করে। নিজের প্রচণ্ড অন্তর্বেদনার কঠিন তুষার ব্যথিত হৃদয়ের উত্তাপে শোককাব্যরস-নদীতে পরিণত হয়। কবির স্ত্রীর মৃত্যু উপলক্ষে 'এষা' [১৯১২] কাব্যগ্রন্থটি লেখা হয়। 'বাঙলা সাহিত্যে এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ 'শোককাব্য' [In Memorium]।'

মৃত্যু, অশৌচ, শোক, সান্ত্বনা এই চারটি সর্গে 'এষা' কাব্যগ্রন্থটি বিভক্ত। শোকের যে সমুদ্র কবির হৃদয়ে উথলে উঠেছিলো তা যেন চারটি তরঙ্গের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি ও সান্ত্বনার তটে এসে শেষ হয়েছে। শোক কবির হৃদয়ে যে করুণরসের সৃষ্টি করেছিলো তা মহৎ উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে অলোকসামান্য কাব্য-সুধায় পরিণত হয়েছে। কবি সামান্য উপকরণ, ব্যক্তিগত দুঃখের অভিঘাত এবং বাস্তব-নিষ্ঠুর মৃত্যু-শোককে অবলম্বন করে 'এমন সজীব উজ্জ্বল রসমূর্তি গড়েছেন' যে তা চিরন্তন মানবের সর্বকালীন শোক-অনুভূতির সঙ্গে মিশে পাঠকের চিত্তে সার্থক আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছে। 'এই কবিতাগুলি যেন বিশ্বের সার্বজনীন দাম্পত্য-বিরহের সাধারণ শোকচিত্রগুলিকেও একে একে ফুটিয়ে তুলেছে। এগুলি কেবল কবিতা নয়, কেবল এক একটি ভাবের উচ্ছ্বাস নয়, যেন এক একটি উজ্জ্বল তৈলচিত্র;—এক একটি জীবন্ত প্রত্যক্ষ দৃশ্যের মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে এবং এক একটি অপূর্ব কারুণ্য মূর্তি-পরিগ্রহ করে আমাদের চিত্তপট অধিকার করে বসে। ...এষার প্রথম গুণ এর অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা। কবি আপনার জীবনের—বাইরের ও ভেতরের অতি ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত অভিজ্ঞতার ওপর কবিতাগুলি গড়েছেন। ...ইংরেজি সাহিত্যে লর্ড টেনিসন্ তাঁর 'ইন্ মেমোরিয়মে' আধুনিক ট্রাজিডির চিত্র অঙ্কিত করেছেন। আধুনিক সাধনার এই বিশ্ব-সমস্যাকে আশ্রয় করেই টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়াম'—বিশ্বসাহিত্যে এতটা উচ্চস্থান অধিকার করেছে। অক্ষয়কুমারের 'এষা' ও টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়ম' একই শ্রেণীর কাব্য সৃষ্টি" [বিপিনচন্দ্র পাল]। এখানে আমরা 'এষা'র দু-চার বিন্দু কাব্যরস পান করবো : 'হে মরণ, ধন্য তুমি! না বুঝে তোমায় / বৃথা নিন্দা করে লোকে; / জগতে—তুমি ত শোকে / অমর করিছ প্রেমে দেব-মহিমায়! / আজি মোর প্রিয়তমা / স্তব করে বিশ্ব রমা— / ভাসিছে ইন্দিরা-সমা সৃষ্টি নীলিমায়।'

৫০. **'কজ্জলী' : 'গড্ডলিকা' / পরশুরাম :** দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালসীমায় পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসু [১৮৮০-১৯৬০] বাঙলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বিজ্ঞানের লব্ধকীর্তি ছাত্র, কর্মসূত্রে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক রাজশেখর বসু পরশুরাম ছদ্মনামে বাঙালী চরিত্রকে তাঁর অসামান্য ব্যঙ্গ গল্পগুলির মাধ্যমে ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। বৈজ্ঞানিকের নিস্পৃহতায় তিনি যে গল্পগুলি লিখেছিলেন সেগুলি পাঠকদের শুধু হাসিয়েই ফুরিয়ে যায়নি—হাউয়ের মতো ক্ষণিক আলো ছড়িয়ে নিঃশেষ হয়নি, জাতির চিত্তাকাশে স্থায়ী দীপ্তি নিয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের স্থান গ্রহণ করেছে।

বাঙলা সাহিত্যে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাস্য-সৃষ্টির যে জগত সৃষ্টি করেছিলেন

পরশুরামের জগত তার থেকে অবশ্যই আলাদা—স্নেহ-মমতা-উদার প্রসন্নতার পরিবর্তে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। অবশ্য এ মর্মান্তিক নয়, সংযমযুক্ত মাধুর্যমণ্ডিত হাসি। ডাক্তার যখন রোগীর দেহে ছুরি চালায় তখন তা যন্ত্রণাদায়ক হলেও তার পেছনে যেমন শুভকরতা থাকে, তেমনি পরশুরামের হুলের পেছনে স্নিগ্ধ হাসির মধুও পাওয়া যায়। 'পরশুধারী পৌরাণিক পরশুরামের মতো রাজশেখর বসু অতখানি নির্মম বা নৃশংস না হলেও তিনিও হাস্যরসের আড়াল থেকে অস্ত্রনিক্ষেপ করে আঘাত করতে যথেষ্ট সুদক্ষ শিল্পী। রাজশেখরের পক্ষে এই ব্যঙ্গপ্রবণতা কোন আকস্মিক রচনা-কৌশল-মাত্র নয়, এ-তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা ও মানস-প্রকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। রাজশেখরের প্রথম গল্প যখন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স বিয়াল্লিশ। পরিণত বয়সে তিনি সাহিত্যসাধনা আরম্ভ করেন।' তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা ন-টি। এ-ছাড়াও সিরিয়স বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'চলন্তিকা' নামে একটি অনন্য বাঙলা অভিধান সংকলন করেছেন এবং চলতি গদ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ তাঁর বিচিত্রকর্মা প্রতিভার পরিচয় দেয়।

'গড্ডলিকা' [১৯২৪] পরশুরামের প্রথম গল্পগ্রন্থ। এতে মোট পাঁচটি গল্প আছে। এই গ্রন্থের গল্পগুলি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে পরশুরামের বৈশিষ্ট্য ও অনন্যতা স্বীকার করে নেয়। আরম্ভেই ইনি কৌতুক গল্পের উপযোগী একটি সিদ্ধ আঙ্গিকের অনুসন্ধান করে নিয়েছেন। এঁর পূর্ববর্তী লেখকেরা 'ব্যঙ্গ কৌতুকের আশ্রয়ে নক্শা লিখতে যতটা উৎসাহী হয়েছেন গল্প রচনায় ততটা নয়। সমাজ-ব্যঙ্গ সাহিত্যিকদের হাতে প্রায়ই প্রহসনের ভঙ্গি গ্রহণ করে। দু-একজন ব্যতিক্রম থাকলেও রাজশেখর বেশি বয়সে গল্প লিখতে বসে প্রাজ্ঞ-স্থিতধী এবং স্বভাব-গম্ভীর সচেতনভাবে নিজস্ব একটি শিল্পাঙ্গিক আবিষ্কার করলেন।' এই গ্রন্থের গল্পগুলির মধ্যে যে 'উদ্ভট কল্পনা ও অনাবিল হাস্যরসের অফুরন্ত নির্ঝর প্রবাহিত হইয়াছে বাঙালী পাঠক তাহাতে অবগাহন করিয়া তাহার নানা-সমস্যা-বিড়ম্বিত জীবনে চিত্তবিনোদনের একটা আশাতীত উপায় লাভ করিয়াছে। তাঁহার অসামান্য উদ্ভাবনী শক্তি, কল্পনা-প্রাচুর্যের অজস্রতা ও বিসদৃশের সমাবেশ-কৌশলে হাস্যরস-সৃষ্টির সাবলীল নিপুণতা আমাদিগকে বিস্ময়ে অবাক করিয়া তোলে। আমাদের এই প্রথাবদ্ধ, নিয়মশাসিত, অভাব-দৈন্য-পিষ্ট জীবনে যে এত সুপ্রচুর হাস্যরসের উপাদান সঞ্চিত আছে ইহা লেখক আমাদিগকে দেখাইয়া না দিলে আমরা কোনদিনই অনুভব করিতে পারিতাম না।'

পরশুরামের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ হলো **'কজ্জলী'** [১৯২৭]। এতে সংগৃহীত গল্পের সংখ্যা হলো পাঁচ [যেমন : 'বিরিঞ্চিবাবা', 'জাবালি', 'দক্ষিণ রায়' 'কচি-সংসদ', ও 'উলট-পুরাণ']। এর প্রথম গল্পটিকে অবলম্বন করেই পরশুরাম সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এখানে ধর্মীয় ভণ্ডামি এবং তথাকথিত সাধুবাবাদের প্রতি ব্যঙ্গকৌতুকের শর নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এই গল্পের ধর্মীয় ভণ্ডামি অভিনব কিছু বিষয় নয়। কিন্তু লেখক অভিনব কয়েকটি চরিত্র রচনা করে ছোট ছোট হাসির

ঢেউ তুলতে সক্ষম হয়েছেন। অন্য একটি গল্প 'উলট পুরাণ' উলটা-পাল্টা ছবি তৈরির জন্য উপভোগ্য হয়েছে। 'ভারতবাসীর ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ, ইংরেজী আচার-ব্যবহারের অনুকরণ, ইংরেজের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে আন্দোলন, তাহার মনের কান্না ও অভিমানের উচ্ছ্বাস এই সমস্তই ইংরেজে আরোপিত হইয়া অভূতপূর্ব এক comedy সৃষ্টি করিয়াছে। ...এই রসিকতার দো-নলা বন্দুক ইংরেজ ও ভারতবাসী উভয়কেই আঘাত করিয়াছে—কিন্তু আঘাতের মধ্যে কোন বিদ্বেষের বিষ-জ্বালা নাই, আছে কৌতুকমিশ্রিত বিদ্রূপ।'

পরিশেষে 'গড্ডলিকা' ও 'কজ্জলী'তে ব্যবহৃত ছবিগুলির কথা উল্লেখ করতে হয়। ছবিগুলি ঐ দুই বই-এর ঐশ্বর্য। যতীন্দ্রকুমার সেন অঙ্কিত ঐ ছবিগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'ইহাতে আরও বিস্ময়ের বিষয় আছে, সে যতীন্দ্রকুমার সেনের চিত্র। লেখনীর সঙ্গে তুলিকার কী চমৎকার জোড় মিলিয়াছে, লেখার ধারা রেখার ধারা সমান তালে চলে, কেহ কাহারো চেয়ে খাটো নয়। তাই চরিত্রগুলো ভাষায় ও চেহারায়, ভাবে ও ভঙ্গীতে, ডাইনে ও বামে এমন করিয়া ধরা পড়িয়াছে যে, তাহাদের আর পলাইবার ফাঁক নাই।'

পরশুরামের সার্থক বৈশিষ্ট্য তথা আমাদের আলোচ্য দুই গ্রন্থ সম্পর্কে আধুনিক সমালোচক লিখছেন: "আধুনিক জটিল জীবনচেতনার নানান্ রঙ রাজশেখরের গল্পে মিশে আছে। আধুনিক জীবনের নানা নিগূঢ় অসঙ্গতি তাঁর পরিহাসের বিষয় হয়ে উঠেছে। কেবল আধুনিক জীবনই নয়, প্রাচীনকালের অসঙ্গতিপূর্ণ প্রথাবদ্ধ সংস্কারকে তিনি হাসির উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ··তাঁর বিজ্ঞান-সচেতন নিরপেক্ষ মন কোন বিশেষ কালের জীবনবোধের সমর্থক নয়। তাঁর দৃষ্টি পরিহাসপ্রিয় হাস্যরস-স্রষ্টার। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক উভয়কালেরই বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জীবনের অসঙ্গতির মধ্যে যে হাস্যরসের অফুরন্ত নির্ঝর প্রচ্ছন্ন আছে, তাকেই উন্মোচন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'পরশুরাম নামটা শুনিয়া পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে যে লেখক বুঝি জখম করিবার কাজেই প্রবৃত্ত। কথাটা একেবারেই সত্য নয়।' আমাদেরও তাই দৃঢ় বিশ্বাস" [ড. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী]।

৫১. **যুবনাশ্ব:** এঁর প্রকৃত নাম মণীশ ঘটক [১৯০১-১৯৭৮]। বিশিষ্ট চিত্র-পরিচালক ঋত্বিক ঘটক এবং মহিলা ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী এঁরই পরিবারের লোক। একটি সাহিত্য-শিল্পরসপরিপুষ্ট পারিবারিক আবহাওয়া এই পরিবারের ঐতিহ্য। ইনি 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর এক 'জোয়ান ঘোড়া'র মতোই 'উদ্দীপ্ত', 'সবল'। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে 'কল্লোলে'র কোলাহলে অভিস্নাত হওয়ার আগে তাঁর প্রথম গল্প 'গোষ্পদ' ঐখানে প্রকাশিত হয় ১৩৩১-এর পৌষ সংখ্যায়। যুবনাশ্ব কবি ও গল্পকার। এঁর কবিতার বই 'শিল্পালিপি'র [১৯৩৯] অধিকাংশ কবিতা প্রকাশিত হয়েছিলো 'প্রবাসী', কবিতা', 'পরিচয়' ইত্যাদি সাহিত্য-পত্রিকায়। অপরাপর গ্রন্থগুলি হলো, 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী', 'মান্ধাতার বাবার আমল', 'যদিও সন্ধ্যা'।

যুবনাশ্ব Romantic-এর চোখ দিয়ে নয়, বস্তুসচেতনতার খোলা চোখে জীবনের অন্ধকার দিককে, ক্লেদকে নিরীক্ষণ করেছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন : "বলতে গেলে, মণীশই কল্লোলে'র প্রথম মশালচী। সাহিত্যের নিত্যক্ষেত্রে এমন সব অভাজনকে সে ডেকে আনল যা একেবারে অভূতপূর্ব। ···যে জীবন ভগ্ন, রুগ্ন, পর্যুদস্ত, তাদেরকে সে সরাসরি ডাক দিলে জায়গা দিলে প্রথম পংক্তিতে। ···দেখালে তাদের ঘা, তাদের নির্লজ্জতা। সমস্ত কিছুর পেছনে দয়াহীন দারিদ্র্য।" অচিন্ত্য-কুমার কথিত এই-ই যুবনাশ্বের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য। "তিনি 'কল্লোলে'র 'প্রথম 'মশালচী' রূপে নেমে এসেছেন সমাজের ওপরের স্তর থেকে একেবারে 'Lower Depths'-এ। সমাজের 'তলানি' 'কানা খোঁড়া ভিক্ষুক গুণ্ডা চোর আর পকেটমারের' আড্ডায়।—যে পরিবেশে মনুষ্যত্ব, স্নেহ-প্রেম-মমতা সবই হাস্যকর সৌখীন বিলাস মনে হয়। এখানে একমাত্র সত্য—টিঁকে থাকা। জৈব প্রবৃত্তিই এখানে সার কথা।"

'গল্পের অতিবাস্তবতা ও কবিতার উষ্ণ প্রেম-ভাবনা নিয়ে তিনি কল্লোলের নিষ্ঠার সঙ্গে এনেছিলেন একটা নতুন ডাইমেনশান।' যার ফল হয়েছিলো : "বাঙলা ১৩৩৩ সনে ২৩ ফাল্গুন সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের কাছে পত্রযোগে 'আধুনিক' সাহিত্যের অশ্লীলতা সম্পর্কে যে অভিযোগে জানিয়েছিলেন তার মধ্যে অশ্লীল রচনা হিসাবে যুবনাশ্বের 'কয়েকটি গল্পে'র উল্লেখ ছিলো।" এমন যে যুবনাশ্ব—যাঁর গল্পগুলি বাঙলা সাহিত্যে 'নতুন আবাদের বীজ' ছড়িয়েছিলো, সমালোচক যাঁর পক্ষে ঐ দাবীর চিরদিন স্বীকৃতি আশা করেছিলেন ; গত ১৬.১.৯২ সংবাদপত্রের পাতায় ['আজকাল'] জনৈক গবেষক সক্ষোভে চিঠি লিখেছেন : 'কোনও উৎসাহী গবেষক, ছাত্র, অধ্যাপক ইচ্ছে করলেও খুঁজে পাবেন না তাঁর সাহিত্যকর্মের কোন নিদর্শন। প্রকাশক মহলে বা বই পাড়াতেও তাঁর বইয়ের পুনর্মুদ্রণ হতে দেখা যায় না। কিন্তু কেন ? আমরা কি ধরে নেব বাঙলা সাহিত্যে মণীশ ঘটক বলে কেউ ছিলেন না ? তাঁর অসামান্য সাহিত্যকর্ম একজন পাঠককেও কি প্রভাবিত করে নি ?'

৫২. **হ্যালহেড** ঃ এঁর পূর্ণ নাম নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড [Nathaniel Brassey Halhed]। ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দের ২৫ মে ইংলণ্ডের অক্সফোর্ডশায়ারের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে এঁর জন্ম হয়। বিদ্যাশিক্ষা বিলাতেই হয়েছিলো। তিনি তাঁর বন্ধু অভিনেতা নাট্যকার শেরিডানের কাছে শ্রীমতী এলিজাবেথ অ্যান লিনলে [১৭৫৪-৯২]-র সঙ্গে প্রেম-প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে ১৭৭২ সালের নভেম্বর মাসে কোলকাতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী হয়ে চলে আসেন। ইনি ছিলেন একজন good poet, ফারসী ভাষায় এঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিলো এবং সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান ছিলো 'very defective and insufficient'. অবশ্য পরে এই ত্রুটি তিনি সংশোধন করে নিয়েছিলেন। এ-দেশে তিনি নানা বিচিত্রকর্মে যুক্ত থাকেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষক হেস্টিংস-এর সহযোগিতায় খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করেন। পরে হেস্টিংস এ-দেশ ছাড়ার পর তিনিও ভারত ছেড়ে ১৭৮৫-তে ইংলণ্ডে ফিরে যান। হ্যালহেডের শেষ জীবন বিশেষ

অশান্তিতে অতিবাহিত হয়েছিলো। ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় তিনি নিঃস্ব হয়ে যান—শ্রবণ-শক্তি হারিয়ে ফেলেন, খ্রীস্টমণ্ডলীর কাছে নিন্দাভাজন হন এবং শেষে ১৮৩০-এর ১৮ ফেব্রুয়ারী তাঁর জীবনাবসান হয়।

১৭৭৬ সালে ইংলণ্ড থেকে তাঁর A Code of Gentoo Laws মুদ্রিত হয়। ১৭৭৫ থেকে ১৭৭৮ সালের মধ্যে লেখা হয়ে ১৭৭৮ সালের অগাষ্ট [?] মাস নাগাদ তাঁর বিখ্যাত ব্যাকরণগ্রন্থ **A Grammar of the Bengal Language** মুদ্রিত হয়। এ-ছাড়াও তিনি মহাভারতের ও উপনিষদের অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কয়েকটি পুরাণ ও ভাগবতের [১০ম স্কন্ধ] অনূদিত পাণ্ডুলিপি এখনও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা আছে।

পলাশীতে পরাজয়ের পর বাঙালীর জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধীরে ধীরে ইংরেজের আধিপত্য বিস্তৃত হতে থাকে। সেই আধিপত্যকে ধরে রাখতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তার নিজস্ব ইংরাজ কর্মচারীদের বাঙলা ভাষায় অভিজ্ঞ করে তোলবার জন্য নানা প্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে হ্যালহেড, চার্লস উইলকিন্স প্রমুখ ভারতীয় ভাষাবিদ্‌গণকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারই ফল হলো পূর্বোক্ত হ্যালহেডের বাঙলা ব্যাকরণ। যদিও এই ব্যাকরণটি ইংরেজি রীতি অনুসারে এবং ইংরেজি ভাষায় লেখা, তথাপি এতে দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর থেকে যেসব উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে তা বাঙলা অক্ষরেই ছাপা হয়। আংশিকভাবে হলেও বাঙলা অক্ষরের এই ব্যবহার বাঙলা অক্ষরে বই ছাপার দরজাকে খুলে দেয়। হ্যালহেডের ব্যাকরণের আগে পর্যন্ত বাঙলা অক্ষরে কোন কিছু ছাপা হয়নি। বন্ধু হ্যালহেডের বই ছাপার কাজে সাহায্য করায় জন্য চার্লস উইলকিন্স পঞ্চানন নামক জনৈক দেশীয় কর্মকারের সহায়তার ছেনি কেটে বাঙলা হরফ তৈরি করেন। এখন পর্যন্ত বাঙলা যে অক্ষর আমাদের দেশে চলছে তা ঐ পঞ্চানন ও মনোহরের তৈরি অক্ষরের আদর্শেই তৈরি হয়ে থাকে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য হ্যালহেডের বাঙলা ব্যাকরণ সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

৫৩. **'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'** ঃ আমাদের জানা আছে যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীর যুবকগণ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' [১৮৩১ প্রথম প্রকাশ]-এর পৃষ্ঠপোষণায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রামমোহনের পর তাঁর প্রবর্তিত মতাদর্শকে বহন করবার দায়িত্ব এসে পড়ে ঠাকুরবাড়ীর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর। তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করে 'তত্ত্বরঞ্জিনী' নামে এক সভা স্থাপন করেন। কয়েকদিন পরেই এই সভার নাম পরিবর্তিত করে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' করেন। এই সঙ্গে তিনি ব্রাহ্মসমাজের বক্তব্যকে যুক্ত করে ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করেন। এটি প্রথমে মাসিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যা, ব্রাহ্ম-উপাসনার পদ্ধতি-প্রচার এবং তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজের দূর প্রবাসী সদস্যগণের কাছে জ্ঞানোন্নতি সাধন, তথ্যানুসন্ধানের তত্ত্ব পৌঁছে দেবার জন্য

দেবেন্দ্রনাথ এই মুখপত্রটির উদ্বোধন করেন। বাঙলার বিখ্যাত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত এই পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন। প্রথম দিকে পত্রিকাটি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত ও নির্দেশ অনুসারে চলতে থাকলেও শীঘ্রই অক্ষয়কুমারের আপন মনীষা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দ্বারা এই পত্রিকাকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-মাধ্যমে পরিণত করেন। বাঙলা গদ্য-রচনার ক্ষেত্রে সচেতন শিল্প-চেতনার যে সার্থক সমন্বয় আমরা পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে লক্ষ্য করেছি তা এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই প্রথম জন্ম লাভ করেছিলো। এই পত্রিকার সঙ্গে অন্তত দু-জন গদ্যকার—অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—যদি সংশ্লিষ্ট না থাকতেন তবে বাঙলা গদ্যের রাজ্যে রাজচক্রবর্তী বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব ত্বরান্বিত হতো কিনা সন্দেহ। যা হোক এই পত্রিকাকে অক্ষয়কুমার পূর্ণ কর্তৃত্বে এনে এর পৃষ্ঠায় তিনি নিয়মিত ভাবে দর্শন-বিজ্ঞান, সমাজ-সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন। এই পত্রিকা প্রকাশের পর থেকেই সংবাদ-সাময়িকপত্র সংকীর্ণ ধর্মীয় তর্ক এবং তুচ্ছ আক্রমণাত্মক ব্যঙ্গরচনার স্তর থেকে পূর্ণ সাংস্কৃতিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইখান থেকেই সংবাদ-সাময়িক পত্রিকার যে ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিলো তার ধারা আজও বয়ে আসছে।

অন্যদিকে এই পত্রিকা নীলকরদের অত্যাচার ও অপরাপর সামাজিক বা রাজনৈতিক অন্যায়ের প্রতিবাদ করে তার সমাজ-সচেতনতা বজায় রেখেছিলো। খ্রীস্টধর্মের প্রতি অন্ধ উৎসাহের আবেগকেও এই পত্রিকার মারফৎ সংযত করা হয়েছিলো। এইভাবে, নানা দিক থেকে এই পত্রিকা তৎকালীন বাঙালীর জন-চিত্তকে আত্মবোধের নতুন শক্তিতে উদ্বোধিত করতে সক্ষম হয়েছিলো। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত চিন্তাবিদ্‌গণের নাম দেখা যায়, তার মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও আলোচনার রচনা-সমৃদ্ধি ও ভাষা-সৌকর্যের জন্য এর কোন কোন সংখ্যা কলেজ-বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো।

৫৪ গোবিন্দচন্দ্র দাস: ভাওয়াল পরগণার এই কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস [১৮৫৫-১৯১৮] আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'স্বভাব-কবি' নামে বিখ্যাত। বাঙলা দেশের আর্দ্র জলহাওয়ার মতো ওঁর কবিত্ব সিদ্ধবস্তু ছিলো—কোন সাধ্যবস্তু নয়। প্রবল আবেগোচ্ছ্বাস, নিঃসঙ্কোচ দেহ-কামনার বলিষ্ঠ প্রকাশ এবং রোমান্টিক কল্পনাজাত রসবেদ্য-বেদনাবোধ তাঁর কাব্যে সুন্দর ও স্বচ্ছ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রেম-কামনায় প্লেটনিক আদর্শের অস্পষ্টতা ছিলো না—উদ্দাম দেহাসক্তির ঋজু বক্তব্য উত্তেজক মাদক-বস্তুর মতো কাব্যপাত্রে পরিবেশিত হয়েছে। তাঁর প্রেমিকা প্রসঙ্গে তিনি সোজাসুজি বলেছেন: 'আমি তারে ভালবাসি অস্থি মাংস সহ, / অমৃত সকলি তার মিলন বিরহ / বুঝি না আধ্যাত্মিকতা / দেহ ছাড়া প্রেমকথা / কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ।'

কবির সমস্ত জীবন দারিদ্র্য এবং বিরুদ্ধশক্তির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছে। একটি প্রচণ্ড জ্বালা অথচ অনমনীয় একগুঁয়েমি, নানাপ্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অত্যাচার অথচ নির্ভীক দুঃসাহসিকতা তাঁকে যদি সুস্থ এবং শান্তিপূর্ণ স্বাভাবিক জীবন থেকে উৎক্ষিপ্ত না করতো তবে 'তাঁহার নিকট হইতে বাংলা কাব্য-সাহিত্য যে কাব্য-সম্পদ লাভ করিত তাহার তুলনা হইত না। কারণ, সেই প্রতিভা তাঁহার ছিল' কবির ব্যক্তি-জীবনের হাহাকার তাঁর কবিতার কোথাও গোপন থাকেনি: 'এতটুকু ভালবাসা / একটি স্নেহের ভাষা / এক ফোঁটা আঁখিজল কোথাও না পাই। / সত্যই এ বসুন্ধরা / কেবল রাক্ষস ভরা / দয়ার সে দেবতারা এ' জগতে নাই।' এখানে জীবন-জগত সম্পর্কে কবির আশাভঙ্গের ক্ষোভ প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকেনি।

স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে 'প্রেম ও ফুল' [১৮৮৭], 'কুঙ্কুম [১৮৯১], 'চন্দন' [১৮৯৬], 'ফুলরেণু' [১৮৯৬], 'বৈজয়ন্তী' [১৯০৫] ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। আজকের পাঠকের কাছে অপরিচিত হলেও গোবিন্দচন্দ্র, সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যের অনেক পরম্পরা তাঁর মধ্যে বহন করে চলেছেন।

৫৫. **'কীর্তিবিলাস'**: এই নাটকটির রচনাকাল ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দ। লেখক জি সি. গুপ্ত.—যিনি বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত নামে বিখ্যাত [কোন কোন সমালোচক জি. সি. এই দুই ইংরাজী বর্ণের পূর্ণরূপ 'যোগেন্দ্রচন্দ্র' গ্রহণ করতে চান না]। নাটকটির কথাবস্তু মৌলিক না হলেও এটিই বাঙলা সাহিত্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিয়োগান্ত নাটক। নাট্যকার অনেকানেক পাশ্চাত্য নাটক পাঠ করে দেশীয় রীতির [convention] বিরুদ্ধে বাঙলার সুপরিচিত রূপকথা 'বিজয়-বসন্ত' বা 'শীতবসন্তে'র কাহিনী থেকে আখ্যান সংগ্রহ করে এই নাটকটি গড়ে তুলেছেন। নাট্যক'র নাটকীয়তা, যথার্থ গদ্যে নাটকীয় সংলাপ কিংবা চরিত্র সৃষ্টি কোনদিক থেকেই বিশেষ কোন সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও তাঁর নাম বা নাটক স্মরণীয় হয়ে রয়েছে তাঁর নাট্যবস্তু উপস্থাপনার অভিনবত্বের জন্য।

এই নাটকের বিশেষত্ব সম্পর্কে নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসকার লিখেছেন: 'নাট্যকার এই দেশের রস-সংস্কার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন; সেইজন্য যাহাতে তাঁহার বাংলা ভাষায় এই বিষয়ক সর্বপ্রথম প্রয়াসকে নিতান্ত কোন দুঃসাহসিক পরীক্ষামূলক কার্য [experiment] বলিয়া কেহ মনে না করেন, সেই উদ্দেশ্যে এতদ্দেশীয় ভাষায়ও বিয়োগান্তকনাটকের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করিয়া তিনি এক সুদীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা করিয়াছেন। এই ভূমিকাটিতে বাঙলায় বিয়োগান্তক নাটক রচনা করিবার জন্য যেমন একদিক দিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে, আবার অন্য দিকে তেমনই সমসাময়িক সমাজের রস-বোধেরও পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।…

"কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সংস্কৃত নাটকের অনুযায়ী নান্দী ও 'নান্দ্যন্তে সূত্রধার' দ্বারাই তাঁহার নাটকের সূত্রপাত হইয়াছে।…ইহা গদ্যপদ্যমিশ্র রচনা এবং ইহাতে একটি

সঙ্গীতও যোগ করা হইয়াছে। নাট্যকার এখানে ইংরেজি scene কথাটিতে 'অভিনয়' বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন।"

এছাড়াও এই কীর্তিবিলাস নাটকটি 'ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা নীতি ও রুচির দিক দিয়া নিন্দনীয় হইতে পারে নাই।'

৫৬. **'কুলীনকুলসর্বস্ব' / রামনারায়ণ** : এই টীকার উত্তরের জন্য প্রথমে দ্রষ্টব্য ১২৮ পৃষ্ঠার ৯ নম্বর টীকা। প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণের পর যোগ করা যেতে পারে :

সব দিক থেকে বিচার করে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' [১৮৫৪] নাটকটিকে বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক হিসাবে গ্রহণ করা যায়। সেদিনের হিন্দু বাঙালী সমাজে কৌলীন্য প্রথার মতো একটি কদাচারের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশে ধীরে ধীরে প্রতি-রোধী কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠছিলো। তারই অভিঘাতে রঙপুরের জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে 'মনোহর নাটক' লেখার আহ্বান জানালেন। এই বিজ্ঞাপনের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক রামনারায়ণ এই নাটকটি রচনা করেন ও পারিতোষিক লাভ করেন।

কুলীন ব্রাহ্মণ কেশব চক্রবর্তীর ৩২, ২৬, ১৫ ও ৮ বছর বয়স্ক চার মেয়ের সঙ্গে ঘটকের কারসাজিতে বয়সের ভারে জীর্ণশীর্ণ, কদাকার, মূর্খ, কাণা ও বধির এক কুলীনের বিবাহ দিয়ে কিভাবে উক্ত চক্রবর্তী তাঁর কুল রাখতে পেরেছিলেন তার করুণ কাহিনী এখানে বর্ণিত হয়েছে। নাটকটিতে নানা নাটকীয় গুণ থাকা সত্ত্বেও নাট্যকার তার সদ্ব্যবহার করে উঠতে পারেননি। সে নাট্যবোধও তাঁর ছিলো না। আসলে রামনারায়ণ এখানে 'বিদেশী চাবিতে বাঙলার নিজস্ব সমাজজীবনের দ্বার উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন। এ-বাস্তব সমাজের প্রতিচ্ছবি ও দেশীয় প্রাণরসে পূর্ণ হলেও নাট্যশালার দিক থেকে ব্যর্থ। কেন না, এ কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমষ্টি ও নাটকীয় পরিণতির ঐক্যবন্ধনহীন।'

'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের কাহিনী-দৃঢ়তা নেই—কতকগুলি আলগা ঘটনাচিত্রের সমবায়। তা সত্ত্বেও লেখক এখানে যে-জীবনবোধের ও সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তিনি বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। এই নাটক উদ্দেশ্যমূলক রচনা হলেও নাট্যকারের যে সহৃদয়তা ও মানবিকতা ফুটে উঠেছে তা সেদিনের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণেই অনন্য। এই শক্তিতেই তিনি নিজে ব্রাহ্মণ ও কুলীন হয়েও নিজের সমাজের ত্রুটিকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করেননি। 'তিনি তাঁর অন্তর্মুখী সহানুভূতির সাহায্যে সেদিন নিজে যে সমাজে বাস করতেন সেই সমাজকেই আঘাত করবার শক্তির অধিকারী ছিলেন। এ তাঁর চিন্তার বিলাস ছিল না, জীবনের বিশ্বাস ছিল।'

৫৭ **'পথের পাঁচালী'** : রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যো-পাধ্যায় [১৮৯৪-১৯৫০] একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ['আরণ্যক' টীকায় তাঁর সম্বন্ধে

আলোচনা করা হয়েছে]। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হলো 'পথের পাঁচালী' [১৯২৯]। এর কাহিনী বিভূতিভূষণ 'অপরাজিত' [১৯৩২] দুই খণ্ডে বিস্তারিত করে দিয়ে নায়ক অপু বা অপূর্বের জীবনে পূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বিভূতিভূষণ ঠিক কল্লোলগোষ্ঠীর লেখক নন। মানসিকতার দিক দিয়ে ইনি এক স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী ছিলেন। সেই জগত কি ও কেমন তার পরিচয় 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে ধরা পড়েছে। এই কারণেই কোন কোন সমালোচক 'পথের পাঁচালী'কে বিভূতিভূষণের আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলতে চান। কিন্তু এইটিই সব নয়। বিভূতিভূষণ তাঁর প্রায় সমস্ত সাহিত্যকর্মের মধ্যে দিয়ে বাঙালীর অতিপরিচিত জগত-জীবন ও মানুষের ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছেন—'পথের পাঁচালী'তেও তার অন্যথা হয়নি। এখানকার পরিবেশ, কাহিনীর পরিকল্পনা যেমন আমাদের খুবই পরিচিত তেমনই সরল-সোজা। —এক কথায় আমাদের খুবই চেনা—এদের বিষয়ে আমাদের কোন কৌতূহলও থাকা উচিত নয়। কিন্তু 'এহো বাহ্য। বাঙলার অতিসাধারণ পল্লীজীবন ও পরিবেশ এবং মৌলিকতাবর্জিত নারীচরিত্রকে আশ্রয় করেও বিভূতিভূষণ বাঙলা কথাসাহিত্যে এক বিশিষ্ট মৌলিক শিল্পীব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছেন।' কি ভাবে? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "পথের পাঁচালি'র আখ্যান অত্যন্ত দেশি। কিন্তু কাছের জিনিষেরও অনেক পরিচয় বাকি থাকে। যেখানে আজন্মকাল আছি সেখানেও সব মানুষের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। পথের পাঁচালি যে বাংলা পাড়াগাঁয়ের সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়।...বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে।...এই গল্পে গাছপালা পথঘাট মেয়েপুরুষ সুখদুঃখ সমস্তকে আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনের থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানো হয়েছে। সাহিত্যে একটা নতুন জিনিষ পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিষের মতো সে সুস্পষ্ট।"

'পথের পাঁচালী' উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে কেন অনন্য—কেন এতখানি তার প্রতিষ্ঠা, এই জড়প্রিয়, যান্ত্রিক-তুচ্ছ-খণ্ডবুদ্ধি প্রণোদিত যুগেও আদরণীয় হয়েছে, আজও আমাদের আকর্ষণ করে সে-সম্পর্কে তিনজন বিশিষ্ট সাহিত্যসমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত করবো ক. ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: 'ইহার মৌলিকতা ও সরস নবীনতা বঙ্গ-উপন্যাসের গতানুগতিশীলতার মধ্যে একটি পরম বিস্ময়াবহ আবির্ভাব। অপুর ন্যায় জীবন্ত ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত চরিত্র বাঙলা উপন্যাস-সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই।'

খ অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশি মহাশয় বলেছেন: যাহা রবীন্দ্রপূর্ব যুগের গার্হস্থ্য উপন্যাসে ছিল না সেটি প্রকৃতি। এটি রবীন্দ্রপূর্বযুগে অভাবিত ছিল। এটি জীবনের একটি নূতন সূত্র, আমাদের দেশে তো বটেই, পাশ্চাত্য দেশেও। প্রকৃতিকে জীবনের উপাদানরূপে গ্রহণ ও স্বীকার নূতন যুগের লক্ষণ, যে নূতন যুগ এখনও পুরাতন হয় নাই। পশ্চিমের হাত হইতে রবীন্দ্রনাথ ইহা গ্রহণ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের হাত হইতে রবীন্দ্রোত্তরগণ গ্রহণ করিয়াছেন, রবীন্দ্রোত্তর কথাশিল্পীগণের মধ্যে বিভূতিভূষণ

সবচেয়ে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন। এখানেই বিভূতিবাবুর রচনায় নূতনত্ব, দেশ ও কালের চিহ্ন। এই উপাদানটি সবচেয়ে বেশি আধুনিক।'

গ 'একান্ত পরিচিত বাস্তব বিষয় ও চরিত্র, গার্হস্থ্য জীবন-রসাশ্রিত সঙ্কীর্ণ জীবন-বৃত্তের মামুলী আখ্যায়িকা—যে নূতন জিনিষের সংস্পর্শে রোমান্টিক রহস্য চেতনায় মেদুর হয়ে অসামান্যতা লাভ করেছে, তার অন্যতম উপকরণ হলো—প্রকৃতি। আর উপন্যাসে এই প্রকৃতিকে উপাদানরূপে গ্রহণ বাঙলা সাহিত্যে নিতান্ত আধুনিককালের ব্যাপার। এই অর্থে বিভূতিভূষণ বিশিষ্টভাবে 'আধুনিক'।'—আর 'পথের পাঁচালী' সার্থক আধুনিক উপন্যাস।

৫৮. **'পুতুলনাচের ইতিকথা'**: আধুনিক বাঙলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় [১৯০৮-১৯৫৬] অন্যতম প্রধান আত্মসচেতন কথাকার। ইনি কোন দিনই 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি'র লেখক ছিলেন না। তাঁর লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার আগেই ঐ সব সাময়িকপত্রের মৃত্যু হয়েছিলো। তবুও তাঁকে 'belated Kallolean' বলা হয়েছে। কেউবা তাঁকে 'কল্লোলেরই কুলবর্ধন' বলেছেন। কারোর বা মতে তিনি কল্লোলের spirit-এর বাহক। এঁরই দ্বিতীয় প্রধান উপন্যাস হলো 'পুতুলনাচের ইতিকথা' [১৯৩৬]। এই উপন্যাসে তিনি যে-ভাবে শশী কুমুদিনীর মনোবিশ্লেষণ করেছেন তা বাঙলা সাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত।

মানিক সেবা-প্রীতি-সংসারের বাইরেও দাম্পত্যজীবনের দেহকেন্দ্রিক তাৎপর্যকে দেখতে ভুল করেননি। প্রেম নিছক ভাববাদী কোন কল্পবস্তু নয়—সবই 'দেহের রহস্যে বাঁধা'। এই সত্যকথাগুলিকে তিনিই প্রথম তাঁর এই উপন্যাসে সোচ্চারে এবং অপরূপ আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন। এই কারণেই 'পুতুলনাচের ইতিকথা' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।—বাঙলা সাহিত্যেরও।

এই উপন্যাস সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: এখানে 'বাস্তবতার প্রসার কিছু বেশি থাকলেও তাঁর এর আগেকার দু-একটি লেখার মধ্যকার অসংলগ্নতা আগের মতোই রয়ে গেছে। এখানে যে সমস্যা ও ছবি রয়েছে তা নতুন কিছু নয়। কিন্তু তার রেখা ও আলোছায়ার বণ্টন এরূপভাবে বিন্যস্ত হয়েছে যাতে অপরিচয়ের একটি সূক্ষ্ম যবনিকা একে আড়াল করে থাকে। এই অপরিচয়ের সাংকেতিকতার বা রূপকের জন্য নহে; লেখকের মন্তব্য ও জীবন সমালোচনার পিছনে যে একটা বিশিষ্ট মনোভাব আছে তাই-ই এই আপেক্ষিক অপরিচয়ের হেতু।' মানিক এই উপন্যাসে সবচেয়ে দুঃসাহস দেখিয়েছেন একদিকে কুমুদ ও মতির পূর্বরাগ ও দাম্পত্য-জীবন বর্ণনায় এবং দ্বিতীয়ত বিন্দু ও নন্দলালের দাম্পত্য-সম্পর্কের বিবরণে। প্রথমটির Bohemianism এবং দ্বিতীয়টির মতো বিকৃতি বাঙলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নেই।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' সম্পর্কে আধুনিক সমালোচক বলছেন: "একালের জীবন-ভাবনার নানা প্রবণতা 'পুতুলনাচের ইতিকথা'কে আধুনিক উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত করে তুলেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে উপন্যাসটি তার

পরিণামী সংবেদনে আধুনিক-অনাধুনিকের সীমা অতিক্রম করে চিরায়ত জীবনবোধের দিকে ইঙ্গিত করেছে। এই উপন্যাসের লেখক হিসাবে মানিকের যথার্থ মহিমা ফুটেছে একাধারে আধুনিক যুগভাবনাধর্মী অস্তিত্বের নিরর্থকতা তথা ব্যক্তি-মানুষের বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার চেতনা এবং জীবন-মৃত্যু-লীলার অন্তহীন রূপের সুগভীর রহস্য উপলব্ধি—এ-দুয়ের সমন্বয়ী সৃষ্টি-কল্পনার মধ্যে। আর এইখানেই এই উপন্যাসের শিল্পসৃষ্টির রহস্য।

কোন লেখকের জীবনের প্রতি দৃষ্টি-প্রক্ষেপ যাকে ইংরাজী পরিভাষায় attitude towards life—সাধারণত অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে সেই বীক্ষণ-পদ্ধতির আঙ্গিকে বদল ঘটতে পারে মাত্র। মানিকের সমগ্র সাহিত্যজীবনে এই জীবন-নিরীক্ষণের কোণটির পরিবর্তন ঘটেনি—মাত্রার তারতম্য ঘটলেও। হয়তো কখনো কখনো মৌল উপাদানে অন্য মসলার মিশেল ঘটেছে মাত্র। কিন্তু তাঁর 'পুতুলনাচের ইতিকথা' একেবারে প্রথমদিককার উপন্যাস। এখানে সবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে মাত্র—নতুন চর জাগার মতো—অনেক জায়গাতেই এখনও তরল আছে। তাই তিনি মানুষকে—'গোটামানুষ'কে সামনে রেখে নির্লিপ্ত বিজ্ঞানীর মতো ব্যবচ্ছেদের ছুরি চালিয়েছেন। এই বিষয়টি প্রথম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না—বা কুসুমের সংলাপগুলি পর্যালোচনা করে অনেকে মনে করেন যে, সেই যুগের যুবক লেখকদের মতো মানিক যৌন সমস্যাকেই তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্রে রেখেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়—এই উপন্যাসের সমস্যা 'শশীর মনের সমস্যা, তার সত্তার মূলীভূত সমস্যাই এ-উপন্যাসের বিষয়—গাওদিয়ার সমস্ত বিড়ম্বনার সূত্রে শশীর জীবনের বিড়ম্বনার জট পাকিয়ে যাওয়ার সমস্যা।' আমাদের কিম্ভূতকিমাকার ঔপনিবেশিক জীবনের অসংখ্য জটপাকানো সমস্যাগুলির একটিকে খুলবার চেষ্টা হলো মানিকের এই 'পুতুলনাচের ইতিকথা'।

৫৯. **'প্রফুল্ল'**: গিরিশচন্দ্র ঘোষ [১৮৪৪-১৯১২] 'প্রফুল্ল' [১৮৮৯] নাটকটির রচয়িতা। গিরিশচন্দ্রের রচিত ও অনূদিত নাটকের সংখ্যা প্রায় শতাধিক। তিনি প্রহসন, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ইত্যাদি জীবনের প্রায় সমস্ত দিককে আশ্রয় করে নাটক রচনা করেছেন। এর মধ্যে পুরাণের বিষয় নিয়ে নাটক লিখতে সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। আসলে তিনি ছিলেন play writer—নাট্যকার নয়। মূলত নাট্যশালার সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে কিসে নাট্যশালায় বেশি দর্শক আসবে—box office কিসে ফেঁপে উঠবে তা তাঁর সময়ে তাঁর চেয়ে আর কেউ ভালো বুঝতেন না। এই কারণেই সমকালীন সমাজ-সমস্যা নিয়ে নাটক লিখতে তিনি তেমন আগ্রহ পোষণ করতেন না। তিনি সামাজিক নাটক লেখা আর নর্দমা ঘাঁটা একই কাজ বলে মনে করতেন। তবুও তারই মধ্যে 'প্রফুল্ল', 'বলিদান' [১৯০৫] প্রভৃতি দু একটি সামাজিক নাটক বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিলো।

মদ্যপান কিভাবে একজন স্থিতধী-উদ্যমী পুরুষের জীবনকেও ছারখার করে দিতে

পারে তা-ই এখানে বর্ণিত হয়েছে। যোগেশ উত্তর কোলকাতার একজন প্রতিষ্ঠিত ও কৃতি পুরুষ। তিনি নিজের উদ্যমে বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন। স্ত্রী, এক বালক পুত্র, মা, উকিল ও বিবাহিত মেজ ভাই এবং অবিবাহিত ছোট ভাই সুরেশকে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার। অকস্মাৎ যোগেশের সমস্ত টাকা সঞ্চিত আছে যে ব্যাঙ্কে সেটি ফেল পড়ে গেল। উন্মাদের মতো হয়ে গিয়ে তিনি অনবরত মদ্যপান করতে লাগলেন। আর তাঁর অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার সুযোগ নিয়ে উকিল মেজ ভাই রমেশ সব ঠকিয়ে নিয়ে তাঁকে পথের ভিখারী করে দিলে। এই-ই নাটকের বিষয়বস্তু। রমেশের স্ত্রীর নাম 'প্রফুল্ল'—এরই নামে নাটকের নামকরণ করা হয়েছে।

গিরিশচন্দ্রের সব নাটকেই যে দুর্বলতা থাকে—অতিনাটকীয়তা—এই নাটকটিতেও তার ব্যতিক্রম নেই। এখানে দেখা গেছে একদল নিষ্ঠুরভাবে অবিরত অত্যাচার করে গেছে—কার্যকারণের সম্বন্ধ সব জায়গায় থাকে নি—আর একদল মুখবুজে অত্যাচারিত হয়েছে। 'নায়ক যোগেশের চরিত্র-পরিকল্পনার ব্যর্থতা এবং সমগ্র নাটকীয় পরিকল্পনাই এর জন্য দায়ী। তাঁর সমকালীন নিচুতলার কলকাতার মানুষগুলোই প্রাণবন্ত হয়ে ফুটেছে এই নাটকে। জগমণি কাঙালীচরণের মতো মূর্তিমান শয়তান, ভজহরির মতো বিবেকবান জুয়াচোর, মদনের মতো বাউণ্ডুলে পাগল—তাদের মুখের ভাষাসহ এই নাটকে রূপ পেয়েছে। এই জাতীয় চরিত্রাঙ্কনে গিরিশচন্দ্রের অনস্বীকার্য পারদর্শিতা ছিল।' সেদিনের সমাজ-মনস্কতার পরিপ্রেক্ষিতে 'প্রফুল্ল' তার গুরুত্বপূর্ণ দৃক্‌ভঙ্গী এবং বিষয়বস্তুর গুণে অনেকেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলো। তা-ছাড়া যোগেশের ভূমিকায় তাঁর বা দানীবাবুর অনবদ্য অভিনয় সেদিনের দর্শক-সাধারণকে বিমোহিত করে রেখেছিলো। এই নাটকের প্রধান চরিত্র যোগেশের করুণ আর্তনাদ 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' আজও বাঙালীর কাছে প্রবাদ বাক্যের মতো হয়ে আছে। এই সমস্তের বিচারে 'প্রফুল্ল' নাটকটি বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

৬০. 'চোখের বালি': রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের [১৮৬১-১৯৪১] লেখা 'চোখের বালি' উপন্যাসটি নানা দিক থেকে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখনীয়।

ক. উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিভাধর সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামের সঙ্গে যুক্ত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় আবার নতুন করে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করলে [১৩০৮, বৈশাখ, ১৯০১] রবীন্দ্রনাথ তাতে 'বর্ষব্যাপী ভোজে গল্পের পুরো পরিমাণ জোগান' দেবার দায়িত্ব নিয়ে 'চোখের বালির' সূত্রপাত ঘটান।

খ. রবীন্দ্রনাথ ঐ বঙ্গদর্শনের আদি পর্যায়ে [১৮৭২-৭৬] 'বিষবৃক্ষ'র [১৮৭৩] রস উপভোগ করেছিলেন,—পরে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'রও [১৮৭৮]। এই দুটিতেই নরনারীর ত্রিকোণ প্রেমের জটিলতা ও তার করুণ পরিণতি আঁকা হয়েছে। 'চোখের

টীকা : ১৩

বালি' রচনার সময় বোধহয় রবীন্দ্রনাথেরও ত্রিকোণ প্রেম ও তজ্জনিত জটিলতার কথা মনে ছিলো।

গ. এই উপন্যাসটি 'নব পর্যায় বঙ্গদর্শনে'র ১৩০৮ বৈশাখ থেকে ১৩০৯ কার্তিক পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে ১৩০৯-এ গ্রন্থবদ্ধ হয়।

ঘ. এটি বাঙলা সাহিত্যে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসাবে বিখ্যাত হয়ে আছে।

ঙ. রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'চোখের বালি'র 'সূচনা'য় লিখেছেন: 'বঙ্গদর্শনকে নব পর্যায়ে' টেনে আনা যেতে পারে, কিন্তু সেই প্রথম পালার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না। সে-দিনের আসর ভেঙে গেছে, নতুন সম্পাদককে রাস্তার মোড় ফেরাতেই হবে।'— 'চোখের বালি' বাঙলা উপন্যাসের সেই মোড় ফেরার গল্প।

চ. 'চোখের বালি' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজে যা বলেছেন এ-প্রসঙ্গে তা অবশ্য-উল্লেখ্য। তিনি ১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসে উপন্যাসের 'সূচনা' হিসেবে লিখেছেন: 'প্রস্তুত, ফরমাশ এসেছিল বাইরে থেকে। ...ঠিক করতে হল, এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা ঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনও হত, এখনও হয়; তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে। এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজসজ্জার অলংকারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট। তাই গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুম না তখন নামতে হলো মানবসংসারের সেই কারখানা ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানববিধাতার এই নির্মম সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ তাঁর পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশ পায় নি।...বঙ্গদর্শনের নব পর্যায় এক দিকে তখন আমার মনকে রাষ্ট্রনীতিক-সমাজনৈতিক চিন্তার আবর্তে টেনে এনেছিল, আর-এক দিকে এনেছিল গল্পে, এমনকি কাব্যেও মানবচরিত্রের কঠিন সংস্পর্শে। অল্পে অল্পে এর শুরু হয়েছিল সাধনার যুগেই, তারপরে সবুজপত্র পসরা জমিয়েছিল।'—অর্থাৎ 'চোখের বালি' মানবচরিত্র সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান অর্জনের প্রথম এবং পরিণত ফল।

ছ. মহেন্দ্র ও বিহারী দুই বন্ধু। মাঝে এসে পড়লো 'বড়ো সুন্দরী, আবার মেমের কাছে পড়াশুনা' করা বিধবা সপ্রতিভ যুবতী বিনোদিনী। এই এসে পড়ার মাঝখানে আছে সংসার অনভিজ্ঞা আশালতা বা মহেন্দ্রের বউ এবং মহেন্দ্রের মা রাজলক্ষ্মী। রবীন্দ্রনাথ মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারের প্রধানত এই কটি চরিত্র নিয়ে যে জটিল সম্পর্ক-সমস্যা ও মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছেন তা সেদিনের বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিনব। রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে বলেছেন: 'চোখের বালি'র গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা। এই ঈর্ষা মহেন্দ্রের সেই রিপুকে কুৎসিত অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন করে দাঁত-নখ বের করত না। যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে। সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে

তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল 'চোখের বালি'তে।' এইজন্যেই 'চোখের বালি'কে বাঙলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি land mark হিসাবে চিহ্নিত করেছি;—এইখান থেকেই বাঙলা কথাসাহিত্যের মর্জি-বদল হয়েছে।

৮১ **'কারাগার': মন্মথ রায়:** মন্মথ রায় [১৮৯৯-১৯৮৮]-এর লেখা ছদ্ম-পৌরাণিক নাটক হলো 'কারাগার' [১৯৩০]। মন্মথ রায় আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার। ঐতিহাসিক, সামাজিক-পৌরাণিক বিষয় নিয়ে অনেকগুলি একাঙ্ক এবং পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখে মন্মথ রায় বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য আসন লাভ করেছেন। মন্মথ রায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আধুনিক কালের ভাব ও ভাষায় পুরাণের কাহিনী নাটকীয় করে পরিবেশণ করা। এ বিষয়ে তিনি নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন পথের দিশারী। এ-প্রসঙ্গে নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসকার লিখেছেন: 'পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়াও অতি-আধুনিক যুগের মনোভাব যে সার্থকভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে, এ-যুগের সুপরিচিত নাট্যকার মন্মথ রায়ের নাটকগুলিই তাহার প্রমাণ। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবকে তাঁহার নাটকে স্বীকরণ করিয়াছিলেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকাশভঙ্গীর বলিষ্ঠতা এবং অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের অলঙ্করণের গুণটি গ্রহণ করিয়াছিলেন।—এবং ঐ উভয় গুণের মধ্যেকার বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিয়াছিলেন। অধিকন্তু অতি-আধুনিক যুগে বাহ্য নাট্যিক ক্রিয়া অপেক্ষা যে অন্তর্দ্বন্দ্বের উপর জোর দেওয়া হইয়া থাকে—তাঁহার নাটক তাহা হইতেও বঞ্চিত নহে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে একমাত্র তাঁহার মধ্য দিয়াই আধুনিক যুগের সঙ্গে অতি-আধুনিক যুগের সংযোগ রক্ষা পাইয়াছে।'

মন্মথ রায় রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'চাঁদ সদাগর', 'দেবাসুর', 'শ্রীবৎস', 'সতী', 'কারাগার', 'খনা', 'বিদ্যুৎপর্ণা', 'রাজনটী', 'অশোক' প্রভৃতি এবং 'রাজপুরী', 'মুক্তির ডাক' ইত্যাদি একাঙ্ক বিখ্যাত। এর মধ্যে মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটকটি নানা কারণে বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সুপরিচিত। প্রথমত, এই নাটকটি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। দ্বিতীয়ত, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন এর পটভূমি। নাট্যকারের নিজের ভাষায়: 'তখন সমগ্র ভারতে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন। জেলে চলো··· ভরতি করো জেল—এই তখন জাতীয় ধ্বনি। কংসের অত্যাচারে জর্জরিত যাদবগণ ও পরিত্রাতা ভগবানের আবির্ভাব হবে কারাগারে, এই জ্বলন্ত বিশ্বাসে দলে দলে চললো সেই মহাতীর্থে—কংস কারাগারে।'

শ্রীমদ্‌ভাগবতের কাহিনী নিয়ে 'কারাগার' নাটকটি লেখা হয়েছে। দুরন্ত কংস পীড়নে যখন যাদবকুল ছটফট করছিলো সেই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংসের কারাগারে জন্ম নেন, দুষ্ট কংসকে নিধন করে পৃথিবীতে ন্যায়ের-ধর্মের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে।

এ-সবই রূপক। মন্মথ রায় তাঁর 'কারাগারে' পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বজায়

রেখেছেন।—সঙ্গে সঙ্গে পরাধীন জাতির মুক্তির আবেগও নাটকে সঞ্চারিত হয়েছে। 'ইংরেজ শাসিত গোটা ভারতবর্ষই তো কারাগার' এবং সেই ভারতের শৃঙ্খলিত সন্তান বাসুদেব, দেবকী, কঙ্কা, করুণা প্রমুখ। অন্যদিকে কংস অত্যাচারী বৃটিশ রাজশক্তির প্রতীক। সংগ্রামী জনসাধারণের নায়ক বাসুদেবের অহিংস সংগ্রাম মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি।'

আগেই বলেছি, পৌরাণিক নাটকের ছদ্মবেশ পরানো এই দেশাত্মবোধক নাটকটির তাৎপর্য অনুধাবন করতে ইংরেজ রাজকর্মচারীরা ভুল করেননি। ১৮টি অভিনয়ের পর ১৯৩১-এর ১ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৬-এর 'Dramatic Performances Act' অনুসারে নাটকটির অভিনয় নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ, ব্রিটিশ রাজপুরুষদের মতে এই নাটক 'is likely to excite feelings of disaffection towards the Government established by law in British India.' সেদিন 'কারাগার' নাটকের ওপর সাম্রাজ্যবাদী শাসকের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশের বাঙলা-ইংরাজী সংবাদপত্র তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলো। কিন্তু উদ্ধত সরকার সেইসব প্রতিবাদে কর্ণপাত করেনি। এর প্রায় আট মাস পরে ৮ অক্টোবর, ১৯৩১ 'নাট্য-নিকেতনে' নাটকটি আবার অভিনয় আরম্ভ হয়,—অবশ্যই সরকারের পক্ষে আপত্তিকর অংশগুলি বাদ দিয়ে। এ কারণেই কারাগার, বাঙলা নাট্যসাহিত্যের, রঙ্গমঞ্চের, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

৬২. 'কুসুমের মাস': কবি অজিতকুমার দত্ত [১৯০৭-১৯৭৮]-এর প্রথম কবিতার বই 'কুসুমের মাস' এর প্রকাশ তারিখ [১৯৩০]—অর্থাৎ তেইশ বছরের স্বপ্নদ্রষ্টা যুবকের রঙিন চোখে ধরা পড়া জগতের ছবি এই গ্রন্থের দুই মলাটের মধ্যে বাঁধা হয়েছে। অজিতবাবু ছিলেন ঢাকায় কবি বুদ্ধদেব বসুর সহপাঠী এবং গোড়ার দিকে দুই বন্ধু মিলে আধুনিক বাঙলা কবিতার নেতৃত্বও করেছিলেন। অজিতকুমার 'প্রগতি' পত্রিকার সম্পাদনে বন্ধুর সহযোগী ও সহকর্মী ছিলেন। পরবর্তী জীবনে গদ্যে গবেষণা-ধর্মী গ্রন্থ রচনা করলেও [উল্লেখ্য 'বাঙলা সাহিত্যে হাস্যরস' (১৯৬০)] গোড়াগুড়িই তাঁর মন কবিতালবঙ্গলতার সেবা করে এসেছে।

অজিতবাবু আধুনিক দুর্বোধ্য ভাব, উৎকট ভাষাভঙ্গীকে আশ্রয় করে বাঙলা কবিতাকে ভীতিপ্রদ করে তোলার পাণ্ডাদের বন্ধু-সঙ্গী ও সমসাময়িক হলেও তাঁদের সঙ্গে কক্ষাবর্তন করেননি। তথাচ তাঁকে আধুনিক কবিদের গোত্রভুক্ত করা হয়। আমরা জানি যে, 'প্রেম, সৌন্দর্য, নিসর্গ, রোমান্সের স্বপ্নাঞ্জন—এই সমস্ত সনাতনী কাব্য-বস্তুই তাঁর কবিপ্রত্যয়। উৎকট দার্শনিকতা, দুরূহ মানসিকতার মারপ্যাঁচ এবং দেশীবিদেশী শব্দকল্পদ্রুম তাঁর সহজাত কবিত্বকে ঢাকা দিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানকে মুখ্য করে তোলেনি। তাই যিনি আধুনিক কবিতার তত্ত্ব-তথ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের জটিল অরণ্যে দিশেহারা হয়ে পড়েন, তিনি অজিত দত্তের কবিতায় মানসিক ভোগের সনাতনী আয়োজন দেখে আশ্বস্ত হবেন।'

এমন যে রূপমুগ্ধ, সমসাময়িকতার মধ্যে থেকেও উধাও সৌন্দর্যের লোকে পাড়ি দিতে সক্ষম, ফ্যাশন-হীন, স্বচ্ছন্দ ও অনায়াস সরল কবির প্রথম কবিতার বই 'কুসুমের মাস' উল্লেখযোগ্য না হয়ে পারে না। এই গ্রন্থে মোট চল্লিশটি কবিতা স্থান পেয়েছে। এর সমস্ত কবিতাগুলিতেই "প্রেমের মৃদু সৌরভের ঘ্রাণ নেওয়া যায়। মাঝে মাঝে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের বাচন স্মরণ করায়। তাঁর মতোই অজিতবাবুও কুসুমপ্রিয়—গ্রন্থনাম এ-প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। 'বার্তা' কবিতাটিতে প্রেম-তন্ময়তার উজ্জ্বল প্রকাশ। অজিতবাবুর সবচেয়ে পরিচিত কবিতা হলো 'মালতী ঘুমায়' ও 'মালতী'। অজিতবাবুর নায়িকার নাম মালতী, যেমন বুদ্ধদেববাবুর কঙ্কাবতী আর জীবনানন্দের বনলতা সেন। মালতী রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর আধুনিক সংস্করণ, তবে উল্টোপিঠ। বিশ্ব তাহাকে কামনা করে কি না করে সে-কথা অবান্তর, বিশ্বকে সে অশান্ত চিত্তে কামনা করিতেছে—কতকটা যেন পুরাণের উর্বশীর মতো, অনেকটা যেন আধুনিক রূপোপজীবিনীর মতো। 'রূপসী মালতী আজ আপনারে করিবে প্রদান / রূপহীন পুরুষেরে ;—আজি রাত্রে তথাপি—তথাপি / ধরণীর শ্রেষ্ঠ রূপ ব্যর্থতায় নাহি হবে ম্লান ; ['মালতী']।"

অজিতবাবুর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের নাম : 'পাতাল কন্যা' [১৯৩৮], 'নষ্ট চাঁদ' [১৯৪৫], 'পুনর্নবা' [১৯৪৭]।

৬৩ 'কুহু ও কেকা' /সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : 'ছন্দের যাদুকর' অভিধায় সম্মানিত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত [১৮৮২-১৯২২] রচিত 'কুহু ও কেকা'র প্রকাশকাল ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ। সমালোচক মনে করেন যে এই কাব্যের নামকরণে রবীন্দ্রনাথের 'ওপারে মুখর হল কেকা এপারে নীরব কেন কুহু হয়' গানটির প্রভাব আছে। সমালোচক আরো মনে করেন যে, এই নামকরণে কবি "সত্যেন্দ্রনাথ একটু রূপকের ইশারা দিয়াছেন। তাহা বোঝা যায় প্রথম কবিতা 'দুই সুর' হইতে ['ফুলের ফসল' কাব্য-গ্রন্থের 'ধারা' কবিতাতেও যার একটু আভাস আছে]। কুহু রঙের, সুরের রসাবেশের রূপক। কেকা রূপের, গন্ধের, সুখ-উল্লাসের রূপক। এবং এ-রূপক দুইটি দুইদিকেই খাটে—বনে ও মনে। মনের রঙ, মনের রূপ কবি-অনুভবগম্য। কাব্যে তাহার প্রকাশ সঙ্গীতের ইঙ্গিতে, আর সে বড় কঠিন কাজ। ...শুধু কাব্যনামে নয় কুহু ও কেকার অধিকাংশ কবিতায় দেখি যে কবি রঙ ছাড়িয়া সুরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহার কাব্যচিন্তা ধ্বনির পথ বাহিয়া রূপের অভিসারে অগ্রসর। অধিকন্তু এখানে ইহাও স্পষ্ট যে রূপের বিষয়ে কবি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছেন এবং ধ্বনিই উদ্দিষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ধ্বনি ও রূপের সহযোগিতা কয়েকটি কবিতাকে অসাধারণ চিত্রসৌন্দর্য দান করিয়াছে, এবং এইখানেই সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পের চরম বিকাশ।" আরো নানা কারণে 'কুহু ও কেকা' আধুনিক বাঙলা কাব্যসভায় বৈশিষ্ট্য দাবী করতে পারে ; সূত্রাকারে সেগুলি : ১. কবির সমগ্র কাব্যরচনার ইতিহাসে নিজের কথা বিশেষ বলেন নি—কিন্তু 'কুহু ও কেকা'র 'সংকারান্তে' এবং 'ছিন্নমুকুল' কবিতা দুটি কবির আপন কথার হৃদয়োত্তাপে পাঠকের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে ;—ফলে যা আন্তরিকতার

এবং সারল্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে গণ্য। ২. 'কুহু ও কেকা'র কালে সারা বাঙলা স্বদেশ-ভাবনা, জাতীয়তা ও দেশপূজায় আত্মবলিদানের নেশায় উন্মাদ। সেই জাতীয় উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উদ্যম বেশ কয়েকটি কবিতায় ধরা আছে। বাঙলাকে ভালবেসে বাঙালীর আগামী কালের সমৃদ্ধি চিন্তায় কবি যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে কয়েকটি কবিতায়। ৩. প্রেম সত্যেন্দ্রকাব্যে দুর্লভ বস্তু। কিন্তু কুহু ও কেকার কয়েকটি কবিতায় সেই আদিম হৃদয়াবেগের হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি লক্ষ্য করা গেল। এগুলি কি সত্যেন্দ্রকাব্যধারায় ব্যতিক্রম,—হলেও পরমপ্রীতিতে পাঠক তার মনের মণিকুট্টিমে অনুরাগের সঙ্গে তুলে রাখতে চায়। ৪ এই কাব্যগ্রন্থে ছান্দসিক কবির সিদ্ধিলাভ ঘটেছে। ছন্দ নিয়ে দীর্ঘ সাধনা এখানে সম্পূর্ণতা পেয়েছে। ছন্দের পৌরোহিত্যে ভাষা ও ভাবের মধ্যে যে মিলন ঘটানো হয়েছে তাতে সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী পাঠকের সাদর আমন্ত্রণ রয়েছে এবং কেবল আমন্ত্রণই নয়, সেখানে সরস মানসভোজ্য পরিবেষিত হয়েছে।

'কুহু ও কেকা' ছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যফসলের ভাণ্ডার বেশ সমৃদ্ধ। যেমন: 'বেণু ও বীণা' [১৯০৬] 'হোমশিখা' [১৯০৭], 'ফুলের ফসল' [১৯১১], 'অভ্র-আবীর' [১৯১৬], 'তুলির লিখন' [১৯১৪], 'বেলাশেষের গান' [১৯১৭] ইত্যাদি। অনুবাদক কবি হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠার প্রমাণ রয়েছে 'তীর্থসলিল' [১৯১০], তীর্থরেণু [১৯১৪], 'মণি-মঞ্জুষা' [১৯১৫] কাব্যগ্রন্থে।

প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান জ্ঞানতাপস অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য এবং সমসাময়িক অনুজ কবিদের আদর্শ, সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে সমালোচকগণ কিন্তু উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করেন না। তেমন একজন বলেছেন: 'কবিকল্পনার যে দুইটি প্রকারভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, ইংরাজীতে যাহাদিগকে Fancy ও Imagination বলে ও যাহাদিগকে কল্পনা-বিলাস ও কল্পনা-নিষ্ঠা এই দুই বাংলা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে, তাহাদের মধ্যে Fancy বা কল্পনার লঘু লীলাই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। …সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে উচ্চতর কল্পনানিষ্ঠার [imagination] খুব বেশি সার্থক উদাহরণ পাওয়া যায় না। … বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্র, বংশীরবে উৎকর্ণ, নৃত্যপর হরিণকে দিয়া ভাবমহিমার রাজরথ টানাইলে হরিণের সঞ্চরণ-স্বাচ্ছন্দ্য ও রথের মসৃণ অগ্রগতি দুই-ই যে কতকটা ব্যাহত হইবে, ইহা স্বাভাবিক। … যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে সাময়িকতার মধ্যে চিরন্তনতাকে আবিষ্কার করা সম্ভব, সদ্যোঢালা সোডার বোতলের ফেনা-স্ফীতির মধ্যে বিলম্বলব্ধ, স্থায়ী গুণবিশিষ্ট, রুচিকর স্বাদ অনুভব করা যায়। সত্যেন্দ্রনাথের সেই গভীর-অন্তঃপ্রবেশী কল্পনা ছিল না। যেমন গজে গজে মৌক্তিক নাই, তেমনি প্রতি বিষয়ে কাব্যসম্ভাবনা আশা করা যায় না। প্রথম কামড়ে কাঁচা ফলের যে অংশ রসাল বলিয়া মনে হয়, পূর্ণ পরিপক্কতায় পরিণত মিষ্টতা সব সময় সে অংশে নিহিত নয়। সত্যেন্দ্রনাথ অনেক সময় প্রথম কামড়ের, সদ্য-উচ্ছ্বসিত কাব্য-কোলাহলের ও ভাব-তারল্যের কবি'; [ড.

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]। অন্য আর একজন বলছেন : 'সত্যেন্দ্রনাথ বিচিত্র বিষয়ের কবিতা লিখেছেন। ...কিন্তু নিরুত্তাপ বক্তৃতারীতি এবং তথ্যপ্রীতির অতিরেক রচনাগুলিকে প্রায়ই প্রাণস্পর্শী করে তুলতে পারেনি। ... সাধারণভাবে সত্যেন্দ্রনাথে সূক্ষ্ম কল্পনার দৈন্য লক্ষিত হবে। ...তিনি খেয়াল-খুশিতে নানা হালকা রঙ, আর মিঠে সুর মিশিয়ে এক বিচিত্র রামধনু আঁকা আকাশ গড়ে তুলেছেন যেন। এই অপূর্ব দায়িত্বহীনতার স্বাদ সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার একটি প্রধান অবদান' [ড. ক্ষেত্র গুপ্ত]।

৬৪ **ছেঁড়া তার :** পঞ্চাশের [১৩৫০ বঙ্গাব্দ / ১৯৪৩] মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত 'ছেঁড়া তার' [১৯৫৩]-এর লেখক হলেন নট ও নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী। [১৮৯৭-১৯৫৯] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষ সম্পূর্ণভাবেই মানবসৃষ্ট। এর অভিঘাত বাঙালীর সমাজ-জীবনে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আমূল ভাঙন ধরিয়ে দিয়েছিলো। তাই স্বাভাবিকভাবেই বাঙলার সচেতন এবং দেশের কাছে দায়বদ্ধ বাঙালী সাহিত্যিকগণ জীবনমুখী ও সমাজ-সচেতন নাটক গল্প-উপন্যাস রচনার মাধ্যমে জনজাগরণের কর্তব্যে আত্মনিয়োগ করলেন। তারই ফল হলো 'ছেঁড়া তার' নাটক। উত্তরবঙ্গের এক দরিদ্র কৃষক রহিমদ্দি আকালের সঙ্গে লড়াই করতে না পেরে কিভাবে তার স্ত্রী ফুলজানকে তালাক দেয়, কিভাবেই বা মুসলমানের শরিয়তির বাধায় রহিমদ্দি সেই তালাক কাটিয়ে উঠতে না পেরে, ছেলে-বউ-এর বিয়োগব্যথা অসহ্য হওয়ায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে—তারই করুণ কাহিনী এখানে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মশলাও যথেষ্ট পরিমাণে মিশেল দেওয়া আছে। নাটকের নায়ক রহিমদ্দি প্রথমে দোতারা, পরে দিলরুবা বাজিয়ে গান করতো। সামাজিক শোষণ, শরিয়তি শাসনে তার সুখের-সম্পদ-পরিপূর্ণ জীবন রূপ দিলরুবার তার একটি একটি করে ছিঁড়ে গেল—সেই ঘটনাটিই দিলরুবার তার ছিঁড়ে যাওয়ার রূপকে বর্ণিত হয়েছে—এদিক থেকে নাটকটির নামকরণ সার্থক।

এই নাটকের মধ্যে উত্তরবাঙলার মুসলমান কৃষক-জীবনের সঙ্গে নাট্যকারের যে পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, তা বিস্ময়কর। আধুনিক বাঙলার আঞ্চলিক জীবন নিয়ে কথাসাহিত্যে যে কয়খানি উচ্চাঙ্গের রচনা প্রকাশিত হয়েছে, এ-নিঃসন্দেহে তাদেরই সমধর্মী। রঙ্গমঞ্চ ছাড়া পাঠ্য হিসাবে নাটকের আবেদন এখনও এদেশে সৃষ্টি হয়নি, তাই উপন্যাসের মতো এটি তেমন প্রচার লাভ করে নি। 'এই নাটকের আর একটি প্রধান গুণ এতে তুলসী লাহিড়ীর অন্যান্য নাটকের মত জনকল্যাণমূলক সাধারণ বক্তৃতা শুনতে পাওয়া যায় না। নিরবচ্ছিন্ন কাহিনীর ভেতর দিয়ে এর প্রবাহ যেমন রক্ষা পেয়েছে, তেমনই মানবিক কৌতূহল মুহূর্তের জন্যও শিথিল হয়ে পড়ে নি।—এই সমস্ত দিকের বিচারে বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে একে একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে গ্রহণ করা যায়।'

সেদিনের বামপন্থী মনোভাবাপন্ন 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠী কোলকাতার অভিজাত রঙ্গমঞ্চে এই 'ছেঁড়া তারে'র অভিনয় করে নাটকটির প্রচারে সাহায্য করেছিলো।

তুলসী লাহিড়ী বামপন্থী মতাদর্শের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—এবং বামপন্থী মতাদর্শ ও বাম রাজনীতির সেদিন অন্যতম লক্ষ্য ছিলো গান বাজনা নাটক লেখা ও অভিনয়-এর মাধ্যমে প্রতিক্রিয়ার দুর্গকে আঘাত করা। সেই লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে 'ছেঁড়া তার' রচিত ও অভিনীত হলেও শেষপর্যন্ত দু-পক্ষেরই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। এ সম্পর্কে সমালোচক যথার্থভাবে মন্তব্য করেছেন : "নাটকে মূল রাজনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব যদি তীব্র হতো তবে শেষের দিকে রহিম ফুলজানের সম্পর্কের প্রশ্নটা অত বড হয়ে উঠতো না। শেষে ঐ প্রশ্ন এত বড হয়ে উঠেছে যে রহিমকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিতে হয়েছে। 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠীর অভিনয়ের জন্য নাট্যকার রহিমের আত্মহত্যার বিকল্প হিসেবে ফুলজানের মৃত্যু দিয়ে নাটক শেষ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন : 'কখনো স্থির হয় এ নাটকের পরিণতিতে রহিমের মৃত্যুই স্বাভাবিক। আবার কখনো মনে হয় ফুলজানের মৃত্যুই অনিবার্য। শেষ পর্যন্ত তুলসীবাবু শেষ অংশটা দু-রকম করে লিখে শেষ রক্ষা করলেন। আমরা কখনো রহিমের মৃত্যুতে নাটক শেষ করেছি কখনো বা ফুলজানের মৃত্যুতে।' [১৩৭২ সংস্করণের ভূমিকা]

'নাটকের পরিণতিতে হয় ফুলজানের মৃত্যু না হয় রহিমের মৃত্যু—এ ছাড়া প্রগতিশীল নাট্যকার বা নাট্যগোষ্ঠী ভাবতে পারেনি। এদের যে কোনও একজনের মৃত্যু যে হাকিমদ্দি-শ্রেণীর জয় ঘোষণা করে অর্থাৎ তাদেরই জয় ঘোষিত হয় যাদের ষড়যন্ত্রে নিরন্ন মানুষ ধর্মীয় সংস্কারের বলি হয়। এই সংস্কারটাই বড় হয়ে ওঠায় নাটকের শেষে একজনের মৃত্যু ঘটাতেই হয়েছে। এই সহজ সমাধানে নাটক তৈরি হলে যে নাটক রচনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, তা সেদিনের বামপন্থী নাট্যকার বা নাট্যগোষ্ঠী কেউই অনুধাবন করতে পারেনি।'

৬১. 'জমিদার দর্পণ' : [প্রথমে বর্তমান গ্রন্থের ১৪৯-১৫১ পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় অংশ যোগ করে নেওয়া যেতে পারে]।

১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'জমিদার দর্পণ' নাটক মীর মশারফ হোসেনের [১৮৪৭-১৯১২] অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। অধিকন্তু মীর সাহেব ইংরাজ-অধিকার-পরবর্তী কালের প্রথম এবং প্রধান মুসলিম সাহিত্যব্যক্তিত্ব ;—এমন সাহিত্যিকের 'জমিদার দর্পণ' নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলির ফর্দ এইরকম :

ক ১৮৭২-৭৩ খ্রীস্টাব্দে পাবনা জেলায় [সিরাজগঞ্জ মহকুমায়] যে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয় তার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই নাটকটি লেখা হয়েছিলো।

খ. নাট্যকার যে জমিদারের ছবি এঁকেছেন সেই জমিদার অত্যাচারী ও সমস্ত রকম দোষের অধিকারী হলেও এ কিন্তু তখনকার বাঙলার অত্যাচারী জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি। অন্যদিকে অত্যাচারিত কৃষক আবু মোল্লাও তার শ্রেণীর সমস্যা ও যন্ত্রণার প্রতিনিধিত্ব পায়নি। এমনকি মীর যখন নাটক লিখছেন—সেই

সময় ঘটে যাওয়া পাবনার কৃষকবিদ্রোহ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। জমিদারের শোষণের নগ্নরূপও নাটকটিতে ফুটে ওঠেনি। দেশের বেশির ভাগ মানুষ কৃষক, তাদের প্রতি নাট্যকারের দরদ আছে, তাদের অত্যাচারিত হওয়ার ঘটনাও নাটকে চিত্রিত, কিন্তু কৃষকেরা যে প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা পাচ্ছে তারও প্রকৃতরূপ এই নাটকে জায়গা পায় নি।

গ. নাট্যকার নিজে জমিদার বংশের সন্তান হওয়ায় জমিদারদের অত্যাচারের কাহিনী-বর্ণন অন্তরর মাত্রা পেয়েছে। এ-বিষয়ে তিনি 'পাঠকগণ সমীপে নিবেদন' করেছেন এই ভাষায়: "নিরপেক্ষ ভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভালমন্দ বিচার করা যায়, পরের মুখে তত ভাল হয় না। জমীদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয়-স্বজন সকলেই জমীদার, সুতরাং জমীদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না। আপন মুখ আপনি দেখিলেই হইতে পারে। সেই বিবেচনায় 'জমিদার দর্পণ' সম্মুখে ধারণ করিতেছি ..."

ঘ আপন শ্রেণী-জাতি-দেশীয়গণের কুচরিত্র ও কদাচারের ছবি এঁকে মীর সত্য-ভাষণের যে নমুনা রেখেছেন তা হাজার বছরের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিতীয়রহিত।

ঙ সংস্কৃত নাট্যরীতিকে বিদায় দিয়ে দীনবন্ধু পাশ্চাত্য নাট্যাঙ্গিক অনুসরণে যতখানি এগিয়েছিলেন, মীর তার থেকে পিছিয়ে এসে তাঁর নাটকে প্রস্তাবনা-নট নটী-সূত্রধার-এর ব্যবহার করেছেন।

চ মীর ছিলেন অত্যন্ত উদারচেতা এবং অসাম্প্রদায়িক। তাঁর সবসময় লক্ষ্য ছিলো যাতে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিতে কোন আঘাত না লাগে। তাই এখানে মুসলমান জমিদার কর্তৃক মুসলমান প্রজাকে উৎপীড়নের চিত্র আঁকা হয়েছে।

ছ. এই নাটকে কোন Melodramatic ঘটনার উল্লেখ নেই। সুষ্ঠু নাট্য-পরিণতি সহ যথাসম্ভব করুণ-রস পরিবেষণের মধ্যে দিয়ে নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

জ দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে' পয়ারের ব্যবহার থাকলেও গান নেই, কিন্তু 'জমিদার দর্পণে' গানের ব্যবহার আছে।

ঝ অতি সাধু বা অতি কথ্য-এই রকম দ্বিকোটিক ভাষা একাধারে ব্যবহার মীরের নাটকে দেখা যায় না। তাঁর ভাষা জীবন্ত, প্রত্যক্ষ এবং গ্রাম্যমানুষের চরিত্রের উপযোগী।

ঞ "আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের ক্ষেত্রমণির কাহিনী অবলম্বন করিয়াই 'জমিদার-দর্পণ' নাটক রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে পার্থক্যও নিতান্ত অল্প নয়। নাট্যরচনার আঙ্গিকের দিক দিয়া 'জমিদার দর্পণে'র নাট্যকার দীনবন্ধুকে অনুসরণ করেন নাই। দীনবন্ধুর সহিত সংস্কৃত নাটক

কিংবা দেশীয় গীতাভিনয়ের ধারার কোনও সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু মীর মশার্‌রফ হোসেন দেশীয় ঐতিহ্যের ধারার সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়াই তাঁহার নাটক রচনা করিয়াছিলেন।"

ট. "দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'-এর মতো এই নাটকের উপসংহারে মৃত্যুর ঘনঘটাও সৃষ্টি হয় নাই, একক মৃত্যুকেই যথাসম্ভব করুণ করিয়া তুলিয়া তিনি নাটকের ট্রাজিক রস সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। অল্প পরিসরের মধ্যে এবং গভীরতর জীবন-দৃষ্টির অভাবে তাহা যে সম্ভব হইয়া উঠিতে পারে নাই তাহাও সত্য।"

৬৬. **'দাশুরায়ের পাঁচালী'**ঃ 'পাচালী', না 'পাঁচালী'; পাঁচালী কি, এর জন্ম কবে এ-নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে ঘোর তর্ক আছে। কি দরকার সেই পথহীন ঘোর তর্কারণ্যের মধ্যে প্রবেশের। দু-একটা ডালপালা ছেঁটে এক চিলতে যে আলো পাওয়া যায় তার থেকে 'মনে হচ্ছে, পাঁচালীগান মধ্য ও আধুনিক যুগে ঠিক একরীতি গ্রহণ করে নি। মধ্যযুগে পাঁচালী প্রবন্ধ, পাঁচালী ছন্দ প্রভৃতির উল্লেখ থেকে মনে হচ্ছে, আখ্যানকেন্দ্রিক পৌরাণিক কাব্য বা ছদ্মপৌরাণিক কাব্যসমূহ যে বিশিষ্ট রীতিতে গঠিত ও গীত হত তাকে বলত পাঁচালী।...মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে, মধ্যযুগে বাংলা কাব্যের তিনটি রীতি ছিল—আখ্যানরীতি, গীতরীতি ও পাঠরীতি। মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ-সাহিত্য আখ্যানরীতির অন্তর্গত, একেই বলা হত **পাঁচালী**। পদাবলী হচ্ছে **গীতরীতির** কবিতা। আর বৈষ্ণব জীবনকাব্য বা তথ্যগ্রন্থগুলি [এদের সংখ্যা খুবই কম] হচ্ছে **পাঠরীতির** অন্তর্গত। মধ্যযুগে শুধু পাঠের জন্য খুব অল্প গ্রন্থই রচিত হয়েছিল।'

এমন যে পাঁচালী সাহিত্য তার অন্যতম প্রধান [নায়ক] হলেন দাশরথি রায় [১৮০৬-১৮৫৭] বা দাশু রায়। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার বাঁধমুড়া গ্রামে ১৮০৬-এর মাঘ মাসে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে দাশুর জন্ম হয়। বাবার নাম দেবীপ্রসাদ এবং মাতা শ্রীমতী দেবী। চার ভায়ের মধ্যে দাশু ছিলেন মেজো। তাঁর বিদ্যালয়গত বিদ্যা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও তিনি যে যথেষ্ট পরিমাণে সংস্কৃত শাস্ত্র, কিছু ইংরাজী শিখেছিলেন তার পরিচয় তাঁর পাঁচালী গান থেকে সহজেই পাওয়া যায়। বাল্যকাল থেকেই গানবাজনায় অফুরন্ত আগ্রহ এবং ছড়া তৈরির সহজাত প্রতিভার গুণে তিনি যৌবনারম্ভেই তাঁর মামার বাড়ী পীলাগ্রামে নীলকণ্ঠ হালদার নামে এক নিম্নরুচির পালাগায়কের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে উঠলেন। কিছুদিন পরে দাশু রায় ঐ পীলাগ্রামে অবস্থিত রেশম কুটীর কাটুনী, স্বামীপরিত্যক্তা নিম্ন শ্রেণীর এক শ্যামাসুন্দরী, যাঁর নাম অক্ষয়া বাইতিনী বা আকাবাঈ বা আকাবাঈ সংস্পর্শে আসেন। এবং ক্রমে অকার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়ে যান। অকা একটি কবির দল করলে দাশু রায় প্রথমে গায়েন ও পরে বাঁধনদারের কাজ করতে থাকেন। সমাজ-সংসারের, লাজ-লজ্জার, ভদ্র রুচি ও উচ্চ জন্মসংস্কারের মুখে ছাই দিয়ে দাশু অকার প্রেমে তন্ময় হয়ে রইলেন এবং অকার কবিগানের দলে সানন্দে অবতীর্ণ হয়ে স্বরচিত অশ্লীল পয়ার-ত্রিপদীর সাহায্যে অতি-সাধারণ গ্রাম্য কৃষক ও নিম্নশ্রেণীর লোকেদের কাছ থেকে খুব

বাহবা পেতে লাগলেন। কিন্তু বেশিদিন এমন গেল না—দু-চারজন নিম্নকুলোদ্ভব কবিওয়ালা আসরে তাঁর পিতা-মাতা উদ্ধার করে এবং তাঁর জন্মপরিচয় ধরে গান গাওয়ায় তিনি কবির গাওনা ও আকার সংস্রব ত্যাগ করেন। তাঁর জীবনধারার পরিবর্তন ঘটলো। তিনি ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে পাঁচালীর দল খোলেন। দাশু রায় ক্রমে সারস্বত স্বীকৃতি, শ্রদ্ধা প্রীতি ও প্রচুর অর্থ অর্জন করলেন। শেষে নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অর্থ-প্রতিপত্তি-যশ পেছনে রেখে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রয়াত হন।

বিভিন্ন সংস্করণে এবং আধুনিককাল পর্যন্ত অনেকজন সম্পাদকের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে দাশু রায়ের পাঁচালীর প্রকাশ তাঁর জনপ্রিয়তা এবং কাব্যবৈভবের প্রমাণ দেয়। 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী'র সংস্করণগুলি এইরকম :

ক আনুমানিক ১৮৪৬-১৮৫৩-র মধ্যে দাশরথি কর্তৃক নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নিজের গ্রাম্য মুদ্রাযন্ত্র থেকে প্রকাশিত **পাঁচখণ্ড** পাঁচালী সংকলন।

খ. অরুণোদয় রায় কর্তৃক ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গবাসী মুদ্রাযন্ত্র থেকে মুদ্রিত তিন খণ্ডে দাশরথি রায়ের পাঁচালী। 'অনুমান, দাশরথি গ্রাম্য মুদ্রাযন্ত্র থেকে পাঁচ খণ্ডে পাঁচালীর যে প্রথম মুদ্রণ প্রকাশ করেছিলেন, বঙ্গবাসী প্রকাশিত তিন খণ্ড তারই পুনর্মুদ্রণ।' এখানে দাশরথির মোট ১৪টি পালা গ্রহণ করা হয়েছে।

গ জনৈক রাজকিশোর দে দাশরথির বিধবা পত্নীর কাছ থেকে পাঁচালীর স্বত্ব কিনে নিয়ে ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে পাঁচ খণ্ড পাঁচালী একত্রে প্রকাশ করেন। ঐ স্বত্ব আর এক রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কিনে নিয়ে ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে পকেট সাইজে সম্পূর্ণটা একসঙ্গে ৬৩০ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রকাশ করেন। ১৩৬১ ও ১৮৭১ অব্দে বোধ হয় চার খণ্ডে শীল ব্রাদার্স দাশরথি রায়ের পাঁচালী প্রকাশ করেছিলো।

ঘ ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 'রস ভাণ্ডার' নামে বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে গীতিগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, তাতে দাশুর চৌদ্দটি পালা ধৃত ছিলো।

ঙ দাশরথির সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক সংস্করণ হচ্ছে 'বঙ্গভাষার লেখক'-এর সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত ও কয়েকখণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থ। এই সংকলনে মোট ৬২টি পালা সংগৃহীত হয়েছে। হরিমোহনের চেষ্টায় দাশরথির রচনা সম্পূর্ণ অবলুপ্তির হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে ঠিকই—তবুও আধুনিক সংকলন রীতি অনুযায়ী এতে সম্পাদকের হস্তাবলেপ ঘটায় দাশরথির নিজস্বতা খুঁজে বার করা কঠিন হয়েছে।

চ দাশরথির পাঁচালীর সর্বাধুনিক সংস্করণ হলো ড. হরিপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'দাশরথি রায় ও তাঁহার পাঁচালী'। দাশরথির জীবৎকালে প্রকাশিত পাঁচ এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত পাঁচ মোট দশ খণ্ডের পালাগুলির সংখ্যা হলো ৬৪। উক্ত পালাগুলি বিন্যস্ত হয়েছে এইভাবে : কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, হর-পার্বতীলীলা, চণ্ডীলীলা, বিভিন্ন পৌরাণিক লীলা [মহাভারত],

মঙ্গলকাব্যের পালা, আধুনিক পালা, সংগীত সংগ্রহ। বাঙলা দেশে—সমাজে মানসিকতায় যখন নব-জাগরণের ঢেউ উত্তাল তখনও দাশু রায় মধ্যযুগের বিষয় ও বিশ্বাসকে ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেননি। তবে সমসাময়িক ঘটনাকে আশ্রয় করে কয়েকটি গানও যে তিনি রচনা করেননি এমন নয়।

৬৭. **'দুর্গেশনন্দিনী'** : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [১৮৩৮-৯৪] লিখিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ, মৌলিক উপন্যাস—এবং বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যেও বটে। এই কারণে 'দুর্গেশনন্দিনী' [১৮৬৫] আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট হয়ে আছে।

অনেকে মনে করেন যে এই উপন্যাসে ইংরাজ ঔপন্যাসিক Willam Scott-এর অনুসরণ আছে। যদি কিছু থেকেও থাকে, তবুও এটি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম সার্থক উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত। সেদিনের ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী বুদ্ধিজীবী বঙ্কিমচন্দ্রের এই গ্রন্থটিকে সাদরে গ্রহণ করে নিতে দ্বিধা করেননি—প্রাথমিক প্রয়াসের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও।

পাশাপাশি অবস্থিত বাঙলা ও উড়িষ্যার ষোড়শ শতকের ইতিহাস সেদিন প্রায় একই রাজনৈতিক আলোড়নে আন্দোলিত হতো। মুঘল-পাঠানের রাজনৈতিক ক্ষমতা-লিপ্সার পটভূমিকায় বিন্যস্ত আলোচ্য উপন্যাসটিতে শাশ্বত মানবপ্রেমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজস্ব কবিকল্পনাবলে, উপন্যাসটিতে এক বাঙালী রাজ-দুহিতার সঙ্গে মুঘল বাদশার সেনাপতি মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের ভাগ্য একই সূত্রে গেঁথে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই গ্রন্থনার পেছনে কোন ইতিহাসনিষ্ঠা বা যুগসচেতনতার পরিচয় নেই। উপন্যাসের নায়ক একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও, তাতে যে ঐতিহাসিক চিত্র আছে, তা কল্পনার অতিরেকে কোন কোন অংশে রূপ-কথার ডানায় ভর করেছে। সেইজন্য একে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। এ-ঐতিহাসিক রোমান্সের কোটায় পড়ে। 'দুর্গেশনন্দিনীতে' কাহিনী যে ভাবে দ্রুত অগ্রসর হয়ে গেছে, তা বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিনব এক অভিজ্ঞতা। আমরা দীর্ঘদিন ধরে মধ্যযুগের ধর্মনির্ভর মঙ্গলকাব্য পাঁচালীর যে বৈচিত্র্যহীন গল্প শুনে আসছিলাম, 'দুর্গেশ-নন্দিনী'র নায়কের ঘোড়ার খুরের আঘাতে তার সংস্কার এক নিমিষে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। কাহিনীর tempoর অভিনব অনুভূতি আমাদের চিত্তে যে উল্লাসের বিস্ফার ঘটালো তা এর আগে আর কখনও বাঙলা সাহিত্যে প্রকাশ পায়নি।

এ সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাসে প্রাথমিকের কিছু দ্বিধার কথাও উল্লেখ করতে হয়। আমরা জানি যে সে যুগে ইংরাজী শিক্ষা জাতির জীবনে প্রবেশ করতে শুরু করলেও আপামর জনসাধারণের সমাজ সম্পর্কে অন্ধ গোঁড়ামি তখনও দূর হয়নি। বাস্তব জীবনে নানা আঘাত-সংঘাত আসা সত্ত্বেও নির্বিচারে য়ুরোপীয় মানবিকতাকে সকলে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছিলো না। তাই সংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীর মনে কোনরকম আঘাত না দিয়ে প্রাচীন ইতিহাস অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই প্রথম

উপন্যাসের কাহিনী গ্রন্থনার পরিকল্পনা করেন। অতীত ইতিহাসের পটভূমিতে সে যুগের মানুষের জীবনের সমস্যার ওপর আলোকপাত করে প্রকারান্তরে মানুষের চিরন্তন সমস্যার ওপরে আলো ফেলার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এই কৌশলটি অবলম্বন করেছিলেন। এ-থেকেই প্রথম যুগের উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রয়ের কারণ বোঝা যায়।

এর পাশাপাশি এটাও উল্লেখ্য যে: "পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাববস্তু ও তথ্য ছাড়াইয়া এক বিশিষ্ট অন্তর্ভেদী ভাবকল্পনা, মানবপ্রকৃতি বিচারের এক নতুন অনুভূতি ও সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গীর রূপ পরিগ্রহ করিল। ইতিহাসবোধ জাগ্রত হইয়া অতীত যুগের বিস্ময় রসাশ্রিত কাহিনী ও আবেগময় জীবনযাত্রার অস্পষ্ট স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত ও তৎকালীন নরনারীকে জীবন্তবৎ আমাদের নিকটে উপস্থাপিত করিল। সমকালীন জীবনযাত্রার মধ্যেও এক অভিনব ভাব সংঘাত, আনন্দ-বেদনাময় অন্তর্দ্বন্দ্ব আবিষ্কৃত হইয়া উহাকে অসাধারণ তাৎপর্য ও গৌরবে মণ্ডিত করিল। বাঙালী জীবনের স্থির জলাশয়ে যেন এক অদৃষ্টপূর্ব ভাবোচ্ছ্বাস, জোয়ার-ভাঁটার তরঙ্গলীলা খেলিয়া গেল। নূতন পুরাতনের সন্ধিক্ষণে অবস্থিত, জীবন-সমুদ্রমন্থনে অজ্ঞাত বিষামৃতের আস্বাদে বিহ্বল, নিজের অপ্রত্যাশিত পরিচয় উদ্ঘাটনে বিস্মিত বাঙালী সমাজের চিত্রকর-রূপেই বাঙলার প্রথম ঔপন্যাসিক তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসখানি উপহার হিসাবে হাতে লইয়া আবির্ভূত হইলেন।"

৬৮. 'বৃত্রসংহার': মধুসূদনের ভাববন্যায় স্নাত হয়ে যিনি বাঙলা কাব্যক্ষেত্রে অবির্ভূত হন এবং মধুসূদনের পর দ্বিতীয় মহাকবিরূপে বাঙলা সাহিত্যের সভায় আসন লাভ করেন তাঁর নাম হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮২৮-১৯০৩]। ইনি হিন্দু কলেজের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই উদীয়মান কবিগোষ্ঠীর অন্যতম হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন, ফলে তাঁর ওপর মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সটীক সংস্করণ সম্পাদনা করার ভার পড়ে। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁর মনে মহাকাব্য রচনার বাসনা জাগে। তারই ফল হলো পঁচিশ সর্গে সম্পন্ন 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্য [১ ভাগ ১৮৭৫ ; ২য় ভাগ ১৮৭৭]।

বাঙলা সাহিত্যে হেমচন্দ্র 'বৃত্রসংহারে'র কবি হিসাবে পরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাব্য সম্পর্কে বলেছেন: এই মহাকাব্যের বিষয় ইন্দ্রকৃত বৃত্রের বধ। হেমবাবু পৌরাণিক বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করেন নাই—অনেক স্থানেই নিজ কল্পনাকে স্ফুরিত করিয়াছেন। পাতালে বৃত্রজিত নির্বাসিত দেবগণ মন্ত্রণায় নিযুক্ত। এই স্থানে গ্রন্থারম্ভ।' তাঁর কবিত্বশক্তির অপ্রতুলতাকে তিনি হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি অত্যাসক্তি দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছেন। এর অন্য একটা কারণ আছে। তা এই যে, মধুসূদন রাম-লক্ষ্মণ প্রমুখ শ্রদ্ধেয় চরিত্রকে হীনভাবে এঁকে দেশের সিদ্ধ-শ্রদ্ধাকে আঘাত করেছিলেন বলে মনে করা হয়। তাই হেমচন্দ্র আমাদের পুরাণের শ্রদ্ধেয় চরিত্রগুলির ওপর এত অধিক পরিমাণে ভক্তির রঙ চড়িয়েছিলেন। হেমচন্দ্র শিক্ষিত, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যরসে অভিসিঞ্চিত—তবুও স্বর্গ উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান এবং

অধর্মের ফলে বৃত্রের পতন—ইত্যাদি যথার্থ মহাকাব্যের বিষয় নিয়ে 'বৃত্রসংহার' কাব্য রচনা করা সত্ত্বেও এ-মহাকাব্য হয়ে উঠতে পারেনি।

চরিত্র বিন্যাস, ঘটনা পরিকল্পনা কয়েকস্থান ছাড়া, এককথায় মহাকাব্যে মহা-সমুদ্রের মহাকল্লোল কোন গাম্ভীর্যধ্বনি সৃষ্টি করতে পারেনি। তাই 'বৃত্রসংহার' অমিল পয়ার ছন্দে লেখা দীর্ঘ আখ্যানকাব্যের স্তর থেকে উঠে আসতে পারেনি। হেমচন্দ্রের ছন্দ সম্পর্কেও বলতে হয়: "ইহা সুদীর্ঘ রচনা, ইহার ছন্দ প্রধানত অমিত্রাক্ষর। কিন্তু মধুসূদনের মত আনুপূর্বিক অমিত্রাক্ষর নহে। অমিত্রাক্ষর সম্পর্কে মধুসূদনের যেমন বিশ্বাস ছিল, হেমচন্দ্রের তেমন ছিল না; সেইজন্য তিনি কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দ পাঠ করিলে বিতৃষ্ণা জন্মিবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া পয়ারাদি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ প্রস্তাব করিয়াছি।' মধুসূদনের অমি-ত্রাক্ষর বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে নাই, তাহাও তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; সেইজন্য তিনি কেবলমাত্র বাহির হইতেই তাহার অনুসরণ করিতে গিয়া নিজে যে ছন্দ রচনা করিয়াছেন, তাহা অমিত্রাক্ষর হয় নাই, অমিত্র পয়ার হইয়াছে মাত্র।' সামগ্রিকভাবে বৃত্রসংহার সম্পর্কে সুধী সমালোচকের মন্তব্য এইরকম: 'ঘটনা এবং বিন্যাসে বৃত্রসংহারে মহাকাব্যের লক্ষণ আছে। জগৎবাসীর কল্যাণে দধীচির আত্মত্যাগ, স্বর্গের অধিকার নিয়ে দেব-দানবের সংগ্রাম, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, সূর্যলোক-চন্দ্রলোক, কুমেরু-সুমেরু প্রভৃতির বর্ণনা, ঘটনার প্রাচুর্য, বীর ও রৌদ্র রসের ছড়াছড়ি—মহাকাব্যের উপযোগী বিপুলতা ও গাম্ভীর্যের সমস্ত উপকরণই এখানে সংগৃহীত হয়েছিল। তিলোত্তমাসম্ভব এবং মেঘনাদবধ কাব্য থেকে যেমন অনেক কিছুই হেমচন্দ্র সরাসরি গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতি অটল আনুগত্যও তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের মধ্যে সেই শক্তি ছিল না যাতে এই সব উপকরণ আত্মসাৎ করে মহাকাব্যের আস্বাদ সৃষ্টি করতে পারেন। প্রাণহীন বিবৃতি, অকারণ রৌদ্ররস এবং অগভীর কারুণ্যে কাব্যটি পরিপূর্ণ। সত্যকার ক্লাসিক প্রেরণার লেশ-মাত্র ছিল না হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারে তাই কৃত্রিম ক্লাসিকতার অনুসরণ চলেছে। স্বাদেশিকতার প্রচারের দিক থেকেও লেখকের দ্বিধা সর্বত্র প্রকট। মধুসূদনের অনুকরণে তিনি দানবের প্রতি সমর্থন জাগাতে চেয়েছেন, কিন্তু হিন্দুর স্বাভাবিক প্রবণতাবশে দেবতাদের প্রতিই তাঁর সমর্থন। রাজ্যহারা দেবতারা এবং আক্রান্ত দেশরক্ষায় তৎপর দানবেরা তাঁর জাতীয়তাবাদী সহানুভূতিকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। তাই রচনা হিসাবে বৃত্রসংহারের কোন মূল্য নেই।' [ড. ক্ষেত্র গুপ্ত]

৬৯. 'পদ্মিনী উপাখ্যান': এই আখ্যানকাব্যটির লেখক আখ্যানকাব্য-ধারার সার্থক এবং শ্রেষ্ঠ কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮২৭-১৮৮৭]-এর রচনা। রঙ্গলাল বাঙলা সাহিত্য এবং কাব্যকে ভালবেসেই যেন বাঙলা কাব্য-চর্চায় অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর এই ভালবাসার সবচেয়ে সার্থক প্রমাণ হলো কলকাতার বীটন সোসাইটিতে পঠিত 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' [১৮৫২]। ঈশ্বরগুপ্ত-ভারতচন্দ্রের 'কদর্যরুচি,

গ্রাম্য-ভাব ও অমার্জিত ভাষা হইতে বাঙলা কবিতাকে মুক্ত করিয়া শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধার বস্তু করিয়া' তোলবার জন্ম 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' [১৮৫৮] ও অপরাপর আখ্যান-কাব্যগ্রন্থগুলির জন্ম। এদের মধ্যে দিয়েই রঙ্গলাল ইতিহাস, পরিচিত জনশ্রুতি-স্পৃষ্ট প্রণয়রস পরিবেষণ করেছেন।

অনেকে রঙ্গলালকে মহাকাব্য-ধারার কবি বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু আমরা মনে করি যে, এই ধারণা ঠিক নয়। কারণ রচনার মধ্যে দিয়ে রঙ্গলাল কোথাও আখ্যায়িকা কাব্য বা narrative poetry-র সীমা অতিক্রম করে যেতে পারেননি। 'পদ্মিনী-উপাখ্যান'-এর মধ্যে দিয়ে স্বদেশ-প্রীতির উদ্দীপনাময় আবেগ, মননপ্রধান গাঢ়-বদ্ধতা, মধ্যযুগের দেবপ্রশস্তিমূলক কাব্যের গণ্ডী থেকে আধুনিক যুগের বিস্তৃততর কাব্য-পরিধির দিকে এগিয়ে গেলেও রঙ্গলাল 'আধুনিক আদর্শে বাঙলা কবিতাকে নতুন করে সৃষ্টি করতে পারেন নি।' তবে ধরণীর ধন কিছুই যায় না ফেলা—তাই অনেকের মতে রঙ্গলালের এই প্রচেষ্টা পরবর্তী কবি মধুসূদনকে তাঁর মৌলিক পথ আবিষ্কারের দিকে অনেকখানি এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলো।

রঙ্গলালের 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' টডের রাজস্থান—**Annals and Antiquities of Rajasthan**—থেকে উপাদান সংগ্রহ করে লেখা। এই গ্রন্থের অন্তর্গত রাণা ভীম সিংহের কণ্ঠে প্রযুক্ত 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, / কে বাঁচিতে চায়। / দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, / কে পরিবে পায়॥'—চরণগুলি একদা স্বাধীনতা-কামী বাঙালীর বীজমন্ত্র ছিলো। এই ধরনের স্বদেশ-ভাবনা উদ্বোধক পংক্তি প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে আর কোথাও এর আগে পাওয়া যায়নি। এ-দিক থেকে গ্রন্থটি কিছু বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে।

"এদেশে রঙ্গলালের কবি কর্মেই সর্বপ্রথম দেশি ও বিদেশি ভাবধারার যুক্তবেণী বদ্ধ হয়েছে। তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-কে দেশি-বিদেশি ভাবধারায় রচিত প্রথম বাঙলা কাব্য বলা যেতে পারে। এদেশে পাশ্চাত্য সাহিত্যানুশীলনের সুযোগ মেলাতে বাঙলা কবিতাতেও তিনি কিছুটা অভিনবতা সঞ্চার করতে পেরেছেন। তবে উচ্চতর কবিপ্রতিভার অধিকারী না-হওয়ায় পরবর্তী বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যে লক্ষণীয় কোন স্থায়ী প্রভাব মুদ্রিত করতে পারেন নি। ···তবুও, বলতে হয় যে, কাব্যরচনের ক্ষেত্রে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুটা স্বাতন্ত্র্য দেখাতে পেরেছিলেন। স্বর্গের দেবদেবীর মহিমাকীর্তনে আগ্রহ পোষণ না করে তিনি মানুষের কথা বলবার জন্ম প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের পাতায় তথ্য ও জীবন অনুসন্ধান করলেন। কেন তাঁর এই বিচিত্র বা বিশিষ্ট দিকে পদক্ষেপ। তার কারণে তিনি বলেছেন যে, প্রথমত, অপ্রাকৃত বা অলৌকিক বা অপ্রাকৃত কথাবস্তুতে ইংরেজি কাব্যের সঙ্গে পরিচিত পাঠক সম্প্রদায়ের রুচি নেই,—বাঙলা কাব্যের প্রতি তাঁদের এই বিরূপ মনোভাব দূর করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বাঙালীর জাতীয়তাবোধের মুখে ভাষা দেওয়া, জাতিকে দেশপ্রেমের প্রেরণায় প্রাণিত করা। তাই 'পদ্মিনী-উপখ্যানে'র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন : 'বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্মিকত্ব প্রভৃতি

নানা সদ্গুণালংকারে রাজপুত্রেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, বিদুষীত্ব এবং সাহসিকত্ব-গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্যপাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বনপূর্বক মৎকর্তৃক রচিত হইল।'

"কথাগুলির মধ্যে রঙ্গলালের কাব্যসাধানার মূল প্রেরণার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে,—সে হলো—দেশাত্মবোধ, স্বাধীনতা স্পৃহা, পরাধীনতার বেদনাকে প্রকাশ করা। সেদিনকার বাঙলার যৌবন কবিকণ্ঠে স্বাধীনতার বাণীই শুনতে চেয়েছিল। ভাষা ও ছন্দ যতই বিশেষত্ববর্জিত হোক, রঙ্গলালের কবিতায় স্বাধীনতা পিয়াসী বাঙালীর মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা কথঞ্চিৎ প্রতিফলিত হয়েছে।" এইখানেই 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' কাব্যটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

৭০. **'সমাচার চন্দ্রিকা'**ঃ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় [১৭৮৭-১৮৪৮] সম্পাদিত একটি বিশিষ্ট সাপ্তাহিক সংবাদ-সাময়িকপত্র—প্রথম প্রকাশ ১৮২২ খ্রীস্টাব্দ [এই সঙ্গে ৩৪নং পাদটীকার : পৃ. ১৫৬-৭ প্রয়োজনীয় অংশ যোগ করা যেতে পারে]।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাঙালীর মননশীলতা এবং চিন্তাসম্পদ এতদিনকার কাব্যজগতের বাঁধা পথে ব্যাহত হচ্ছিল—তা গদ্যরীতির সহজ পথ ধরে সাবলীল ভঙ্গীতে চলতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই নতুন সাহিত্য-মাধ্যম কেবল একটি নির্দিষ্ট পণ্ডিতগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাই সাধারণ শিক্ষিত জনসমাজের প্রয়োজনে যখন তাকে জননিরপেক্ষতার ভূমিকা থেকে মুক্তি দিয়ে সর্বসাধারণের পাতে সুষ্ঠুভাবে পরিবেষণের তাগিদ এলো—তখনই সংবাদ-সাময়িকপত্রের উদ্ভব হয় এবং সেই উদ্ভব-কালের উল্লেখযোগ্য সাময়িকপত্র হলো আলোচ্য 'সমাচার চন্দ্রিকা'। ভাবানীচরণ প্রথম দিকে রামমোহনের সাহিত্য-সহযোগী ছিলেন এবং রামমোহন সম্পাদিত 'সংবাদ কৌমুদী' [১৮২১, ৪ ডিসেম্বর]-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু রামমোহন তাঁর ঐ সাময়িকপত্রের মাধ্যমে যখন সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে থাকেন তখন রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু ভবানীচরণ অসন্তুষ্ট হন এবং রামমোহন ও 'সংবাদ কৌমুদী'র সংস্রব ত্যাগ করে নিজেই—মূলত গোঁড়াদের মুখপত্ররূপে, 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে বিখ্যাত সাময়িকপত্রটি প্রকাশ করেন। এটি ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। এই পত্রিকা ও পত্রিকার সম্পাদক রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দুদের মনোভাবের পোষকতা করতেন বলে এই পত্রিকা সে-সময়ে 'একচ্ছত্র জনপ্রীতি' লাভ করেছিলো। রামমোহনের পত্রিকা ও ভবানীচরণের পত্রিকার মধ্যকার বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্ক সেই সময়ে সমগ্র দেশে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিলো। ভবানীচরণের গোঁড়ামি সমর্থনযোগ্য না হলেও তাঁর সাংবাদিক নিষ্ঠা এবং রসজ্ঞ-জীবনদৃষ্টি ও মননশীলতা নবযুগ উন্মেষের সেই প্রথম লগ্নে এক বিস্ময়ের বস্তু ছিল। তাঁর এই শক্তি যদি সমস্ত রক্ষণশীলতাকে অতিক্রম করে

রামমোহনের দূরদৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হতো তবে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রাথমিক স্তরকে এক অনমনীয় স্থায়িত্ব দান করতে পারতো।

'সমাচার চন্দ্রিকা' ভবানীচরণের মৃত্যুর পরেও [২০. ২. ১৮৪৮] তাঁর পুত্র রাজকৃষ্ণ কিছুদিন প্রকাশ করেছিলেন। পরে রাজকৃষ্ণ 'দেউলে হয়ে গেলে ২৫০ টাকায় ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় 'চন্দ্রিকা'র স্বত্ব ও 'হেড' কিনে নেন। কিন্তু কিছু আইনগত জটিলতার কারণে এই নতুন চন্দ্রিকার সঙ্গে পুরাতন 'চন্দ্রিকা'ও প্রকাশিত হতে থাকে। 'সমাচার চন্দ্রিকা' পরে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত হয় এবং শেষ দিকটায় 'দৈনিকে'র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।''

৭১. **'স্বপ্নপ্রয়াণ'** : এই কাব্যগ্রন্থটির প্রণেতা হলেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৪০-১৯২৬]।

রবীন্দ্রনাথের বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল সর্বব্যাপক। কিন্তু তাঁর চরিত্রের মধ্যে যে অনাসক্ত বৈরাগীটি বাস করতো সে 'অনায়াসে সুললিত ও রসমধুর কবিতা রচনা' করেই আবার 'হা-হা করিয়া হাসিতে হাসিতে অনায়াসেই সেগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ছেঁড়া কাগজ বাতাসে উড়াইয়া' দিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রকর গণিতজ্ঞ, তত্ত্ববিৎ, দার্শনিক' এবং কি নয়? এ-ছাড়া তিনি বাঙলা 'শর্টহ্যাণ্ড' [রেখাক্ষর বর্ণমালা] এর উদ্ভাবন করেছিলেন। এইভাবে বহুমুখী কর্মকুশলতা দ্বারা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি প্রধানত তাঁর রূপক কাব্য 'স্বপ্নপ্রয়াণ' [১৮৭৫] এর ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। এ-ছাড়াও মেঘদূতের অনুবাদ, 'কাব্যমালা' [১৯২০], 'যৌতুক না কৌতুক' [১৮৮৩] ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

নিরহঙ্কার পাণ্ডিত্য, সুমিষ্ট কবিত্ব, বিচিত্র ছন্দ-সৃষ্টি, কোমল মধুর ভাষা এবং রুচিপূর্ণ হাস্যরস ইত্যাদির সংমিশ্রণে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যমালা রচনা করে বঙ্গ-ভারতীর সেবা করেছিলেন। এ সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল হলো 'স্বপ্নপ্রয়াণ।' এই কাব্যগ্রন্থখানি বাঙলা সাহিত্যে অভিনব। এ মনোজগতের অপরূপ রূপক। যে সমালোচকই এই কাব্যের সঙ্গে 'ডিভাইন কমেডি', 'ফেয়ারি কুইন', পিলগ্রিমস প্রগ্রেস', 'প্রবোধচন্দ্রোদয়', 'সারদামঙ্গল'-এর সাদৃশ্য খুঁজে পান না কেন এই কাব্য অনন্য—বাঙলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাসে এর জুড়ি খুঁজে পাওয়া যায় না। "স্বরূপের সঙ্গে রূপকের, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের সঙ্গে উদ্ভট grotesque এর, ঘনপিনদ্ধ ক্লাসিক রীতির সঙ্গে আলুলায়িত রোমান্টিক রীতির, বিশুদ্ধ কাব্যভাবনার সঙ্গে গদ্যাত্মক বাগ্‌বিন্যাসের, তৎসম শব্দের সঙ্গে গ্রাম্যশব্দের, নায়কের সঙ্গে জোকারের এমন অর্ধনারীশ্বর মিলন আর কোন্ বাঙলা কাব্যে পাওয়া যাবে? বস্তুত বালুকাবেলায় ক্রীড়ারত শিশুর মতো দ্বিজেন্দ্রনাথ জগৎ পারাবারতীরে কল্পলোকের দুর্লভ মণিকাঞ্চন ও প্রতীক জগতের রঙিন উপলখণ্ড নিয়ে যথেচ্ছ ক্রীড়া করেছেন, গড়েছেন, ভেঙেছেন। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' সেই ক্রীড়ার রঙ্গভূমি। এ কাব্য পুরোপুরি স্বপ্নলোকের কাহিনী নয়,

আবার সঙ্গতি সামঞ্জস্যের সঙ্গেও এর কারবার জমে না। কখনও ভূলোক, কখনও মেঘলোক, কখনও দিবাস্বপ্নলোকে তাঁর কল্পতুরঙ্গ ধাবিত হয়েছে। কল্পনাসুন্দরীর সঙ্গে কবি-নায়কের প্রণয়বন্ধনের কথা সমগ্র কাব্যটি থেকে একপ্রকার বোঝা যায় বটে; কিন্তু সায়াহ্নের মেঘমালাকে তেমন মুঠিতলে ধারণ করা যায় না, তেমনি 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র মধ্য থেকেও একটা যুক্তি-তত্ত্বানুমোদিত তাৎপর্যকে বিশেষ ধরা ছোঁয়া যায় না।'' এই কাব্যগ্রন্থটি সম্বন্ধে কবি বলেছেন যে, তখন তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় মসগুল ছিলেন। তাই এতে অনেক পরিমাণে metaphysics প্রবেশ করেছে।

এ-কথা ঠিক যে এতে কিছু তত্ত্বকথা আছে, হয়তো কিঞ্চিৎ পরিমাণে metaphysics-ও চুপিসাড়ে প্রবেশ করেছে। কিন্তু এ কাব্য দার্শনিকের কাব্য নয়। কিছু ethics থাকলেও metaphysics-এর বাহুল্য নেই। এ কাব্য বাল্য-রূপকথার কাব্য। যে শিশুমন নির্বোধ রূপকথার জগতে এলোমেলো ঘুরে বেড়ায় এ কাব্যের মৃত্তিকা সেই শিশু গন্ধর্বলোকের স্বর্ণরেণুরঞ্জিত।' তাই এর সম্পর্কে ছোট ভাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটি রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ-গবাক্ষ, চিত্র, মূর্তি ও কারুনৈপুণ্য। তাহার মহলগুলি বিচিত্র। তাহার চারিদিকের বাগানবাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। সেই যে একটি বড় জিনিষকে তাহার কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, সেটি ত সহজ নহে।' এই প্রসঙ্গে কাব্যটির তৃতীয় সর্গ 'বিলাসপ্রয়াণ' থেকে কবির আত্মপরিচয়ের কিছু অংশ উদ্ধৃত করি: 'ভাতে যথা সতা-হেম, মাতে যথা বীর, / গুণ-জ্যোতি হরে যথা মনের তিমির! / নব শোভা ধরে সোম আর রবি, / সেই দেব-নিকেতন আলো করে কবি।'

৭২. **লেবেডফ, হেরাসিম:** হেরাসিম বা গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদফ, [১৭৪৯-১৮১৭—Gerasim Stepanovitch Lebedeff] বাঙলার নাট্যসাহিত্যের আদিযুগে এক প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। এমনও বলা যায় যে তাঁরই হাতে বাঙলা নাটক ও নাট্যশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিলো। ইনি জাতিতে ছিলেন রুশ। এঁর পিতার নাম স্তেফান এবং মাতার নাম পারাস্কোভিয়া। এঁরা তিনভাই ও এক বোন। গেরাসিম এক যাজক পরিবারের সন্তান এবং আর্থিক অবস্থা খুব একটা সচ্ছল ছিলো এমন মনে করার কারণ নেই। ইনি খুব বেশিদূর পর্যন্ত কেতাবী বিদ্যা অর্জন করতে না পারলেও রাজবাড়ীর চ্যাপেল-গায়ক পিতার সঙ্গে তেরবছর রুশদেশের রাজধানী পিতের্বুর্গ বসবাসকালে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। এই শিক্ষা তাঁর পরবর্তী জীবনে যথেষ্ট কাজে লেগেছিলো। এরপর ভাগ্যানুসন্ধানে য়ুরোপের নানা দেশ পরিভ্রমণ করে নানা ধরনের বৃত্তি গ্রহণ করেন। এরপর কোন একটি বিশিষ্ট কাজ নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে ভারতগামী জাহাজে চড়ে বসেন এবং ঐ বছরের ২৮ জুলাই মাদ্রাজে এসে পৌছান। এখানে বার্ষিক দু-শ পাউণ্ড বেতনের চুক্তিতে সঙ্গীতানুষ্ঠানের জন্য নিযুক্ত হন। এই

চুক্তি শেষ হলে তিনি ১৭৮৭ সালের আগস্ট মাসে কোলকাতার মাটিতে পা দেন। এখানে আসার অল্প দিনের মধ্যেই এদেশের সঙ্গীত ও সাহিত্যরসিকদের মধ্যে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মাঝে মাঝেই এখানকার য়ুরোপীয়দের সামনে তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় রাখতেন। এইভাবে চলতে চলতে তিনি ২৫ ডুমতলা লেনে [বর্তমান এজরা স্ট্রীট] একটি থিয়েটার স্থাপন করেন। এর নাম ছিলো 'বেঙ্গলী থিয়েটার'। এখানে তিনি দেশীয় রুচি অনুযায়ী হাসি-তামাসাপূর্ণ দুখানি ইংরেজী নাটকের বাঙলায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ-কাজে তাঁকে তাঁর ভাষা-শিক্ষক গোলোকনাথ দাস বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। এই থিয়েটারে অভিনয় করবার জন্য দেশীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহও করে আনেন গোলোকনাথ। তিন মাসের চেষ্টায় নাটক প্রস্তুত ও নাট্যশালা নির্মাণ করে ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর রাত আটটায় প্রথম অভিনয় আরম্ভ হয়। এর সঙ্গীতাংশ ভারতচন্দ্রের কাব্য থেকে সংগ্রহ করে গান করা হয়। ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২১ মার্চ তারিখে এই নাটকের দ্বিতীয়বার অভিনয় হয়। এই নাটকাভিনয় সেদিন বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়েছিলো।

গেরাসিম The Disguise এবং Love is the best Doctor নামে দুটি ইংরাজী-প্রহসন বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এই দুটি প্রহসন বাঙলায় অনুবাদের জন্য নির্বাচন করার তাঁর চরিত্রের বিশেষ দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। 'তাঁর যদি নিজের জাতি ও ভাষা সম্পর্কে কোন গোঁড়ামি থাকতো তবে তিনি স্বচ্ছন্দেই কোন রুশ নাটকের বাঙলা অনুবাদ করতে পারতেন এবং সে-কাজ তাঁর পক্ষে আরও সহজ হতো। কারণ, ঐ নাটক দুটির মূল ইংরেজি ভাষা এবং বাঙলা ভাষা কিছুই তাঁর নিজস্ব ভাষা ছিল না। সুতরাং রুশ ভাষার মূল গ্রন্থ হলে তিনি যে সুযোগ পেতেন ইংরেজি ভাষার মূল থেকে তিনি তা পেতে পারেন নি। এ-বিষয়ে তাঁর যে একটি অত্যন্ত উদার এবং সংস্কারমুক্ত মনোভাব ছিল, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। The Disguise-এর মূল লেখক ছিলেন M. Jodrail নামক জনৈক অখ্যাতনামা নাট্যকার। The Love is the best Doctor-এর মূল নাট্যকারের নাম পাওয়া যায় না।'

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গেরাসিমের অনুবাদ অত্যন্ত দুর্বল এবং বাঙলা জ্ঞানও খুব যে একটা বেশি ছিল তাও মনে হয় না। তিনি The Disguise-এর বাঙলা অনুবাদ 'ছদ্মবেশে'র পরিবর্তে করেছিলেন 'কাল্পনিক সংবদল'। Act-এর অনুবাদ 'অঙ্ক' না করে করেছিলেন 'ক্রীয়া' [ভুল বানানে] এবং Scene-এর বদলে 'ব্যক্ত তা'।

এ-সব সত্ত্বেও গেরাসিমের অনুবাদকর্ম, তাঁর অভিনয়-প্রচেষ্টা, বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে—অনেক অসম্পূর্ণতা নিয়েও, সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

৭৩ **'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত'**: এই উপন্যাসটির রচয়িতা রমেশচন্দ্র দত্ত [১৮৪৮-১৯০৯] বোধ হয় একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালে, তাঁরই প্রবর্তনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উপন্যাস রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয়

দিতে পেরেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতই সরকারী উচ্চকর্মে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্যের অনুরাগী। এই ইতিহাসানুরাগ ও তাঁর ঐতিহাসিকের সন্ধানী দৃষ্টির জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে সৃজনশীল সাহিত্য রচনায় প্রণোদিত করেন। ইতিহাসে যাঁর সমধিক আসক্তি তাঁর পক্ষে সৃজনশীল সাহিত্য-কর্মে প্রবৃত্ত হতে গেলে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করাই স্বাভাবিক। রমেশচন্দ্র সেই স্বাভাবিকত্বের অন্যতম সার্থক ফসল।

রমেশচন্দ্র বাঙলা ভালো জানতেন না —তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন: 'ইংরেজি বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি, ভালো করে বাঙলা শিখি নাই। কখনো বাঙলা রচনা পদ্ধতি জানি না।' অন্যদিকে আরো বলেছেন: 'Sir Walter Scott was my favourite author forty years ago···I do not know if Sir Walter Scott gave me a taste for history, or if my taste for history made me an admirer of Scott,···' এই দুই অবস্থার মধ্যে দিয়ে রমেশচন্দ্র বাঙলা উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং ঐতিহাসিক ['বঙ্গ-বিজেতা' ১৮৭৪; 'মাধবীকঙ্কণ' ১৮৭৭; 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' ১৮৭৬; 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' ১৮৭৯] ও সামাজিক ['সমাজ' ১৮৮৬; 'সংসার' ১৮৯৪] মিলিয়ে মোট ছ-টি উপন্যাস রচনা করেন।

রমেশচন্দ্রের মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত [১৮৭৬] বাঙলা সাহিত্যে একটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। এর বর্ণনীয় বিষয় হলো শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির উত্থান, মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ। নায়ক শিবাজী, প্রতিনায়ক ঔরঙ্গজীব। উপন্যাসের মূল ঘটনা উভয়ের যুদ্ধ হলেও, পারিবারিক কাহিনী একেবারে উপেক্ষিত হয়নি। সেদিক থেকে ইতিহাস ও উপন্যাস পাশাপাশি হাত ধরে চলেছে। এই উপন্যাসে লেখক কোথাও ইতিহাসের অপলাপ না করে ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব ও চরিত্রগুলির অপরিচয়ের দূরত্ব দূর করবার জন্য রঘুনাথ-সরযুর রোমান্টিক কাহিনীর মাধ্যমে উপন্যাসের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছেন।

রমেশচন্দ্রের মোট ছ-টি উপন্যাসের মধ্যে সামাজিক উপন্যাস দুটি কথাসাহিত্যের ক্রমাগ্রগতির স্রোতোধারায় আপন স্বল্প-শক্তির কারণে হারিয়ে গেছে। 'বঙ্গবিজেতা' ও 'মাধবীকঙ্কণ' প্রথম সৃষ্টির দুর্বলতায় আচ্ছন্ন। কিন্তু 'জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা' বাঙলায় সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে আজও প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ দুই উপন্যাসেই লেখকের দেশাত্মবোধের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে, দেশের গৌরবময় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের অবধি ছিলো না। রমেশচন্দ্রের ঐ দুই উপন্যাস সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে, 'এক সময়ে রমেশচন্দ্র বাঙালী সাহিত্যকে দক্ষিণ হাত ধরিয়া নূতন পথে চালনা করিয়াছেন, এখন আবার বাম হাতে ধরিয়া পুরাতন পথের খাল খন্দ এড়াইয়া চলিতে সাহায্য করিবেন। যিনি নূতন পথে চালনা করেন তিনি নেতা, যিনি পুরাতন পথের ত্রুটি সংশোধনে সহায়তা করেন

তিনি গুরু। রমেশচন্দ্র একাধারে নেতা ও গুরু।' এবং এইখানেই 'জীবন প্রভাত' বা 'জীবন-সন্ধ্যা'র গুরুত্ব।

৭৪ **'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'** : বঙ্কিমচন্দ্র [১৮৩৮-১৮৯৪] লিখিত এই গ্রন্থটিকে একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাসের খসড়া বলা যায়। এই কাহিনীটি প্রথম ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে [১২৮৭, আশ্বিন] বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এর চার বছর পরে এটি গ্রন্থাকারে হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই পুস্তকটি পাঠ করে মনে হতে পারে যে বঙ্কিমচন্দ্র বোধহয় চাকুরীক্ষেত্রে যোগ্য মর্যাদা পাননি—তাঁকে ডিঙিয়ে অযোগ্য ও অপদার্থের পদোন্নতি হয়েছে বলে, এই রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আদতে তা নয়। কারণ "বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদ লাভের প্রায় এক বৎসর পূর্বে ইহা রচিত হয়। সুতরাং এই পদ পরিত্যাগের বিরক্তিকর অবস্থার সঙ্গে উহার কোন সংস্রব থাকা সম্ভব নয়। সমাজে যে 'মুচিরাম গুড় রহিয়াছে তাহাদের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি নিবদ্ধ করাই বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল'।* এবং 'রাজপদে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি সৌভাগ্যবলে অনুচিত সম্মান লাভ করে বটে এবং হয়ত যোগ্যতর অনেক ব্যক্তিও নানা ঘটনাচক্রে উপযুক্তরূপ সম্মান ও পদোন্নতি প্রাপ্ত হযেন না, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নিজ জীবনে সরকারের নিকট হইতে কখনও অনাদর পান নাই। এমত অবস্থায় মুচিরামের সৃষ্টি কেন, এ-প্রশ্ন অনেকেরই মনে উঠিতে পারে। তিনি নিজ সার্বিসে এবং হয়ত নিজ স্টেশনেই নিজের পার্শ্বে অনেক মুচিরাম, ঘটিরাম দেখিয়াছিলেন। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ ও তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সরকারে প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই তাঁহার মনে হাস্যরসের উদ্রেক করিয়াছিল। মুচিরামে বঙ্কিম পাঠকগণকে সেই হাস্যরসের ভাগ দিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে হাস্যের সঙ্গে যে বিদ্রূপের বিষ-জ্বালা মিশ্রিত আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।'

মুচিরাম গুড় দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান। মূর্খ-লোভী-বোকা-চোর। বঙ্কিম একে বানর বলেছেন। এমন ব্যক্তি কিভাবে রায়বাহাদুর হলেন তার কৌতুককর বর্ণনাই হলো এই কাহিনীর উপজীব্য। কেউ কেউ এটাকে ব্যঙ্গ উপন্যাস বলতে চেয়েছেন। কিন্তু এ বিষয়ে বঙ্কিম বিশেষজ্ঞ বলেছেন : 'বঙ্কিমচন্দ্র মুচিরাম গুড় লেখার সময় সচেতনভাবে ভাবেননি ব্যঙ্গোপন্যাস লিখছেন। কিন্তু ব্যঙ্গ নক্‌শা লিখতে গিয়ে এখানে কাহিনীর যে রূপ দিয়েছেন, সর্ব দুর্বলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে প্রচলিত যে-কোন ব্যঙ্গোপন্যাসের তুলনায় তা অনেক শিল্পোন্নত। আসলে এ-ধারণা তাঁর বদ্ধমূল ছিলো যে উপন্যাসে ব্যঙ্গরীতি আংশিকতাদুষ্ট। তাই তিনি এ ধারায় দ্বিতীয় উপন্যাস লেখেননি। এবং মুচিরামের এই খসড়া রূপটিকে পূর্ণ করে তুলতেও উৎসাহ পাননি।'

৭৫. **পালামৌ** : বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িকদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন বঙ্কিমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [১৮৩৪-৮৯]। এঁর খ্যাতি বাঙলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তাঁর অবিস্মরণীয় ভ্রমণোপন্যাস 'পালামৌ' [বঙ্গদর্শন, ১২৮৭-৮৯] রচনার মাধ্যমে। অবশ্য তিনি কিছু প্রবন্ধ এবং কয়েকটি উপন্যাস ['রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ১৮৭৭ ; 'কণ্ঠমালা'

১৮৭৭, 'জাল প্রতাপ' ১৮৮৩, 'মাধবীলতা' ১৮৮৪ ইত্যাদি] রচনা করলেও পালামৌ-ই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। নিতান্ত উদ্যম ও অধ্যবসায়ের অভাবে, তাঁর প্রতিভা পুষ্পিত ও পরিণত হতে পারেনি। তৎসত্ত্বেও পালামৌ ভ্রমণোপন্যাসটিতে তিনি যে কবিকল্পনার পরিচয় রেখে গিয়েছেন তা দুর্লভ। 'শুদ্ধ ভ্রমণকাহিনী উপলক্ষ্যে যে আখ্যানমাত্র বর্জিত মনোরম সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব তাহা পালামৌ প্রমাণিত করিয়াছে। ছোটনাগপুরের আদিম গিরি-দরী-অরণ্যানী এবং আরণ্যক পশু-মানব লেখকের সমবেদনারসধারার অভিষেকে পালামৌ প্রবন্ধগুলি নূতনতর মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া জীবন্ত হইয়াছে। অসংলগ্ন ও অপ্রচুর চিত্রসমষ্টি হইলেও পালামৌ সঞ্জীবচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা।' এই কারণে কেউ কেউ তাঁকে তাঁর গদ্যের শিল্প-সাধনার জন্য রবীন্দ্রনাথের অগ্রদূত বলে থাকেন।

আজও 'পালামৌ' ভ্রমণবৃত্তান্তরূপেই পরিচিত, কিন্তু এ-তার চেয়েও আরো কিছু বেশি—একে ভ্রমণোপন্যাস বলা যায়। প্রকৃতিবিলাসী সৌন্দর্যপ্রিয় সঞ্জীবের সঙ্গে এখানে মানবপ্রেমিক সঞ্জীবের একত্র মিলন হয়েছে। এই মিলন অত্যন্ত সহজ এবং নিবিড়ভাবে সাধিত হয়েছে, এই জন্যই প্রধানত রচনাটি সার্থকতা লাভ করেছে। এতে বন্য প্রকৃতির সঙ্গে বনের মানুষ একাকার হয়ে গেছে। বাঙলা সাহিত্যে এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চরিত্রসৃষ্টি ইতিপূর্বে আর কেউই করতে পারেননি। তবুও বলা যায় যে প্রতিভার তুলনায় সঞ্জীবের সাহিত্যসৃষ্টি পর্যাপ্ত নয়। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন: 'তাঁহার অপেক্ষা অল্প ক্ষমতা লইয়া অনেকে যে পরিমাণে সাহিত্যের অভাব মোচন করিয়াছেন, তিনি প্রচুর ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহা করিতে পারেন নাই; কারণ সঞ্জীবের প্রতিভা ধনী কিন্তু গৃহিনী নয়।' এই সূত্রেই 'পালামৌ' বাঙলা সাহিত্যে এতোখানি বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

৭৬. **'নীলদর্পণ':** যাঁকে নিয়ে বাঙলা নাটকের আদি-মধ্যকালের সমাপ্তি এবং যাঁর রচনা নাট্য-নদীতে নবতম চেতনার জোয়ার নিয়ে এসেছিলো তিনি দীনবন্ধু মিত্র [১৮৩০-১৮৭৩]। 'নীলদর্পণ' [১৮৬০] এঁরই রচিত প্রথম নাটক। সাধারণভাবে নাটকটি নীলদর্পণ নামে পরিচিত হলেও এর প্রকৃত নাম 'নীলদর্পণং নাটকং'। তৎকালীন বাঙলার কৃষিসমাজে দুষ্টগ্রহের মতো নীলকর সাহেবের উৎপাত ঘটে। এদের অত্যাচারে জর্জরিত-প্রাণ, গ্রাম-বাঙলার সর্বস্তরের মানুষের হাহাকারের এক জীবন্ত ও মর্মন্তুদ চিত্র এই নাটকের মধ্যে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। এই একটিমাত্র নাটক যেমন সমস্ত দেশের বিবেকবান মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, তেমনি নাট্যকারকেও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দান করেছিল। একদিকে এই সঙ্কট যেমন স্বদেশ বিদেশের সহৃদয় ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সামনে ইংরেজের শোষণের স্বরূপটিকে উদঘাটিত করে, তেমনি নাট্যকারকেও রুচি, ভাষা-অসঙ্গতি, চরিত্র-চিত্রণ ইত্যাদি নানা সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়। এককথায় দীনবন্ধুর এই নাটকটি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে যেভাবে আলোড়িত করেছিলো, আজ পর্যন্ত আর কোন নাটক তা পারেনি। এমন

বলা হয়ে থাকে যে, মাত্র একরাত্রের মধ্যে মধুসূদন নাটকটির by A Native এই ছদ্মনামে একটি অনুবাদ করে দেন [*The Indigo Mirror : 1861*] মূল নাটকেও অবশ্য নাট্যকার দীনবন্ধুর নামের পরিবর্তে লেখা ছিলো : 'কেনাচিৎ পথিকেনভি-প্রণীতম্'। 'নীলদর্পণে'র উক্ত ইংরাজী অনুবাদের বিরুদ্ধে নীলকর সাহেবরা সুপ্রীম কোর্ট [Supreme Court] পর্যন্ত মামলা করেন। এবং ঐ ইংরাজী সংস্করণের প্রকাশক ইংরাজ পাদ্রী জেমস্ লঙের এক হাজার টাকা জরিমানা ও এক মাস হাজতবাস হয়। এই নাটকের অভিনয়কে নিয়েই বাঙলাদেশে সখের থিয়েটারের পরিবর্তে টিকিট কেটে থিয়েটার দেখার জন্য 'সাধারণ রঙ্গালয়' তৈরি হয় [৭/১২/১৮৭২]।

বিশেষ দেশে ও কালে আবদ্ধ এবং কোন এক বিশেষ অবস্থার মধ্যে পতিত এক বিশেষ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর প্রতি সুপ্রচুর সহানুভূতি নিয়ে নীলদর্পণ নাটকটি রচিত হয়েছে—ফলে এর শিল্পগুণ যে ব্যাহত হয়েছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। ঐ সহানুভূতির সাহায্যে দীনবন্ধু তাঁর এই নাটকে এমন কতগুলি চরিত্র তৈরি করেছেন যে, বাংলা সাহিত্যে এর আগে তেমন চরিত্র দেখা যায়নি। এগুলিকে তিনি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকেই আহরণ করে নিয়ে এসেছিলেন। এই জন্যই বোধ-হয় বলা হয়ে থাকে যে, দীনবন্ধুর হাতেই বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। কোন কোন সমালোচক এই নাটককে নাট্যচিত্র বললেও এতে যে সব ভদ্রেতর চরিত্র, যেমন তোরাপ, আদুরী, ক্ষেত্রমণি প্রমুখ চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে তারা এককথায় অতুলনীয়। এবং দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ'কে উদ্দেশ্যমূলক নাটক বললেও বঙ্কিমচন্দ্র একে নিগ্রোদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের কাহিনীমূলক উপন্যাস *Uncle Tom's Cabin*-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। অধিকন্তু 'নিকোলাস্ নিকলবি' ও 'অলিভার টুইসট'-এর পাশে নীলদর্পণের স্থান পাপ-প্রতিষেধক রচনা হিসেবে। দেশ বিদেশের 'পুণ্যবান্' সাহিত্যস্রষ্টার মধ্যে দীনবন্ধুও একজন।"

এইসব কারণেই আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সূচনা পর্বে রচিত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'কে বিশিষ্টতম রচনা হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৭৭ **'পথের দাবী' :** আধুনিক বাঙলা কথাসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয়তার অধিকারী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [১৮৭৬-১৯৩৮]-এর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস এই 'পথের দাবী' [১৯২৬]। এই উপন্যাসটি রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে বাঙলা সাহিত্যে পরিচিত। এই উপন্যাস সম্পর্কে পরিচয় দিতে গিয়ে ড. সুকুমার সেন লিখেছেন : এই উপন্যাসে 'বাঙলার বিপ্লব-আন্দোলনের ঢেউ বঙ্গোপসাগরের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে আছড়াইয়া পড়িয়া কিভাবে একটি অস্ফুট প্রেম-কাহিনীর মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে তাহারই ছবি আঁকা হইয়াছে। বাস্তবমূলক ভূমিকাগুলি বেশ জমিয়াছে। সুমিত্রার ভূমিকায় নির্লিপ্ততার ও কাঠিন্যের মাত্রাধিক্য হইয়াছে। অপূর্ব-ভারতীর প্রেমকাহিনী গল্পের রহস্যময় গম্ভীর ভীষণ পরিবেশকে জমিয়া উঠিতে দেয় নাই। অতি নাটকীয় আতিশয্যও ইহার জন্য দায়ী। অপূর্ব

ঘরপোষা কুণো বাঙালী ভদ্রঘরের ছেলে, স্বীকার করি। সে হয়ত লেখকের মানস-প্রতিবিম্ব, একথাও স্বীকার করিতে বাধা নাই, কিন্তু সর্বদা মেরুদণ্ডহীন ও স্ত্রীলোকের আঁচল-ধরা হইবার আবশ্যকতা শিল্পের দিক দিয়া ছিল কি? ছোটখাট অসঙ্গতি সত্ত্বেও ভারতীর ভূমিকায় খানিকটা স্বাভাবিকতা আছে। মোটের উপর সব্যসাচীর কোমলগম্ভীর রোমান্টিক ভূমিকাটিই পথের দাবীর জনপ্রিয়তার হেতু। আসলে বিপ্লবপন্থার চিত্র হিসাবে পথের দাবী খুব সার্থক রচনা নয়।'

'পথের দাবী' প্রথমে ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ১৩২৯ সালের ফাল্গুন মাস থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। এবং ১৩৩৩-এর বৈশাখে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হয়। অবশ্য এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাঝে মাঝে ছেদ আছে। এই উপন্যাসটি যখন ক্ষেপে ক্ষেপে বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হচ্ছে তখনই পত্রিকার সম্পাদক-পাঠক এবং লেখক প্রতি মাসেই আশঙ্কা করছিলেন যে এই বুঝি বৃটিশ সরকার উপন্যাসটির প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন। এই ভয় থেকেই "প্রকাশক ও সম্পাদক 'পথের দাবী'র শেষাংশ প্রকাশের পর এক কৌশল অবলম্বন করলেন—যে সংখ্যায় শেষ কিস্তি প্রকাশিত হলো তখন লেখার শেষে 'ক্রমশ' কথাটি ছেপে পাঠক এবং সরকারকে বোঝাতে চাইলেন যে এর পরেও আরো কিছু লেখা বাকি আছে। ইতিমধ্যে 'পথের দাবী' গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রয়াস চলতে থাকে। এবং ভাদ্র, ১৩৩৩ [৩১ আগস্ট ১৯২৬] উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা ৭৭, আশুতোষ মুখার্জী রোড থেকে বইটি প্রকাশিত হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই মুদ্রিত সমস্ত কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। নিশ্চিন্ত নিঃশঙ্ক চিত্তে লেখক, প্রকাশক এবং শুভানুধ্যায়ী অসংখ্য মানুষ সরকারী প্রতিক্রিয়া ও হুকুমনামার অপেক্ষায় থাকেন। অপরদিকে সরকারী মহলেও তখন নানান আলোচনা ও রিপোর্টের ভিত্তিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার তোড়জোড় চলেছে। অবশেষে ৪.১.১৯২৭ তারিখে তদানীন্তন বেঙ্গল গভর্নমেন্টের মুখ্য সচিব প্রেনটিস্ সাহেব 'পথের দাবী'র বাজেয়াপ্ত করণের হুকুমনামায় স্বাক্ষর করলেন।

'পথের দাবী'র প্রচার বন্ধ করে বইটিকে রাজদ্রোহমূলক ঘোষণা করায় শরৎচন্দ্র অত্যন্ত আঘাত পান। তিনি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন যে তিনি যেন এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এবং তাঁর প্রতিবাদে ইংরাজ সরকার তার অন্যায় বুঝতে পারবে; দ্বিতীয়ত, দেশ-বিদেশের মানুষ ইংরাজের অনুচিত কাজের তীব্র সমালোচনা করবে এবং তাঁর বই-এর পুনর্বার প্রচার সম্ভব হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করেননি। তিনি ২৭ মাঘ ১৩৩৩ সনে শরৎচন্দ্রকে একটি চিঠিতে লেখেন '···রাজ বিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদ থাকতে পারে না এই কথাটা নিঃসন্দেহে জেনেই ঘটেছে। ···শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়।' এই চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্র খুবই ক্ষুব্ধ হন ও অভিমান প্রকাশ করেন। উভয়ের মধ্যে কিছুটা

ভুল বোঝাবুঝি হয়। ফলত, 'পথের দাবী' উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে।

৭৮ **মোহিতলাল মজুমদার:** রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী প্রতিভা পর্যাপ্ত রচনাবলীর দ্বারা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করলেও তাঁর কাব্যচর্চার শেষ পর্যায়ে কতিপয় কবি মনীষা আপন স্বকীয়তায় ঐ প্রাচুর্যের প্রভাবকে কিছু পরিমাণে অঙ্গীকার করেও বাঙলা কাব্যভুবনে নতুন প্রকৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম মুখ্য কলাকার হলেন কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার [১৮৮৮ ১৯৫২]।

আপাতদৃষ্টিতে কবি মোহিতলালের কবিপ্রকৃতি রবীন্দ্রবিরোধী, কিন্তু সে শুধু তাঁর দেহবাদপ্রবণতায়। রবীন্দ্রনাথ যেখানে ঔপনিষদিক চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ছিলেন, মোহিতলাল সেখানে ছিলেন তান্ত্রিক জীবনভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথ দেহ নয়, দেহাতীত সত্যে বিশ্বাসী; মোহিতলাল প্রেমের ধ্যান নয়—সম্ভোগকামনায় ব্যগ্র। এ বিষয়ে তিনি বামাচারী তান্ত্রিক। তাঁর কাছে দেহবাদ সত্য—অধ্যাত্মবাদ মায়াময় স্বপ্নজগতের বস্তু। এই কারণেই তিনি রুদ্রকে স্পর্ধিত ভাষায় বলতে পেরেছেন 'সুন্দরে হানো সত্যের শূল টুটাও স্বপন, হে নির্দয়।' এই কারণেই তিনি স্বপ্নের বিরোধী; কারণ, স্বপ্ন রোমান্টিক। এই অনুধ্যানই তাঁর কাব্যে ক্ল্যাসিকাল ভঙ্গীকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, যদিও একেবারেই রোমান্টিক রস বর্জিত হয়নি—উভয়ের মধ্যে একটি সুসামঞ্জস্যও সৃষ্টি হয়েছে। এরই পাশে পাশে তিনি যেমন আধুনিকতাকে প্রাচীন বিষয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, তেমনি ইংরাজ কবিদের চৈতন্যের হাওয়া বাঙলা কাব্যাঙ্গনে প্রবাহিত করিয়ে নিজেও ইংরাজী পদবিন্যাস ও অলঙ্কারকে অনুসরণ করেছেন: 'ইংরজি কাব্যের সহিত যাঁহাদের সবিশেষ পরিচয় নাই, তাঁহারা মোহিতলালের কাব্যের এই ইংরেজি প্রভাবের সম্বন্ধে সুবিচার করিতে পারিবেন না। ফলে তাঁহার কাব্যের পাঠক সংখ্যা অনেকখানি সীমিত।

'মোহিতলালের কবিতায় ভাবাবেগের অত্যন্ত প্রাবল্য রয়েছে, কিন্তু তা ঘনীভূত; তারল্যে উচ্ছ্বসিত ও ফেনায়িত হয়ে ওঠেনি। আবেগের ঘনত্ব এবং আঙ্গিকের কাঠিন্য তাঁতে চমৎকার সমন্বয় লাভ করেছে। মোহিতলাল লঘুতাকে ভাবে বা ভাষায় কখনই প্রশ্রয় দেন নি। কচিৎ কল্পনা-বিলাসের [fancy] রাজ্যে বিশ্রাম করেছেন, তাও গহনতর ভাবানুভূতির রাজ্যে অবতরণের জন্য। তাঁর কবিতা অতিমাত্রায় গম্ভীর এই অভিযোগ একেবারে অস্বীকার্য নয়। ভাষাপ্রয়োগে সংস্কৃতানুসরণ এই গাম্ভীর্যকে বাড়িয়েছে।'

এই গম্ভীর স্বভাবের জন্যই সাম্প্রতিক বাঙলা কাব্যচর্চাকে তিনি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি, আবার তাকে পাশ কাটিয়েও যেতে পারেননি। সত্য-শিব ও সুন্দরের নামে তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন—এতে বহু জনের অপ্রীতিভাজন হলেও তিনি সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কুলত্যাগ করতেও

দ্বিধা করেননি। তাই তাঁর সাহিত্যসেবাকে কেউ কেউ বলেছেন সাহিত্যসংগ্রাম। তাঁর মতো এমন সাহিত্য সর্বস্বতা এ-যুগে দুষ্প্রাপ্য। মোহিতলালের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'স্বপনপসারী' [১৯২২], 'বিস্মরণী' [১৯২৭] 'স্মরগরল' [১৯৩৬], 'হেমন্ত গোধূলি' [১৯৪১], 'ছন্দচতুর্দশী' [১৯৫১] প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য-সমালোচক হিসাবেও মোহিতলালের সবিশেষ খ্যাতি রয়েছে। এই বইগুলির মধ্যে 'কবি শ্রীমধুসূদন', 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্য', 'সাহিত্য বিতান', 'সাহিত্য বিচার', শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' প্রভৃতি প্রধান।

৭৯. **'ধূসর পাণ্ডুলিপি'** : রবীন্দ্র-পরবর্তী বাঙলার বিশিষ্ট কবিগণের মধ্যে জীবনানন্দ দাশের [১৮৯৯-১৯৫৪] দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি কবিতাই তখনকার দিনের বিখ্যাত সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিলো। পরে গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার সময় মোট একুশটি কবিতা এতে স্থান পায়। কবির মৃত্যুর পর ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় সংস্করণে আরো পনেরোটি অপ্রকাশিত কবিতা এতে সংযোজিত হয়েছে।

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুল প্রমুখের উৎকট প্রভাব থাকলেও তাঁর চিন্তার ও রীতির স্বকীয়তা এরই দু-একটি কবিতায় ধরা পড়তে আরম্ভ করে। এর পরে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তেই কবির নিজস্বতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে সাহিত্যের ইতিহাসকার জানাচ্ছেন : 'ধূসর-পাণ্ডুলিপি'র কবিতায় জীবনানন্দ স্পষ্টভাবে ইমেজিস্ট কাব্যশিল্পের উপর নির্ভর করিয়াছেন, এবং কবিমানসের ব্যর্থতাবোধ [frustration] যেন বেদনাকাতরতায় [morbidity] পরিণত হইতে চলিয়াছে। নিজের মুড্‌কে কবি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন খণ্ড খণ্ড চিত্ররূপ ও ভাবরূপ দিয়া এবং এ চিত্র ও ভাবরূপ কবিমানসে যেমন অসংলগ্ন অথচ সমস্থায়ী [co-existent] কবিতাও তেমনি অসংপৃক্তরূপে প্রকটিত। এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যঞ্জনার শব্দকে অপর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করিয়া কবি আপনার নিগূঢ় অনুভূতিকে ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহার মধ্যে অবশ্যই ইংরেজীর অনুকরণ আছে, এবং তাহা সর্বদা বিসদৃশ না হইলেও প্রায়ই মুদ্রাদোষে পরিণত হইয়াছে।'

আসলে কবি এই কাব্যগ্রন্থে প্রেমকেই মুখ্য ভূমিকা দান করেছেন যাকে প্রকাশ করতে তিনি অভিনব এক ভাষা রীতি গ্রহণ করেছেন, যা তাঁর অনুভব এবং আন্তরিক প্রত্যয় থেকে জাত। 'মন্ত্রের পবিত্রতা এই ভাষায়। মনে হয়, কোনো গভীর ব্যথাকে রক্তের মধ্যে আস্বাদ করতে হয়েছে বলেই শিল্পীপ্রাণের এই জাগরণ। অথচ সেই ব্যথাই ক্ষতের মতো তাঁর মনে জেগে থেকে কাজ করে গেছে। সেই আত্মচারীর উচ্ছ্বাসময় দৃঢ়তা আর নেই—এক ক্রন্দন থেকে থেকে বাজে। কবিতায় প্রেমেরই মুখ্য আসন, অথচ পরিপূর্ণ আবেগশায়ী হতে ভয়। এক জায়গায় এসে কবি আর এগোতে চান না। বিচিত্র কৌশলে কবিতা শেষ করে দেন। নানা কারুকর্মে,

ইন্দ্রিয়বৈভব দিয়ে এক রূপজগৎ সৃষ্টি করে আমাদের চমকে দেবার খেলা খেলেন। অধিকন্তু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তেই কবি প্রথম জানতে পেরেছেন যে নারীকে ভালোবাসার অপর নাম ব্যথা—অপিচ প্রকৃতিকে ভালোবেসে ব্যথা নেই, শান্তি। এমন কি, নারীকে ভালবাসার স্মৃতিতেও ব্যথা। প্রকৃতির নির্মল শুশ্রূষায় তবু শেষে শান্তি আসে।" এই উপলব্ধিই কবিতা-ফুল হয়ে ফুটেছে তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পাতায় পাতায়। এই চিন্তাবৈশিষ্ট্য বা অভিনব অনুভব-বেদ্যতা তাঁর কাব্যে, বিশেষত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে নিয়ে এসেছে প্রকরণবিশিষ্টতা। তিনি এখানে দেশি-বিদেশি ছন্দ-প্রকরণ নিয়ে নানা পরীক্ষা চালিয়েছেন। ইংরাজী ছন্দ ব্যাকরণকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। সনেটের ছাঁদে রচনা করেছেন Terza Rima. ভাষা ব্যবহারেও তিনি চেষ্টা করেছেন তাঁর চিন্তাকে এক করে দেওয়ার। এইভাবেই কবি এই কাব্যগ্রন্থ থেকেই নিজেকে আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

জীবনানন্দ দাশ ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম পরিবারের ছেলে। বাবা-মা সাহিত্যের জগতের মানুষ। তাঁর মা কুসুমকুমারী সে-সময়ের সুপ্রতিষ্ঠিত মহিলা কবি। মায়ের ভাব ও স্বভাব তাঁতে বর্তেছে। কবির প্রাথমিক শিক্ষালাভ ঘটে জন্মস্থান বরিশালে। ইংরাজীতে এম. এ. পাশ করে কোলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপনার কাজ পান—কিন্তু তাঁর কবিতা অশ্লীলতা দোষদুষ্ট এই অভিযোগে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে কর্মচ্যুত করেন। পরে তিনি দিল্লী-বরিশাল-খড়্গপুর কলেজ এবং বেহালার বিবেকানন্দ কলেজে চাকুরী করেন। শেষে আমৃত্যু তিনি হাওড়া গার্লস কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর কবিতা সেকালের সমস্ত প্রতিষ্ঠিত সাময়িক পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ছাড়াও তাঁর অপরাপর কাব্যগ্রন্থগুলি হলো 'ঝরাপালক' [১৯২৭], 'বনলতা সেন' [২য় ১৯৫২], 'মহাপৃথিবী' [১৯৪৪] 'সাতটি তারার তিমির' [১৯৪৮] প্রসিদ্ধ। 'মাল্যবান' ও 'সুতীর্থ' নামে দুটি উপন্যাসও তিনি রচনা করেছিলেন।

৮০. 'সনেট পঞ্চাশৎ': প্রমথ চৌধুরীর [১৮৬৮-১৯৪৬] রচিত কাব্যগ্রন্থ 'সনেট পঞ্চাশৎ' [১৯১৩] বাংলা কাব্যক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। সনেট বাংলা কাব্যসংসারে বহিরাগত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত য়ুরোপীয় কাব্যোদ্যান থেকে এই ফুলকে বাংলায় এনেছিলেন এবং নাম দিয়েছিলেন 'চতুর্দশপদী কবিতা'। প্রমথ চৌধুরী মশাই একে স্বনামেই আমাদের মধ্যে নিয়ে এলেন। প্রমথ চৌধুরী মূলত গদ্যলেখক, কিন্তু পদ্যের রাজ্যে পাদচারণ করতে তাঁর বাধেনি। 'সমসাময়িক বাঙলা কবিতার কৃত্রিম ভাবালুতা. গতানুগতিক প্রকৃতি বর্ণনা অথবা বইপড়া তত্ত্বকথার নিরর্থ শব্দপ্রচুর ভাষার এবং শিথিল সাহিত্যকর্মের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়া ও আপত্তি এই কবিতা-গুলিতে প্রকাশিত। শব্দচয়নের শ্রমসাধ্য নিপুণতায়, ভাষা ও ভঙ্গির কঠিন দীপ্তিতে ও রচনাবন্ধের গাঢ়তায় প্রমথবাবুর সনেটগুলি নূতন স্বাদ বহন করিয়া আনিল। ভাষায় গদ্যের ভারবহতা দেখা দিল। স্বতঃস্ফূর্তির অভাব থাকিলেও তাহা নির্মাণ-কৌশলে

চাপা পড়িয়া গেল।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সনেটগুলি সম্পর্কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন : 'বাংলায় এ জাতের কবিতা আমি ত দেখিনি। এর কোন লাইনটি ব্যর্থ নয়, কোথাও ফাঁকি নেই এ-যেন ইস্পাতের ছুরি, হাতির দাঁতের বাটগুলি জহুরির নিপুণ হাতের কাজ করা, ফলাগুলি ওস্তাদের হাতের তৈরি—তীক্ষ্ণধার হাস্যে ঝকঝক করচে, কোথাও অশ্রুর বাষ্পে ঝাপ্‌সা হয়নি—কেবল কোথাও যেন কিছু কিছু রক্তের দাগ লেগেছে। বাংলায় সরস্বতীর বীণায় এ যেন তুমি ইস্পাতের তার চড়িয়ে দিয়েছ।'

প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' [বৈশাখ ১৩২১/এপ্রিল ১৯১৪] প্রকাশের আগেই তিনি তাঁর 'সনেট পঞ্চাশৎ' [অর্থাৎ পঞ্চাশটি সনেটের সংকলন] প্রকাশ করে বঙ্গবাণীর পাদপদ্মে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। তাঁর এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থটির প্রতি সেদিন অনেকেই হয়তো মনোযোগ দেননি— কারণ, ১ তীক্ষ্ণমুখী গদ্যলেখকের কলমে আবার কবিতা কেন; এটা অনেকেই ধারণায় আনেন নি; ২. 'সনেট' পরিহিত সরস্বতীর খড়্গপাণি মূর্তি'কে অনেকেই অনুধাবন করতে পারেননি। এইজন্যই একজন সার্থক সনেট লেখক হিসাবে তাঁর যতখানি পাঠক-মনোযোগ পাওয়ার কথা ছিলো ততখানি তিনি পাননি। সম্ভবত তাঁর গদ্য-পরিচয় তাঁর কবি-পরিচয়কে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিলো। যদিও সেযুগের তিনজন বিশিষ্ট কবির কাছ থেকে তিনি কবিতা, বিশেষ করে সনেট রচনার জন্য প্রশংসা পেয়েছিলেন : তাঁরা হলেন, প্রিয়নাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ।

"জীবনের শেষভাগে কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত দু-খানি চিঠিতে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সনেট-পঞ্চাশৎ-এর জন্মকথা বিবৃত করেন। 'বাঙলার সরস্বতীর বীণায়' তিনি যে 'ইস্পাতের তার চড়িয়ে' দিয়েছিলেন তার স্বভাবগত কারণ চিন্তায় শৈথিল্যের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা। তিনি 'আশালতাকে উচ্চ মঞ্চে' চড়াননি—'আমি যে সনেট লিখেছি সে অনেকটা experiment হিসেবে ...আমার সনেটের অন্তরে হয়ত art-এর চাইতে artificiality বেশি। তার কারণ Dante প্রভৃতি মহাকবিদের আমি বংশধর নই। আমি আসলে গদ্যলেখক তা আমি জানি।' তবু তিনি সনেটে যত সামান্য সীমাতেই হোক সাহিত্যে নবত্ব প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছিলেন। ভাবালুতার বিস্রস্ত আত্মপ্রকাশের প্রাবল্যের কালে সংযম ও নৈপুণ্যের আশ্চর্য যে-দৃষ্টান্ত একদা তিনি স্থাপন করেছিলেন সেজন্য উত্তরকালীন কবিরা—যাঁরা স্বভাবকবিত্বে নয়, সচেতন শিল্পকর্মে বিশ্বাসী—এই পূর্বসূরীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন, এই আশা পোষণ করা যেতে পারে।"

প্রমথ চৌধুরী সনেট রচনায় ইতালীয় নয়, ফরাসী সনেটের রীতিকেই বেশি করে অনুসরণ করেছেন। অষ্টকের মিলের ক্ষেত্রে বেশি ব্যতিক্রম না দেখা গেলেও ষটকের প্রথম দুই চরণে মিলের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। এখানে তাঁর 'সনেট' নামক কবিতাটি থেকে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করি : [ষট্‌ক] 'ভালোবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন, / শিল্পী

যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন।/ ইতালীর ছাঁচে ঢেলে বাঙালীর ছন্দ, /গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট। / কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহে বিজাতীয় গন্ধ— / সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট।'

৮১. **'সবুজপত্র'** ঃ রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল' পুরস্কার প্রাপ্তির এক বছর পরে তাঁরই ভাইঝি জামাই প্রমথ চৌধুরী [১৮৬৮-১৯৪৬] সবুজপত্র নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন [১৯১৪ এপ্রিল]। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাধনা' প্রকাশের সময়ের মতোই প্রমথ চৌধুরীকে দিয়ে 'সবুজপত্র' প্রকাশ বা বাঙলা সাহিত্যে সবুজের অভিযান করার উদ্যোগ নিলেন। সাহিত্যে গণচেতনা ও জন-অধিকার, রচনার ক্ষুদ্রত্ব, সাহিত্য সেবা বেনিয়া বৃত্তির উপায় এবং কৃত্রিমতা ও ভাবাবেগের তারল্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার উদ্দেশ্যে প্রমথ চৌধুরীকে গাণ্ডীবধারী করে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'সবুজপত্র' রথের সারথ্য গ্রহণ করলেন। 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা' মন্ত্র উচ্চারণ করে 'সবুজপত্রের মুখপত্রে' সম্পাদক কেন এই পত্রিকা প্রকাশ করছেন তা জানাতে গিয়ে অনেক কথার মধ্যে মোদ্দা কথাটা এই বললেন যে, 'ইউরোপের আগমনে আমাদের দেশে সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠেছে। তার ফল কি হবে সে কথা না বলতে পারলেও এই ফুল ফোটা যে বন্ধ করা উচিত নয়, এই হচ্ছে আমাদের দৃঢ় ধারণা। সুতরাং যিনি পারেন তাঁকেই ফুলের চাষ করবার জন্য উৎসাহ দেব।' '..আমরা এই নতুন পত্র প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছি। একটা নতুন কিছু করবার জন্য নয়, বাঙালীর জীবনে যে নূতনত্ব এসে পড়েছে তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ করবার জন্য।' ...'এক কথায়, শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ আমাদের প্রকাশ করতে হবে না।' ...'দেশের অতীত ও বিদেশের বর্তমান, এই দুটি প্রাণশক্তির বিরোধ নয়, মিলনের উপর আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আশা করি বাঙলার পতিত জমি সেই মিলনক্ষেত্র হবে। সেই পতিত জমি আবাদ করলেই তাতে যে সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠবে, তাই ক্রমে জীবনের ফলে পরিণত হবে। ...আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকা, আশা করি, এ-বিষয়ে লেখকদের সহায়তা করবে।'

"২৫ বৈশাখ ১৩২১ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে কলিকাতায় 'সবুজপত্র' বাহির হইল। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদক। সবুজপত্র প্রকাশিত হইল সম্পূর্ণ নিরাভরণ—চিত্র বিজ্ঞাপন পাঁচ মিশালী সংবাদ আলোচনা বিবর্জিত পত্রিকা। সুতরাং ব্যবসায়ী কাগজের সাহিত প্রতিযোগিতার কোনো কথাই উঠিত না—লেখকদের পয়সা দেওয়া সম্ভব ছিল না।' 'প্রচলিত অপ্রচলিত কোন বাঙলা মাসিকপত্রের সঙ্গে সবুজপত্রের মিল দেখা গেল না। সাইজ অর্ধ-ফুলস্ক্যাপ সবুজ রঙের মলাট, মলাটের মাঝখানে সবুজ তালপাতার সিলুয়েৎ [silhouette—কালোরঙের আবছা নক্শা]। উদ্ধত, অদম্য, চিরহরিৎ, চির-নবীন প্রাণের সরল সবল উদ্দণ্ড উর্ধ্বাভিমুখিতার চিহ্ন এই অভিনব তালধ্বজ।' এই চিরনবীনতা বরণ করে তাই প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হলো 'সবুজের অভিযান' [রচনাকাল ১৫ বৈশাখ ১৩২১]। এবং এইখান থেকেই রবীন্দ্র-কাব্যধারার একটি

নতুন যুগের সূচনা ['প্রমথনাথ যে এই পত্রকে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য সাধনার একটি নূতন যুগে প্রবেশ করতে পেরেছিল'—মৃত্যুর কিছু আগে রবীন্দ্রনাথের এক পত্র]।

'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা খুব বেশি ছিলো না। উচ্ছ্বাসহীন, ভাবসংহত ও পরিমিত ভাষা ব্যবহার করে মূল সত্যটিকে প্রকাশ করার ক্ষমতা কম লেখকেরই ছিলো। যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন: প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, কিরণশঙ্কর রায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কবিকন্যা মাধুরীলতা দেবী [১৮৮৬-১৯১৮] প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা ছিলো যে সবুজপত্র প্রচণ্ড গাল খাবে। চিত্তরঞ্জন দাশ ও বিপিনচন্দ্র পাল পরিপুষ্ট 'নারায়ণ' পত্রিকা এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ইউনাইটেড ফ্রন্ট তৈরি করে প্রমথ চৌধুরীর ভাষা উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথের ভাবের ওপর বাছা বাছা তীক্ষ্ণ তীর ছুঁড়তে লাগলেন। কিন্তু এই আক্রমণ স্থায়ী হয়নি। ধীরে ধীরে চলতি ভাষা ব্যবহার ও সাহিত্যের গণতন্ত্রীকরণ সবাইকেই মেনে নিতে হয়। 'সবুজপত্র' জয়লাভ করে।

৮২. 'বেণের মেয়ে': রবীন্দ্র-পূর্বযুগে, বঙ্কিমচন্দ্রের সম-সময়ে তাঁরই ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও শিষ্য লেখক হলেন হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য [মহোমহাপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৫৩-১৯৩১]। ইনি ছিলেন পণ্ডিত এবং গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচক। প্রচণ্ড সংস্কৃতাভিমান ও বিদ্যাগৌরব এঁর লেখনভঙ্গীকে কিন্তু কোনভাবেই কুণ্ঠিত করে নি। এঁরই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস হলো 'বেণের মেয়ে' [১৩২৬, ২ ফেবরুয়ারী ১৯২০]। এই উপন্যাসটি 'নারায়ণে' ১৩২৫ কার্তিক থেকে ১৩২৬ অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। দশম-একাদশ শতাব্দীর সপ্তগ্রামকে অবলম্বন করে তার এই উপন্যাসের কাহিনী বিস্তারলাভ করেছে।

হরপ্রসাদের বিদ্যাচর্চার মূল ক্ষেত্র প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সাহিত্য হলেও পুরাতন বাঙলা ও বাঙালীর গৌরব ও বৈশিষ্ট্যকে তিনি উপেক্ষা করেননি। 'প্রাচীন বাঙলার গৌরব' [১৯৪৬] তাঁর রচিত একটি আদর্শ গ্রন্থ। এর মাধ্যমে কেবল তথ্য পরিবেষণ নয়—বাঙালী জাতির আত্মমর্যাদাবোধ যাতে জাগ্রত হয় তারই উপকরণ সন্ধান করা হয়েছে। বাঙলার প্রাচীন ভাস্কর্য, স্থাপত্য, শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদির অনুসন্ধান করে তিনি ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচয়িতাদের জন্য ভিত তৈরি করে দিয়ে গেছেন। অধিকন্তু এর মাধ্যমে তাঁর স্বজাতিপ্রীতি ও তার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের যে পরিচয় পাই তা পরবর্তী প্রজন্মকে অবশ্যই উৎসাহিত করবে। এবং ঐ শ্রদ্ধা ও প্রীতির প্রাথমিক ফল হলো তাঁর 'বেণের মেয়ে' উপন্যাস।

"এই 'বেণের মেয়ে' উপন্যাস একাধারে কাহিনী এবং হাজার বছরের প্রাচীন বাঙলার সামাজিক ইতিহাস। কিন্তু কেবল বাঙলা দেশেরই চিত্র এতে আছে এমন মনে করলে ভুল হবে। এখানে কাহিনীর স্রোত সেদিনের বাঙালীর জীবনকে ছাপিয়ে

সারা ভারতের ক্ষেত্রে গিয়ে পড়েছে।"

'বেণের মেয়ে'র কাহিনী গড়ে উঠেছে সপ্তগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী সাগর দত্তকে কেন্দ্র করে। এই সাগর দত্তের একমাত্র সন্তান মায়া। সে-অন্যতর বৃহৎ বণিকের একমাত্র পুত্রবধূ। কিন্তু বিধবা। এই উভয়কুলের বিপুল বৈভব হস্তগত করার জন্য বৌদ্ধেরা মায়াকে অপহরণের চেষ্টা করে। কিন্তু ভবতারণ পিশাচখণ্ডী নামক জনৈক নৃত্যগীত ব্যবসায়ী [মস্করী] তাকে রক্ষা করে। এই উপলক্ষে বৌদ্ধ ও হিন্দু-দের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায় ও বৌদ্ধেরা পরাজিত হলে—হিন্দু রাজত্বের পুনপ্রতিষ্ঠা হয়। তখন বঙ্গাধিপ মস্করীকে পুরস্কৃত করতে চাইলে—সে রাজদূতের দায়িত্ব নিয়ে সমগ্র উত্তরাপথে নিমন্ত্রণ করার জন্য যাত্রা করে।—ইচ্ছা বঙ্গাধিপ যেন প্রাচীন কালের রাজাদের মতো তাঁর রাজসভাতেও সারা ভারতের জ্ঞানীগুণীদের আমন্ত্রণ করেন। রাজা সম্মত হয়ে ভবতারণকে ভারতব্যাপী নিমন্ত্রণের ভার দিলেন। লেখক হরপ্রসাদ ভবতারণের পক্ষে পাঠককে বিহার-মগধ-নালন্দা-কনৌজ প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়েছেন।

" 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে অনেকগুলি নরনারী আছে—পাঠক যাহাদের ভাল-বাসিতে বাধ্য হইবে—তাহাদের মধ্যে পিশাচখণ্ডী গ্রাম নিবাসী ভবতারণ শর্মা সকলের শ্রেষ্ঠ। এমন নির্লোভ, পরার্থপর, স্বদেশবৎসল ব্যক্তি বাঙলা সাহিত্যে বিরল।" এইরকম চরিত্রসৃষ্টিতে, প্রাচীন বাঙলার রাজনীতিক ও সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিত রচনায় 'বেণের মেয়ে' উপন্যাস আজও বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত আছে।

৮·৩ 'পরিচয়' ঃ বর্তমান শতাব্দীর তিনের দশকে জন্মগ্রহণ করে [১৩৩৮ শ্রাবণ/১৯৩১, জুলাই-আগস্ট] আজও যে মাসিক পত্র [প্রকাশ কালে এ ত্রৈমাসিক ছিল] স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থেকে সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত রাখতে সাহায্য করছে তার নাম 'পরিচয়'। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন বিশিষ্ট কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত [১৯০১-১৯৬০]। ইনি তৎকালের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও দার্শনিক এবং বৈদান্তিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার সঙ্গে সাংবাদিকতার সূত্রে প্রথমে যুক্ত হন। তার আগে নব পর্যায়ের 'সবুজ-পত্রে'র সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন। এই ভাবে সংবাদ-সাময়িক-পত্রের সঙ্গে কাজ করতে করতে এবং বন্ধু-পরিজনের সঙ্গে সাহিত্য ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একটি "সাহিত্যপত্র প্রকাশ করলে মন্দ হয় না, এমন একটা চিন্তা-ভাবনা তখন অনেকে করতে থাকলেন। কিন্তু রুচি ও আদর্শ অনুসারে পত্রিকা প্রকাশ করা সহজ ছিল না। বাংলাদেশে তখন 'প্রবাসী' সবচেয়ে অভিজাত পত্রিকা। এবং সুধীন্দ্রনাথের রুচি যে ইতিমধ্যেই উচ্চ সুরে বাঁধা হয়ে গেছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। পত্রিকা প্রকাশ করলে এমনই করতে হবে যে বাংলা সাহিত্যের সুধী ও বিদ্বৎজনের কাছে বরণীয় হবে।" এই থেকেই 'পরিচয়ে'র জন্ম।

এই পত্রিকা সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের ভাই হরীন্দ্রনাথের বক্তব্য উদ্ধৃত করলে এই পত্রিকার স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যাবে। তিনি লিখছেন: "...রবীন্দ্রনাথকে জানানো হল। প্রথম সংখ্যায় তিনি কিছু লিখলেন না, কিন্তু পত্রিকা দেখে দ্বিতীয় সংখ্যাতেই চিঠি পাঠালেন—নামে চিঠি বস্তুত প্রবন্ধের আকৃতি। প্রথম সংখ্যার লেখকদের মধ্যে কয়েকজন: হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরবল, ধূর্জটিপ্রসাদ, হেমেন্দ্রনাথ রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ। পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা হল ১৪৫। দাম প্রতি সংখ্যা ১ টাকা, বার্ষিক সওয়া ৪ টাকা।...পত্রিকার নাম অনুমোদন করেন আমাদের মেশোমশাই চারুচন্দ্র দত্ত।...প্রথম দিকে পত্রিকার কোন প্রচ্ছদশিল্প ছিল না। তবে পরবর্তীকালে যামিনী রায় 'পরিচয়'-এর জন্য একাধিক প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন। 'পরিচয়' পত্রিকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল পুস্তক পরিচয়।...বাংলা-দেশের সর্বশ্রেণীর লেখক 'পরিচয়' পত্রিকাতে না লিখলেও একটি বিশেষ শ্রেণীর পাঠক ও লেখকের কাছে যে এর অসামান্য আবেদন ছিল, তা ঐতিহাসিক সত্য এবং সে যুগের অন্যান্য বিশিষ্ট পত্রিকা সবুজপত্র, প্রবাসী, বিচিত্রা প্রভৃতির পাশেই পরিচয় তার সুনির্দিষ্ট আসন তৈরি করে নিতে পেরেছিল। এর প্রায় একক কৃতিত্ব সুধীন্দ্রনাথের। বাংলা সাহিত্যের চিন্তার জগতে, মনন ও মুক্ত উদার বুদ্ধিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে 'পরিচয়'-এর অবদান এখনও পর্যন্ত উদাহরণ স্বরূপ।...'পরিচয়' পত্রিকার জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকায় সুধীন্দ্রনাথ ষষ্ঠ বর্ষ থেকে তাকে মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করেন।"

'পরিচয়' বরাবরই আধুনিক প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন মানুষের মুখপত্র রূপে পরিচিত ছিল। পরে এ-দেশের বামপন্থীচিন্তা বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদে বিশ্বাসী লেখকগোষ্ঠীর দ্বারা পত্রিকাটি পরিপোষিত হতে থাকে। তিন-চার ও পাঁচের দশকের সমস্ত বিশিষ্ট প্রবন্ধকার-কথাকার ও কবি পরিচয়ে লিখেছেন, তার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। প্রসঙ্গত 'পরিচয়ে'র প্রথম সংখ্যাটিতে সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদকীয় থেকে দু-চার লাইন উদ্ধৃত করা গেলে তঁার আদর্শ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে: "এমন একদিন আসা অসম্ভব নয় যখন এক বিশ্বজনীন ভাষা ও সাহিত্যে সম্মিলিত মহামানবের অন্তরের কাহিনী ছন্দিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু এই শুভদিনের আবির্ভাবকে ত্বরিত করিতে হইলে আজ মানুষের প্রধান কাজ—ভাষা সঙ্কটের দুর্লঘ্য বাধা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির যুগযুগ-সঞ্চিত পরিশীলন-সম্পদের সহিত পরিচিত হওয়া।...বাঙলাদেশে 'পরিচয়' আজ এই ভারই লইতে চাহে। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাবগঙ্গার ধারা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বহাইয়া দেওয়া। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট দানগুলিকে 'পরিচয়' বাঙালী পাঠককে উপহার দিতে অভিলাষী... এই সঙ্গে মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকেও 'পরিচয়' তাহার দৃষ্টি সদাজাগ্রত করিয়া রাখিবে।"

মোট বার বছর যুক্ত থাকার পর সুধীন্দ্রনাথ ১৩৫১-এর আষাঢ়ে [১৯৪৩-এর জুলাই] পরিচয়ের সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এর পর তখনকার বাঙলা দেশে

মোটামুটিভাবে কমিউনিস্ট হিসাবে পরিচিত সেই নীরেন রায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক হন। বর্তমান সম্পাদক কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত দ্বারা পরিচালিত হলেও পরিচয় তার পূর্বকার জৌলুস হারিয়ে ফেলেছে।

৮৪. **'নক্সীকাঁথার মাঠ' ঃ জসীমউদ্দীন ঃ** কবি জসীমউদ্দীন [১৯১৩—১৯৭৬] রবীন্দ্র-অনুজ কবিসমাজের অন্যতম বিশিষ্ট সভাসদ্। অবিভক্ত বঙ্গদেশের ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে মাতুলালয়ে ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারী জসীম-উদ্দীনের জন্ম হয়। ১৯২৩ সালে ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯২৯-এ ঐ জেলারই রাজেন্দ্র কলেজ থেকে বি. এ. এবং ১৯৩১ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙলায় এম, এ, পাশ করেন। ১৯২৪-৩২ সাল পর্যন্ত জসীমউদ্দীন অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে বাঙলার পল্লীগীতি সংগ্রাহকের কাজ করেন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি বাঙলার পল্লীজীবন ও তার লোকায়ত সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন যা তাঁর পরবর্তী কালের সাহিত্যভাবনাকে গভীরভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। ১৯৩৭ সালে মমতাজ বেগমের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং পরের বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা বিভাগে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সালে অধ্যাপনার কাজ পরিত্যাগ করে সরকারের প্রচার বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

স্কুলে পড়বার সময়েই জসীমের কবিত্বশক্তির প্রকাশ পায়। প্রথমে নজরুল-রবীন্দ্র-নাথের অনুসরণ করলেও অচিরেই আপন কবি-প্রতিভায় প্রত্যয় জন্মায়। যখন জসীম কলেজের ছাত্র তখন তাঁর 'কবর' নামক কবিতাটি ['রাখালী' (১৯২৭) কাব্যগ্রন্থে সংগৃহীত] রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দীনেশচন্দ্রও কবিতাটিকে প্রবেশিকা পরীক্ষার বাঙলা text-বই-এর অন্তর্ভুক্ত করে জসীমকে দুর্লভ সম্মানের অধিকারী করেন।

আধুনিক কালের সাহিত্যে, বিশেষভাবে কবিতায় নগর-সংস্কৃতির কণ্ডূয়ন সর্বাধিক, তারই মধ্যে জসীমউদ্দীন যেন নতুন করে আমাদের দৃষ্টিকে অবহেলিত পল্লীমায়ের দিকে টেনে নিয়ে গেছেন। তাঁর কাব্যে বাঙলার মাঠ-ঘাট, নদ-নদী, কৃষকের গৃহ, শ্যাম-সবুজ প্রান্তর এক মায়াময় রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। পল্লীবাঙলার নরনারীর প্রেম-প্রীতির গাথা এবং দুঃখ-দারিদ্র্য-কণ্টকিত জীবনই জসীমউদ্দীনের কাব্যের উপজীব্য হয়ে উঠেছে। হৃদয়ের অমৃতক্ষরা, দরদ-ভরা কবিভাষায় তাঁর কবিতাগুলি রচিত হয়েছে বলেই সেগুলি এমন মর্মস্পর্শী।

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় জসীমউদ্দীনের অতিপরিচিত এবং বোধহয় সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'নক্সীকাঁথার মাঠ'। দুই পল্লীকিশোর ও কিশোরীর মধুর প্রেমকাহিনীই এই

গিয়ে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন: 'নক্সীকাঁথার মাঠ রচয়িতা শ্রীমান্ জসীমউদ্দীন নতুন লেখক, তাতে আবার গল্পটি একেবারে নেহাৎই যাকে বলে—ছোট্ট এবং সাধারণ পল্লী-জীবনের। শহরবাসীদের কাছে এই বইখানি সুন্দর কাঁথার মতো করে বোনা, লেখার কতোটা আদর হবে জানি না। আমি এটিকে আদরের চোখে দেখেছি, কেন না এই লেখার মধ্য দিয়ে বাংলার পল্লী-জীবন আমার কাছে চমৎকার একটি মাধুর্যময় ছবির মতো দেখা দিয়েছে।'

রূপা এবং সাজু এই দুই কিশোর-কিশোরী পাশাপাশি দুই গাঁয়ে থাকে—দুটি গাঁ একটি মাঠ দিয়ে ভাগ করা। এই মাঠটির নাম 'নক্সী কাঁথার মাঠ'। ঐ দুই হৃদয়ের প্রেম-বিবাহ ও করুণ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কাহিনী শেষ হয়েছে। মোট চৌদ্দটি ছোট ছোট দৃশ্যপটে সমগ্র কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিটি দৃশ্যেই বাঙলার পল্লীকুটিরগুলির এক-একটি দৃশ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। সে-দৃশ্যের বর্ণনা যেমন বাস্তবধর্মী, তেমনি আশ্চর্য রূপে কবিত্বময়। কবি তাঁর স্বাভাবিক শিল্পচেতনার বশেই পল্লী-প্রকৃতির বর্ণনায়, এর নর-নারীর প্রেম-ভালবাসার কথা প্রাত্যহিক জীবনের কর্মধারা প্রকাশের জন্যে বিষয়বস্তু, ভাব, ভাষা অনেকটাই পল্লীকবিদের গীতি, গাথার জগতেই রয়ে গেছে। সেখান থেকে ঋণ নিয়ে তিনি আপনার স্বাভাবিক কবিত্বের রঙ ধরিয়ে এ-আশ্চর্য কাব্য-প্রতিমা গড়ে তুলেছেন। সমকালীন নাগরিক সাহিত্যের পাশে এ-সাহিত্য তাই রূপে, রসে একটু অভিনবই ঠেকেছিল। নাটকীয় দৃশ্যপরম্পরায় সজ্জিত চৌদ্দটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ কাব্যটি ধীরে ধীরে যে জীবন-চিত্রটি তুলে ধরেছে আমাদের সামনে, তাতে রামধনুর বর্ণ সমারোহ হয়তো নেই, কিন্তু মানবিক হৃদয়-ঐশ্বর্যে তা তুলনাহীন। এবং এইখানেই 'নক্সী-কাঁথার মাঠ'-এর বিশিষ্টতা। এখানে ঐ কাব্য থেকে চারটি চরণ উদ্ধৃত করার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারলাম না। বিবাহের পর যখন ঘুমন্ত সাজুর দিকে রূপমুগ্ধ রূপা তাকিয়ে রয়েছে তারই বর্ণনায় স্বয়ং রূপমুগ্ধ কবি: 'সেদিন রাত্রে বাঁশি শুনে শুনে বউটি ঘুমায়ে পড়ে, / তারি রাঙা মুখে বাঁশি-স্বরে রূপা বাঁকা চাঁদ এনে ধরে। / তারপর খুলে চুলের বেণীটি বার বার করে দেখে, / বাহুখানি দেখে নাড়িয়া চাড়িয়া বুকের কাছেতে রেখে। ...ভাবে রূপা ও যে দেহ ভরি' যেন এনেছে ভোরের ফুল, / রোদ উঠিলেই শুকাইয়া যাবে, শুধু নিমেষের ভুল।'

৮৫. **'প্রবাসী'**: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় [১৮৬৫—১৯৪৩] সম্পাদিত হয়ে ১৩০৮-এর বৈশাখ [এপ্রিল ১৯০১] 'প্রবাসী' পত্রিকা এলাহাবাদ থেকে আত্মপ্রকাশ করে। রামানন্দ এখানকার 'কায়স্থ কলেজে'র অধ্যক্ষ ছিলেন। এর আগে কলকাতায় থাকাকালে তিনি সিটি কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। রামানন্দ যখন এলাহাবাদে আসেন তখন বাঙলার বাইরের অন্যান্য প্রবাসের মতোই এলাহাবাদেও কর্মসূত্রে অসংখ্য শিক্ষিত বাঙালী বসবাস করতেন। সেই সমস্ত বাঙালীর মুখপত্র হিসাবে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় এই 'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী' নামক বিখ্যাত কবিতাটি ছাপা হয়।

'প্রবাসী' পত্রিকা প্রকাশের আগে রামানন্দ পরপর তিনটি মাসিকপত্র সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ['দাসী', ধর্মবন্ধু', ও 'প্রদীপ'] এই অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হন। বিশিষ্ট গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগল এই পত্রিকার উদ্যোগপর্ব সম্বন্ধে লিখেছেন : "যে কোন উচ্চমানের পত্রিকাকে স্থায়িত্ব দান করিতে হইলে, তাঁহার মতে প্রধানত তিনটি বিষয়ে সম্যক্ অবহিত হওয়া প্রয়োজন। যথা, ১) সম্পাদক ও পত্রিকা পরিচালক বা স্বত্বাধিকারী একই ব্যক্তিকে হইতে হইবে ; ২) পত্রিকার জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকা চাই ; ৩) বিভিন্ন বিষয়ে লেখার জন্য লেখক-গোষ্ঠী তৈয়ারী করা এবং তাঁহাদের জন্য পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তিনি আরও বলিয়াছেন, শিক্ষক বা অধ্যাপকের মতো সম্পাদকের কাজও সমান পবিত্র। এতাদৃশ চিন্তা ও প্রস্তুতির ফল হইল 'প্রবাসী'। সূচনায় রামানন্দ স্বল্প কয়েকটি কথায় পত্রিকা প্রকাশন। সম্বন্ধে এইরূপ লিখিলেন : "সর্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নাম লইয়া আমরা 'প্রবাসী' প্রকাশিত করিতেছি। বঙ্গদেশের বাহিরে এরূপ মাসিকপত্র বাহির করিবার ইহাই প্রথম উদ্যম'।" ভারতের বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ীর স্থাপত্যের পবিত্র নিদর্শন-গুলিকে কোলাজ করে নিয়ে প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ তৈরি করা হয়। কি বিষয়বস্তু, কি চিত্র সৌষ্ঠব সমস্ত দিক থেকেই 'প্রবাসী' প্রকাশমাত্রেই পত্র-পত্রিকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। প্রথম সংখ্যা পাঠ করে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লেখেন 'প্রবাসী' ষোল আনাই পড়িয়াছি ও পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।"

অচিরকাল মধ্যেই 'প্রবাসী' বাঙলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের মধ্যে নানা কারণে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। সেগুলি এই রকম : ১) সর্বভারতীয় আবেদন। ২) প্রবাসী বাঙালীর কথা। ৩) উচ্চমানের দেশী-বিদেশী চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ছবি প্রকাশ—যার সূত্রে রবি বর্মা, রাম বর্মা, কাশীনাথ স্কাত্রে, বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাবলী নিয়মিত 'প্রবাসী'র পাতায় প্রকাশিত হতে থাকে। ৪) দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে, প্রথম শ্রেণীর রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ করে নিয়মিত প্রকাশ। ৫) সমসময়ের রাজনৈতিক আন্দোলন ও দেশব্যাপী জেগে ওঠা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে সাহসের সঙ্গে প্রকাশ। ৬) সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে জনসমক্ষে যথার্থ মর্যাদার সঙ্গে উপস্থিত করা। ১৩১৮ মাঘের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম সে-কথা সগৌরবে প্রচার করা। ৭) আচার্য জগদীশ বসুর বিজ্ঞান-সাধনাকে 'প্রবাসী' পাতায় প্রচার করা। ৮) বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনাকে 'প্রবাসী'র প্রতিটি সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া। ৯) তৎকালীন নতুন সাহিত্যিক-দের প্রতিভাকে সযত্নে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। বর্তমানকালের অনেক কবি-সাহিত্যিকের প্রথম গল্প-উপন্যাস 'প্রবাসী'র পাতাতেই আত্মপ্রকাশ করেছিলো।

প্রসঙ্গত বলা ভালো যে, ১৯০৮ সালে রামানন্দ এলাহাবাদ ত্যাগ করে কলকাতা-তেই তাঁর কর্মক্ষেত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন এবং সেইসঙ্গে 'প্রবাসী'ও স্বদেশে 'নির্বাসিত' হলো। 'প্রবাসী' প্রসঙ্গে Modern Review [1907] ইংরাজী মাসিক-

টিরও নাম উল্লেখ করতে হয়। এটি যেন রামানন্দের দ্বিতীয় ফুসফুস।

স্বল্পায়ু বাংলাদেশে 'প্রবাসী' দীর্ঘজীবী হয়েছিলো [১৯৪২ সালে জরাগ্রস্ত রামানন্দ এর সম্পাদনাভার অন্যের হাতে দেন এবং ১৯৪৩ সালে তাঁর মৃত্যুর সময়েও এটি প্রকাশিত হতো]। রামানন্দের সুযোগ্য সম্পাদনায় 'প্রবাসী' শুধু সাহিত্য পত্রিকা হয়ে ওঠেনি—জাতির সর্ববিধ উন্নতির যাবতীয় প্রচেষ্টার সঙ্গেই এ-প্রতিনিয়ত, সর্বসময়ে যুক্ত থেকেছে।

৮৬. **'ভারতী'**ঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ঠাকুর পরিবারের জ্যোতিঃ-স্বরূপ; সমস্ত রকম কাজ ও আন্দোলন এবং নতুন নতুন বিষয়কর্মের উদ্ভাবক। তিনিই একদিন প্রস্তাব দিলেন ঠাকুরবাড়ী থেকে একটা মাসিকপত্র বার করার। সেই ইচ্ছারই ফসল হলো 'ভারতী'। 'জ্যোতিরিন্দ্রের নাম কখনো ভারতীর সম্পাদকীয় তালিকায় স্থান না পাইলেও প্রকৃতপক্ষে ভারতী ছিল তাঁহার মানসকন্যা। দ্বিজেন্দ্রনাথ হইলেন সম্পাদক ও ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে [১৮৭৭ জুলাই] ভারতীর প্রথম সংখ্যা বাহির হইল' [রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৬ বছর তিন মাস]।

'ভারতী'র প্রথম সংখ্যায় এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখা হলো: 'ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি তাহা তাহার নামেই প্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণীস্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিদ্যাস্থলে বক্তব্য এই যে, বিদ্যার দুই অঙ্গ, জ্ঞানোপার্জন এবং ভাবস্ফূর্তি। উভয়েরই সাধ্যানুসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্দেশ্য। স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্থলে বক্তব্য এই যে, আলোচনার সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাই নত-মস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিব।'

'ভারতী' দীর্ঘজীবী হয়েছিলো। এই দীর্ঘকালের মধ্যে যাঁরা এর সম্পাদনাভার গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম ও কার্যকাল এই রকম: দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১২৮৪-১২৯০]; স্বর্ণকুমারী দেবী [১২৯১-১৩০১]; হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলাদেবী [১৩০২-১৩০৪]; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৩০৫]; সরলা দেবী [১৩০৬-১৩১৪]; স্বর্ণকুমারী দেবী [১৩১৫-১৩২১]; মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় [১৩২২-১৩৩০] সরলা দেবী [১৩৩১-১৩৩৩-কার্তিক]। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ইচ্ছায় ১২৯২-এর বৈশাখ থেকে 'বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ' [মাসিক] প্রকাশিত হলো—নাম 'বালক'। এরও পরোক্ষ সম্পাদনাভার রবীন্দ্রনাথের ওপর এসে পড়ে। এক বছর সগৌরবে চলার পর বালক ভারতীর সঙ্গে মিশে যায় [১৮৮৬/১২৯৩ বঙ্গাব্দ]—নাম হয় 'ভারতী ও বালক'।

আমরা দেখেছি যে 'ভারতী' তখন আত্মপ্রকাশ করে যখন রবীন্দ্রনাথ মাত্র ষোল বছরের কিশোর। রবীন্দ্রনাথ রচনা করতে শিখেছেন বটে কিন্তু আত্মবিশ্বাস জাগে নি। তবুও তাঁর লেখবার শক্তি ছিলো অসাধারণ, সাহিত্যবিচারের মানসূচী ছিলো

অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট এবং 'ভারতী' প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর প্রতিভা প্রকাশে আর বাধা রইলো সামান্যই।

এই 'ভারতী' পত্রিকা ঠাকুরবাড়ীর অন্যান্য সদস্যদের আত্মপ্রকাশের অপ্রতিহত মাধ্যমে হলেও এতে সেকালের বহু বিশিষ্ট সাহিত্য-ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'ভারতী' প্রকাশের সবচেয়ে বড় সুফল হচ্ছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহুমুখী আত্মপ্রকাশ। এতে তিনি সমালোচক হিসাবে যেমন আত্মপ্রকাশ করেন ['মেঘনাদবধকাব্যে'র সমালোচনা প্রায় ৩৬ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ—১২৮৪ শ্রাবণ থেকে ফাল্গুন] তেমনি ছোটগল্পকার রূপেও রবীন্দ্র প্রতিভার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। ভানুসিংহ ঠাকুর ছদ্মনামে বৈষ্ণব কবিতার আদলে পদাবলী 'ভারতী' পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হয়। পরে রবীন্দ্রনাথ যখন 'ভারতী'র সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন [১৩০৫—মাত্র ১ বছরের জন্য] তখন তিনি যে সব প্রবন্ধ এতে লিখেছিলেন তার সবই, আধুনিক ভাষা, রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ অর্থাৎ 'ভারতী'কে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তারও স্ফুরণ ঘটে।

পরিশেষে 'ভারতী'র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাহিত্যের ইতিহাসকারের কিছু মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে: "প্রথম প্রকাশের দিন হইতেই ভারতী পত্রিকা নূতন ও তরুণ গদ্য-লেখকদের প্রতি আনুকূল্য করিয়া আসিয়াছিল। বর্তমান শতাব্দের বহু শ্রেষ্ঠ ও কৃতী লেখক ভারতীর আসর ভর করিয়াই সৃষ্টি-সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৭১—১৯৫১]। ভারতীর আসরের উপান্ত্য পালার মূল অধিকারী ইনিই ছিলেন। বর্তমান শতাব্দের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে ভারতীকে আশ্রয় করিয়া যে সাহিত্যগোষ্ঠী জমিয়াছিল তাহার চৈত্যগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং দীক্ষাগুরু অবনীন্দ্রনাথ।" এ-ছাড়াও ভারতীর শেষ আট-ন-বছর প্রথমে ২০ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে ও ১২ নং সুকিয়া স্ট্রিটে যে সাহিত্যিক আড্ডা গড়ে তুলেছিলে, তা সেকালের বিশিষ্ট সাহিত্য-রথীদের যোগদানের নিরিখে অবশ্যই একালেও মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে।

৮৭. **'পারিবারিক প্রবন্ধ'**: এই প্রবন্ধপুস্তকের লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায় [১৮২৭—১৮৯৪]। এঁর প্রায় সমস্ত সাহিত্যকৃতিই প্রবন্ধ পর্যায়ভুক্ত এবং এই শ্রেণীর যে গ্রন্থগুলির ওপর তাঁর মনস্বিতা প্রতিষ্ঠিত 'পারিবারিক প্রবন্ধ' [১৮৮২] তার মধ্যে অন্যতম।

জীবনে এবং আচরণে নিষ্ঠাবান, চরিত্রে ও চিন্তায় সুসম্পূর্ণ, লৌকিক ও আত্মিক ধর্মে সার্থক, ভূদেব বাংলা সাহিত্য ও সমাজকে নানাভাবে সেবা করে গেছেন। ব্যক্তি-জীবনে তিনি যে মিতাচার মেনে চলেছিলেন বাঙলা সাহিত্য-চর্চাতেও তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তিনি যেমন সচেতনভাবে তাঁর গৃহধর্ম পালন করেছেন, ঠিক তেমনিভাবেই তাঁর প্রবন্ধাবলীর মধ্যে গার্হস্থ্যধর্ম বিষয়ক নানা শিক্ষা দিয়েছেন।

সমাজতত্ত্ব এবং ব্যবহারতত্ত্বের দিক থেকে বিচার ও বিশ্লেষণ করে ভূদেব যে তিনটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ রচনা করেন 'পারিবারিক প্রবন্ধ' [১৮৮২] গ্রন্থটিতে তার সূচনা ঘটে। অন্য-গুলির মতোই এই 'পারিবারিক প্রবন্ধ'-এ "মনস্বী, ভূয়োদর্শী এবং সমাজ-দার্শনিক ভূদেবের সংশ্লেষণ ধর্মী [synthetic] প্রতিভা ও মনঃপ্রকৃতি সম্যক্ ধরা পড়েছে। উনিশ শতকের বন্যাপ্রবাহে যখন নব্যশিক্ষিত বাঙালীর পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছিল, যখন জীবনে আঁকড়ে ধরার মতো কোন কিছু আর অবশিষ্ট থাকছিলো না, সেই সময় ভূদেব সমাজ-পরিবারের আচার-কর্তব্য ও প্রয়োজন বিশ্লেষণ করে এই প্রবন্ধগ্রন্থত্রয় রচনা করেন।" তার মধ্যে 'পারিবারিক প্রবন্ধ' পরিবারের পরিচালনায় ও তার সুস্থতা রক্ষায় কি করা উচিত, কি না করা উচিত এইসব 'কেজো' কথায় ভর্তি থাকলেও, তাঁর পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে পাওয়া যুক্তিবোধের সাহায্যে জীবনানুযায়ী করে নেওয়ার সার্থক দলিল হিসাবে গ্রাহ্য।

ভূদেবের এই গ্রন্থের পরিকল্পনায় ও ভাষাপদ্ধতিতে অক্ষয়কুমারের অনুক্রম লক্ষ্য করা যায়।

৮৮. **'শনিবারের চিঠি'**ঃ ২৬ জুলাই ১৯২৪ বা ১০ শ্রাবণ ১৩৩১-এ সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করে 'শনিবারের চিঠি'। 'কোন সীরিয়াস আদর্শ ছিলো না, সাহিত্যের শুচিতা রক্ষার নামে সাহিত্যিকদের, বিশেষ করে তরুণদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করাই এর লক্ষ্য ছিলো।' সেই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে প্রথম সংখ্যাতেই শনিবারের চিঠি আক্রমণ করে বসলো নজরুলকে, তাঁর নতুন নামকরণ করলো 'গাজী আব্বাস বিটকেল'। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন যোগানন্দ দাস। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে পত্রিকার প্রবন্ধক শ্রীশঙ্করাচার্য রূপী অশোক চট্টোপাধ্যায় লেখেন "আজকাল 'নেই উদ্দেশ্য' ও 'ক্রমস্ফুট উদ্দেশ'—এরই যুগ। তাই যুগধর্ম পালনের ইচ্ছা না থাকলেও বলছি, আমাদের কোন উদ্দেশ্য নেই, এমনকি, উদ্দেশ্যহীনতাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়।...আমরা যতক্ষণ আছি ততক্ষণ আমাদের স্বভাবই আমাদের কখনো উদ্দেশ্যযুক্ত ও কখনো উদ্দেশ্যহীন করে চালাবে।...কোন নির্দিষ্ট পলিসির অনুসরণ করতে গিয়ে জীবন, স্বভাব ও চিরপরিবর্তনশীল হৃদয়াকাঙ্ক্ষাগুলিকে আড়ষ্ট ও প্রাণহীন করে ফেলব না।...ধর্ম-জগতে আমরা কোন-কিছুকে সাধারণত অভ্রান্ত চিরসত্য অথবা শেষ বলে স্বীকার করব না।..সামাজিক সকল ব্যাপারে আমরা আমাদের ছাড়া অপর কিছু বা কাউকে মানব না।'...নিজেদের ভূমিকা ও প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে অশোকবাবু লিখেছিলেন—'উপায়ের ক্ষেত্রে আমরা মুগুরকে হাতছড়ির উপরে জায়গা দেব, চাবুককে চাপড়ের চেয়ে বড় বলেই ধরব'।" 'শনিবারের চিঠি' তার সমগ্র জীবনে 'চাপড়' ও 'চাবুক'-কেই প্রাধান্য দিয়েছিলো এবং পরবর্তী পর্যায়ে "কেবল 'চাপড়' নয়, কাতাকুতু বা সুড়সুড়ি দেওয়ার প্রবণতাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলো।"

'শনিবারের চিঠি'র মূল শক্তি বিরুদ্ধতা—এই জোরে সে বাঙলা সংবাদ-সাময়িক-পত্রের জগতে অত্যন্ত পরিচিত একটি স্থান সংগ্রহ করে নেয়—নজরুল থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ—চিত্তরঞ্জন দাশ এবং তৎকালের সমস্ত তরুণ সাহিত্যিকদের আক্রমণ করা—কোন কোন সংখ্যায় তীব্র সমালোচনার [কখনো কখনো তা গালাগালির পর্যায়ে নেমে যেতো] বিষ উগরে দেওয়াই এর কাজ ছিলো। আবেগপ্রবণতা-হুজুগপ্রিয়তা ইত্যাদি অভ্যাসগুলিকে ছাপিয়ে, বাঙালী যে গুণে বিশ্ববন্দিত তা হচ্ছে কুৎসাপ্রবণতা। পরের কুৎসা করতে ও শুনতে বাঙালীর চেয়ে আর কে বেশি ভালোবাসে পৃথিবীতে। সেই ভালোবাসার পণ্যকে পুঁজি করে 'শনিবারের চিঠি' কালের সমুদ্র পাড়ি দিতে চেষ্টা করেছে এবং সে-বিষয়ে অনেকখানি সফলও হয়েছে।

'শনিবারের চিঠি' ১৩৩৪ সালের ৯ ভাদ্র নবপর্যায়ে মাসিক পত্রিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদকীয় কাঠামো পূর্ববৎ থাকলেও সজনীকান্তই ছিলেন প্রকৃত পরিচালক ; আর তাত্ত্বিক নেতা ও গুরু হলেন মোহিতলাল মজুমদার। দ্বিতীয় পর্যায়ে [মাঘ ১৩৩৪ থেকে ভাদ্র ১৩৩৫] শনিবারের চিঠির সম্পাদক হলেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী। এর পর নানা প্রতিকূল ও অনুকূল অবস্থা ও সংগ্রামকে অতিক্রম করে মোটা-মুটিভাবে সজনীকান্তের যোগ্য সম্পাদনায় 'শনিবারের চিঠি' বাঙলা দেশের সংবাদ-সাময়িকপত্রের জগতে নিজস্ব ধারা তৈরি করে নেয়।

৮৯ কমলকুমার মজুমদার : [১৯১৪—১৯৭৯] : বহুবিচিত্র বিষয়ে আগ্রহী এবং বিভিন্ন পেশার মানুষ কমলকুমার মজুমদার বাঙলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে এমন একটি আসন পেয়েছেন যার মূল্য খুঁজতে গেলে জৌলুস হারায়, আবার রঙ বাছতে গেলে দাম পাওয়া যায় না। যদিও তাঁকে মরণোত্তর বঙ্কিম পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর যাবতীয় গল্পের অখণ্ড ও অসামান্য সংকলন 'গল্প-সমগ্র'এর পরিচায়িকায় তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে, তবুও নিরপেক্ষ রসবুদ্ধি এবং সাহিত্য-উপভোগের সহৃদয় চৈতন্য দিয়ে বিচার করলে কমলকুমারকে ভঙ্গী-সর্বস্ব কথাকার বললে খুব বেশি রূঢ় হয় না। সহানুভূতি এবং অভিজ্ঞতা সৎ-সাহিত্যের মূল। কমলকুমারের হয়তো এই দুই-ই ছিলো ; কারণ বলা হচ্ছে : 'দৃষ্টিভঙ্গী আন্তর্জাতিক, কিন্তু কমলকুমারের গল্প-উপন্যাসে দেশের মানুষের কথাই ফিরে ফিরে এসেছে। মাটির গন্ধ-মাখানো এই সব লেখার মধ্যে, বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করতে হয়, দীন দরিদ্র চরিত্রগুলিকে কী সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন কমলকুমার। এঁদের নিয়ে চেনা ছকের প্রথাসিদ্ধ সহানুভূতিপূর্ণ গল্প কখনও লেখেন নি তিনি, মানুষের পূর্ণ মর্যাদায় জীবন্ত-রূপে এঁদের বিত্রিত করেছেন।' তবুও বলতে হয় যে ঐসব চিত্র যতটা কারিগরির কৌশলপূণ ততখানি স্বচ্ছন্দ নয়। তারা মর্যাদা পেলেও মমত্ব পায়নি।

এইসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কমলকুমার বাঙলা কথাসাহিত্যকে কেন্দ্র করে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি আন্দোলন তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু সঙ্গী বা

অনুসরণকারীর অভাবে তা তাঁতে আরম্ভ হয়ে তাঁতেই শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখানে কমলকুমারের 'গল্প-সমগ্র'-র প্রকাশক ও কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কমলকুমারের সাহিত্যকৃতিত্ব সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন ও মতামত দিয়েছেন তা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করবো। এবং কমলকুমারের সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত পাঠকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও রস এবং রুচির অভিভবের সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন। প্রথমে কমলকুমারের গ্রন্থ প্রকাশক বলছেন: 'বাংলা সাহিত্যে কমলকুমার মজুমদার একাই এক প্রতিষ্ঠান। স্বতন্ত্র ও স্বমহিম, অনন্য ও অভিজাত। কল্লোল, কালিকলম, বা পরিচয় পত্রিকা থেকে উদ্ভূত লেখককুলেরই সমসাময়িক কমলকুমার। কিন্তু তাঁকে কোনও-একটি বিশেষ পত্রিকা দিয়ে চিহ্নিত করা যাবে না। কমলকুমারকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে লেখকগোষ্ঠী, অথচ তিনি কোনও গোষ্ঠীর লেখক নন।

'প্রথম থেকেই কমলকুমার মজুমদার চারিত্র্যে ও লেখক সত্তায় আলাদা।...কমলকুমারের সব-ছাপানো পরিচয়, তিনি লিটল ম্যাগাজিনের লেখক। এমন-কি, খ্যাতি-পরিকীর্ণ পরিণত বয়সেও। লিটল ম্যাগাজিনের ছোট আকারে এমন বড় মাপের লেখক আর পাওয়া গিয়েছে কিনা সন্দেহ। সাহিত্যের ইতিহাসে বিষয়ের পাশাপাশি স্টাইলও যে সমান গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক, এ-কথা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন কমলকুমার মজুমদার। আজীবন তাই স্টাইল নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। চলতি বাংলা দিয়ে শুরু করেও কমলকুমার ক্রমশ ঝুঁকে ছিলেন সাধু বাংলার গদ্যরচনার দিকে। শেষাবধি নির্মাণ করেছিলেন নিজস্বতা স্পন্দিত এমন-এক ভাষারীতি, যা অনায়াসে চিনিয়ে দেয় কমলকুমারকে।...গূঢ় ও গভীর, কবিত্বময় অথচ ঋজু কমলকুমারের বাংলা রবীন্দ্রনাথ কি শরৎচন্দ্রের বাংলার থেকে একেবারে ভিন্নস্বাদ।' এরপর কথাকার শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন: 'কমলকুমারের মতন দুঃসাহসী লেখক আমরা বাঙলা ভাষায় আর দেখিনি, তিনি নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি করে নিয়েছেন। বেশ কিছুকাল তিনি ছিলেন লেখকদের লেখক, মূলত তরুণ লেখকেরাই ছিল তাঁর রচনার মনোযোগী পাঠক, বিশেষত নবীন কবিকুল ছিল তাঁর বিশেষ অনুরাগী। আস্তে আস্তে উৎসাহী পাঠকেরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। বাঙলা ভাষার অন্য সমস্ত লেখকের চেয়ে তিনি আলাদা।...তিনি মনোরঞ্জনের জন্য লেখেন না, কিছু সৃষ্টি করার জন্য লেখেন, প্রতিটি রচনার মধ্যে রয়েছে জীবনবোধের গভীরতা, অথচ কোনো উচ্চস্বরের বক্তব্য নেই। প্রতিটি মানুষই তাঁর চোখে রহস্যময়, নিছক সাদাকালো নয়, মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইটাও শুধু নীরস বর্ণনার বিষয় নয়, সাহিত্য কখনো মজা-বর্জিত হতে পারে না। মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই কমলকুমার অনেকটা কাল্টফিগারে পরিণত হন, পাঠকদের মধ্যেও দারুণ কৌতূহলের সঞ্চার হয়,...'

কমলকুমারের গ্রন্থাবলীর তালিকা: 'অন্তর্জলি যাত্রা' [১৩৬৯ বঙ্গাব্দ] প্রথম উপন্যাস। ১৩৭০-এ প্রকাশিত হয় 'নিম অন্নপূর্ণা'। এরপর প্রকাশিত হয়, 'গল্পসংগ্রহ' 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক,' 'খেলার প্রতিভা', 'দানসা ফকির' ইত্যাদি। কমলকুমারের

প্রথমদিককার গদ্য-ব্যবহারের একটু নমুনা : 'ঝটিতি গঙ্গাপ্রতি দৃষ্টিপাতে যশোবতী ভূতগ্রস্ত ; গঙ্গা চন্দ্রালোকে বিচ্ছুরিত উদ্বেল, বেলাতটে মাংসপিণ্ডবৎ, কৃষ্ণবর্ণ স্পন্দিত শরীর—কুম্ভীর যেমত, কে যেন আসিতেছে দৃশ্যমান হইল ; দর্শনে তিনি সম্মোহিতা, আবিষ্ট, নাস্তিক, শক্তিরহিত' ['অন্তর্জলি যাত্রা']।

৯০ **'মহাপ্রস্থানের পথে'** : তিনের দশকের সবচেয়ে সমাদৃত বই 'মহাপ্রস্থানের পথে' [১৩ ৪ বঙ্গাব্দ]। পাঁচের দশকের গোড়ার দিকে এই উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়িত হয়ে একদিকে যেমন গ্রন্থটির, অন্যদিকে তেমনি হিমালয়ের দিকে মধ্যবিত্ত বাঙালীর আকর্ষণকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এই গ্রন্থের লেখক প্রবোধকুমার সান্যাল [১৯০৭-৮৪] 'কল্লোলে'র 'তারুণ্য ধর্ম ও যাযাবরবৃত্তির' অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি। 'কল্লোল শিরোমণি' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোলের কাল' সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন ; যেমন : 'উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন, মুক্ত হাওয়ার মুক্ত আকাশের মানুষের বিরতিবিহীন সংগ্রাম ও দায়িত্বহীন বোহিমিয়ানিজম'—তার সব গুণই এই ধারার অন্যতম প্রধান সদস্য প্রবোধকুমারের 'মহাপ্রস্থানের পথে'-র মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। যদিও প্রশ্ন হতে পারে ঐ বোহেমিয়ানিজমের দায়িত্ববিহীনতা প্রবোধকুমারের জীবনের সঞ্চয়ের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করেছে কি ? বিশিষ্ট সমালোচক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবোধকুমারের সাহিত্য-বৈশিষ্ট্য এবং তৎপ্রসঙ্গে 'মহাপ্রস্থানের পথে' উপন্যাসের পর্যালোচনা, ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে: 'উপন্যাসের অতি-প্রসার ও মাত্রাতিরিক্ত জনপ্রিয়তার যুগে এমন অনেক লেখক উপন্যাস-ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হন, যাঁহাদের রুচি ও মনীষা ঠিক উপন্যাসের স্বভাবধর্মের অনুবর্তী নহে। আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিম-যুগে এই জাতীয় লেখক সঞ্জীবচন্দ্র। আমার মনে হয় যে, প্রবোধকুমার সান্যালকেও এই শ্রেণীর লেখকদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।' অন্য কয়েকজনের মতো প্রবোধকুমারও 'জীবন সম্বন্ধে একটি বিশেষ উপপত্তি [theory] লইয়া, সমাজ-বিন্যাসের একটি অচিন্তিতপূর্ব রূপকল্পনার প্রেরণায় জীবন-পর্যালোচনায় অগ্রসর হন।··· জীবন-গ্রন্থের কয়েকটি পাতা, জীবন-নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যাবলী অবলম্বন করিয়াই ইঁহাদের বিশিষ্ট জীবনদর্শন গড়িয়া উঠে।' বিশ্বের কিছু কিছু সাহিত্যিকের মনো-ধর্মের সঙ্গে এই সাযুজ্য প্রবোধকুমারের থাকার ফলে 'মহাপ্রস্থানের পথে' উপন্যাসও ঐ উপাদানেই গড়ে উঠেছে।

"সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' যেমন তাঁহার মনোভঙ্গীর দর্পণ, প্রবোধকুমারের 'মহা-প্রস্থানের পথে'ও তেমনি তাঁহার জীবনরসিকতার বৈশিষ্ট্যের মূল উৎস।···'মহাপ্রস্থানের পথে' ভ্রমণকাহিনীই মুখ্য—ইহার দৃশ্য-পরিবর্তনের ফাঁকে ফাঁকে, ইহার চলিষ্ণুতার গতিচ্ছন্দে ঔপন্যাসিক রস খানিকটা জমাট বাঁধিয়াছে। গ্রন্থটিতে লেখকের দার্শনিক অনাসক্তি, উদার মননশীলতা, বৈরাগ্যস্পৃষ্ট শিথিল জীবনানুসন্ধিৎসা পরিস্ফুট—ইহার মানবিক আবেগ বিচ্ছিন্ন ও পরিণতিহীন ক্ষণিকতায় পর্যবসিত। লেখক আসক্তির জালে

জড়াইয়া পড়েন নাই. জীবনের গভীরে অবগাহন করেন নাই, জীবনস্রোতের কয়েকটি তরঙ্গকে তীরের নিরাপদ দূরত্ব হইতে লক্ষ্য করিয়াছেন।…প্রবোধকুমারের 'মহাপ্রস্থানের পথে' উপন্যাসে ক্ষণিক মোহাবেশ নিঃসঙ্গ হিমালয়-শৃঙ্গে ইন্দ্রধনুরঞ্জিত কুহেলিকা-জালের ন্যায় খানিকটা বর্ণমায়া সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু এই কুহক মিলাইতে বেশি সময় লাগে নাই। মনে ইহা কিছুটা দাগ কাটে বটে, কিন্তু অবিস্মরণীয় রেখায় অঙ্কিত হয় না। প্রবোধকুমারের হিমালয় ভ্রমণের এই কাহিনীর মধ্যে মায়া কাটানো মানস মুক্তি, এই দেখিতে দেখিতে আগাইয়া যাওয়ার অশৃঙ্খলিত স্বাধীনতা প্রধান আকর্ষণ; ইহাতে সহস্রবন্ধনে আবদ্ধ ঘন সম্মোহের আবেগ-আবিল বদ্ধ হাওয়া একেবারেই অনুভূত হয় না।"

প্রবোধকুমারের 'মহাপ্রস্থানের পথে' হিমালয় ভ্রমণের কাহিনী। হরিদ্বার-লক্ষ্মণ-ঝুলা-কেদারনাথ-বদ্রিনাথ ইত্যাদি হিন্দুতীর্থগুলি সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করবার সময় লেখক যে-সব বিচিত্র চরিত্র-সমূহের সঙ্গে, তাদের হাসি-কান্না-সুখ-দুঃখ-স্বার্থপরতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তাকেই নির্মোহ ও নির্লিপ্তির সঙ্গে বর্ণনা করে গিয়েছেন। মাঝে মাঝে প্রেমের উষ্ণপরশও লেগেছে যা লেখকের গেরুয়া আবরণ ভেদ করেছে—কিন্তু কোন কিছুকেই স্থায়ী হতে দেয়নি। ফলে এই ভ্রমণোপন্যাসটি পাঠ করে সৌন্দর্য দর্শনের পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জীবন-নাটকের খণ্ড দৃশ্যের জন্য দুঃখে হৃদয় ব্যথিয়ে ওঠে, 'দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়' যে স্মৃতি তার কারুণ্যে হৃদয়ে গান জাগে, 'কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী।'

৯০. 'নীলাঙ্গুরীয়'/বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ঃ 'কল্লোল' 'কালিকলম' পরিমণ্ডলের সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় [১৮৯৪-১৯৮৭] বাংলা কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে নিজস্ব একটি জগৎ তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন। বিভূতি-ভূষণের পিতার নাম বিপিনবিহারী এবং মাতা গিরিবালা। তাঁরা ছিলেন অনেকগুলি ভাইবোন [আট ভাই, দুই বোন] এবং বিভূতিভূষণ সকলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। পিতা বিপিন-বিহারীর আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল না থাকলেও পুত্র-কন্যাদের সুষ্ঠুভাবে মানুষ করে তুলতে কার্পণ্য করেননি। চিরকুমার বিভূতিভূষণ-এর কয়েকপুরুষ বিহারে প্রবাসী। মূলত দ্বারভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে বিভূতিভূষণের কর্মজীবন গড়ে ওঠে। পাটনার বি. এন. কলেজ থেকে সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্র নিয়ে ১৯১৬ সালে বি. এ. পাশ করেন। লেখাপড়া এইখানেই ইতি—তারপরে তিনি বিচিত্র কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। কখনও শিক্ষকতা, কখনও দ্বারভাঙ্গার মহারাজার একান্ত সচিব, কখনও বা কোন এক জমিদার-নন্দনের গৃহশিক্ষক। বিভূতিভূষণ দীর্ঘায়ু ছিলেন। প্রায় তিরাশি বছরের আয়ুষ্কালকে মোটামুটি চারটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্বের সময়সীমা ১৯১৬-১৯২৬—এইটাই তাঁর কর্মজীবনের সবচেয়ে সংঘাতময় পর্ব। এই সময়েই বারম্বার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তরের ফলে, হয় তিনি পদত্যাগ করেছেন অথবা তাঁর কর্মজীবনে ছেদ পড়েছে। শৈশবে অভিমানী, ছাত্রজীবনে নির্বান্ধব, বিভূতিভূষণ যেন জীবনের আরম্ভেই নিজস্ব

স্থিতিভূমিটাকে একটি ঋজু রেখায় চিহ্নিত করে নিতে চান। তাঁর এই সময়কার ব্যক্তিত্বের রূপটিকে একটু প্রখর মনে হয়। দ্বিতীয় পর্বের বিস্তার ১৯২৬ থেকে ১৯৩৪। দৃশ্যত এই পর্ব কর্মে সমর্পিত হলেও নেপথ্যে প্রস্তুতি চলেছে সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের। কর্মজীবনের তৃতীয় ভাগ ১৯৩৪ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত প্রসারিত—সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠার সময়। তার অন্ত্যপর্ব অর্থাৎ ১৯৪২-১৯৮৭ নিজেকে কেবলই যাচাই করে নেবার সময়। উপলব্ধিতে গভীর এই বিপুল মুহূর্তরাশি প্রৌঢ়প্রজ্ঞায় মন্থর, পরিণাম অনুসন্ধানী।'

মোটামুটিভাবে ১৯১৫তে 'প্রবাসী' পত্রিকা আয়োজিত গল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হওয়া ও ঐ পত্রিকাতেই তা মুদ্রিত হওয়া থেকেই আরম্ভ হয় বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক জীবন। তারপর আর থেমে থাকেননি। আ-মৃত্যু তিনি ছোটগল্প-উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ-গ্রন্থ-সমালোচনা ইত্যাদি অজস্র সাহিত্যফসল ফলিয়েছেন—সব মিলিয়ে যার সংখ্যা প্রায় হাজার ছাড়িয়ে যাবে। "১৩৪৪-এর বৈশাখ মাসে বিভূতিভূষণের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'রাণুর প্রথমভাগ' রঞ্জন পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে ১৩৪৮-এ প্রকাশিত 'রাণুর কথামালা' পর্যন্ত তাঁর সাতটি গ্রন্থই গল্প সঙ্কলন।" এর পর তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৩৪৯ ভাদ্র [১৯৪২ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর] মাসে—নাম 'নীলাঙ্গুরীয়'।

তালিকা দেখে এবং রসানুরাগ উপলব্ধি করে বিভূতিভূষণকে মূলত গল্পলেখক এবং হাস্যরস-প্রধান সাহিত্যের স্রষ্টা বললে খুব একটা অন্যায় হয় না। এমন এক লেখকের কাছ থেকে যখন 'নীলাঙ্গুরীয়' [১৯৪৫] নামক রোমান্সটি পাওয়া গেল তখন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো আমাদেরও মনে হয়েছে—'বিভূতিভায়া কি তবে tragedy writer ...'? বিভূতিভূষণের জীবন ও সাহিত্য-সমালোচক ড. সরোজ দত্ত এই কারণেই লিখেছেন : "বিভূতিভূষণের উপন্যাসসমূহ, ভাবগত কোনো না কোন সূত্রে 'নীলাঙ্গুরী'য় দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, সন্দেহ নেই—ব্যতিক্রম শুধু 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' এবং 'নবসন্ন্যাস'। এদের মধ্যে 'নবসন্ন্যাস'-এর রাজনৈতিক অংশ ব্যতীত বাকী অংশের মহত্তম ঋণ এই 'নীলাঙ্গুরীয়'-এর কাছেই। অতএব যদি বলা তায়, 'নীলাঙ্গুরীয়' লেখকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হোক বা নাই হোক, এটাই তাঁর সবচেয়ে প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাস—তা হলে সে সিদ্ধান্তকে সমীচীন বলে গ্রহণ করাই উচিত।"

কিন্তু কেবল 'প্রতিনিধিস্থানীয়' নয় এইটিই 'বিভূতিভূষণের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। এই উপন্যাসে প্রেমের ঘৃণা ও আকর্ষণমিশ্রিত রহস্যময় দ্বৈতভাব বিশ্লেষণের চেষ্টা হইয়াছে। উপন্যাসের সর্বত্র মননশীলতা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও ঘটনাবিন্যাস ও কথোপকথনের সযত্ন নিয়ন্ত্রণের চিহ্ন পরিস্ফুট। লেখক কোথায় হাল ছাড়িয়া দিয়া স্রোতে আত্মসমর্পণ করেন নাই, কোথাও শিথিলতা বা আকস্মিকতার প্রশ্রয় দেন নাই—এক অতন্দ্র,

সদাসক্রিয় সচেতনতা চিত্রের প্রত্যেকটি রেখাকে, মন্তব্যের প্রত্যেক সূক্ষ্ম ইঙ্গিতকে অভ্রান্তভাবে গভীর ভাবগত ঐক্যের কেন্দ্রাভিমুখী করিয়াছে। বাংলা উপন্যাসের অনিয়ন্ত্রিত অজস্রতার মধ্যে এই কঠোর পরিমিতি ও অস্খলিত লক্ষ্যানুবর্তন উচ্চাঙ্গের মননশক্তির ও কলাকৌশলের পরিচয় দেয়।

'গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়—আভিজাত্য গৌরবশীলা ব্যারিস্টার দুহিতা মীরার মনে দরিদ্র গৃহশিক্ষক শৈলেনের প্রতি অনিবার্য প্রণয়োন্মেষ, প্রেম ও বংশাভিমানের মধ্যে প্রবল বিরোধ।...এই উপন্যাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গভীর উপলব্ধির বিষয়, ব্যারিস্টার গৃহিণী অপর্ণাদেবীর চরিত্র। ....উপন্যাসটি প্রেমের রহস্যোদ্ভেদ অপেক্ষা পূর্বস্মৃতি-মন্থনের তন্ময়তায় অধিকতর সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সমস্ত দিক থেকে বিচারে 'নীলাঙ্গুরীয়' উপন্যাস একেবারে প্রথম শ্রেণীর না হইলেও, ইহার মধ্যে লেখকের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়ার যথেষ্ট উপাদান আছে' ['বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' : ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]।



নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' [১-৪ খণ্ড]।
২. সুকুমার সেন : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস [১-৪ খণ্ড]।
৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'।
৪. ঐ : 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।'
৫. ঐ : 'বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস' [১]।
৬. ঐ : 'স্বর্ণলতা' [সম্পাদিত]।
৭. ক্ষেত্র গুপ্ত : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' [প্রাচীন ও আধুনিক যুগ]।
৮. ঐ : 'বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস', 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস [১]।
৯. ভূদেব চৌধুরী : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' [১-২ খণ্ড]।
১০. সনৎকুমার মিত্র : 'বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়'।
১১. দিলীপকুমার নন্দী : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১৭৬০-১৮৬০'।
১২. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : 'বাংলা সাহিত্যের কথা' [ঢাকা ১-২ খণ্ড]।
১৩. ওয়াকিল আহমদ : 'বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত' [ঢাকা]।
১৪. ঐ : কোরেসী মাগন 'চন্দ্রাবতী' [ঢাকা]।
১৫. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী : 'শাক্ত পদাবলী ও শক্তি সাধনা।
১৬. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা'।
১৭. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা'।
১৮. দীনেশচন্দ্র সেন : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' [৮ম সংস্করণ]।
১৯. মুহম্মদ আবদুল হাই : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' [ঢাকা]।
২০ রমেশচন্দ্র মজুমদার : 'বাংলা দেশের ইতিহাস' [১-৩ খণ্ড]।
২১. J. N. Sarkar ed. : History of Bengal [Dacca University Vol-1-2]
২২. S. K. De : Bengali Literature in the Nineteenth Century.
২৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্র-জীবনী' [৩য় খণ্ড]।
২৪. আশুতোষ দাশ : তন্ত্রবিভূতি : 'মনসাপুরাণ' [সম্পাদিত]।
২৫. ঐ : 'অভয়ামঙ্গল' [সম্পাদিত]।
২৬. ভবতোষ দত্ত : 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী'।
২৭. ডঃ মহীতোষ বিশ্বাস : 'বাংলা উপন্যাস প্রসঙ্গ : আঞ্চলিকতা'।

২৮. ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী বাংলা উপন্যাস।
২৯. ডঃ আশিসকুমার দে : 'আধুনিক বাংলা কবিতা, প্রসঙ্গ ও প্রকরণ।'
৩০. ডঃ অসিতকুমার ব্যানার্জী : 'উনিশ-বিশ'।
৩১. ডঃ সরোজ দত্ত : 'বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, জীবন ও সাহিত্য সাধনা'
৩২. „ জয়ন্তকুমার ঘোষাল : 'বাংলা উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা'।
৩৩. „ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর'।
৩৪. „ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় : 'জসীমুদ্দীন'।
৩৫. „ সোনামণি চক্রবর্তী : 'শনিবারের চিঠি ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য'।
৩৬. „ নন্দকুমার বেরা : 'সতীনাথ ও ফণীন্দ্রনাথ : ব্যক্তি ও শিল্পী'।
৩৭. „ শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : 'মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারীচরিত্র'।
৩৮. „ সমরেশ মজুমদার : 'বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর'।
৩৯. „ শঙ্কর ভট্টাচার্য : 'বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান'।
৪০. গোপাল হালদার : 'বাংলা সাহিত্য মানব স্বীকৃতি'।
৪১. ডঃ আহমদ শরীফ : 'বাঙালীর চিন্তাচেতনার বিবর্তন ধারা'।
৪২. ডঃ সত্যবতী গিরি : 'বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রম-বিকাশ।'
৪৩. ডঃ প্রমীলা ভট্টাচার্য : 'কথাশিল্পী শরদিন্দু : মন ও শিল্প'।
৪৪. আতাউর রহমান : 'নজরুল কাব্য-সমীক্ষা'।
৪৫. সুকুমার রায় : 'সাহিত্য সমগ্র'।
৪৬. ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত : 'বঙ্কিমচন্দ্র, বাস্তবতা এবং'
৪৭. মুজফ্ফর আহমদ : 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা'।
৪৮. রঞ্জিতকুমার মুখার্জী : 'তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা'।
৪৯. ডঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায় : 'কল্লোলের কাল'।

